

આદર્શ હિન્દુ-રેસ્ટોલ

શ્રી હિન્દુ દેવ ગુપ્તા વાલજી



મિત્ર ૭ સ્વામી પાર્શ્વજીવાન
પ્રાઇવેટ લિમિટેડ

૨૦ આચાર્યજી સ્ટ્રીટ, રાજકોટ: ૧૭

রাণাঘাটের রেল-বাজারে বেচু চক্রান্তির হোটেল যে রাণাঘাটের আদি ও অকৃত্রিম হিন্দু-হোটেল এ-কথা হোটেলের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা না থাকিলেও অনেকেই জানে। কয়েক বছরের মধ্যে রাণাঘাট রেল-বাজারের অসম্ভব রকমের উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলটির অবস্থা ফিরিয়া যায়। আজ দশ বৎসরের মধ্যে হোটেলের পাকা বাড়ী হইয়াছে, চারজন রসুয়ে-বামদুনে রান্না করিতে করিতে হিম্‌সিম্‌ খাইয়া যায়, এমন খন্দেরের ভিড়।

বেচু চক্রান্তি (বয়স পঞ্চাশের ওপর, না-ফসাঁ না-কালো দোহারী চেহারা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল) হোটেলের সামনের ঘরে একটা তক্তপোশে কাঠের হাত-বাক্সের ওপর কনুরের ভর দিয়া বসিয়া আছে। বেলা দশটা। বনগাঁ লাইনের ট্রেন এইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু, কিছু প্যাসেঞ্জার বাহিরের গেট দিয়া রাস্তায় পড়িতে শুরু হইয়াছে।

বেচু চক্রান্তির হোটেলের চাকর মতি রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে—এই দিকে আসুন বাবু, গরম ভাত তৈরি, মাছের ঝোল, ডাল; তরকারী ভাত—হিন্দু-হোটেল বাবু—দুইজন লোক বক্তৃতায় ভুলিয়া পাশের যদু বাঁড়ুয়ার হোটেলের লোকের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া বেচু চক্রান্তির হোটেলেরেই ঢুকিল।

—এই যে, বোঁচকা এখানে রাখুন। দাঁড়ান বাবু, টীকট নিতে হবে এখানে—কোন ক্লাসে থাকেন? ফাস্ট ক্লাস না সেকেন্‌ ক্লাস—ফাস্ট ক্লাসে পাঁচ আনা, সেকেন্‌ ক্লাসে তিন আনা—

এ হোটেলের নিয়ম, পরমা দিয়া বেচু চক্রান্তির নিকট হইতে টীকট (এক টুকরা সাদা কাগজে—নম্বর ও শ্রেণী লেখা) কিনিয়া ভিতরে খাইতে হইবে। সেখানে একজন রসুয়ে-বামদুনে বসিয়া আছে, খন্দেরের টীকট লইয়া তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া দিবার জন্য। খাইবার জায়গা দরমার বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা। এক দিকে ফাস্ট ক্লাস, অন্য দিকে সেকেন্‌ ক্লাস। খন্দের খাইয়া চলিয়া গেলে এই সব টীকট বেচু চক্রান্তির কাছে জমা দেওয়া হইবে—সেগলি দেখিয়া তহবিল মিলানো ও উদ্ভূত ভাত তরকারীর পরিমাণ তদারক হইবে, রসুয়ে-বামদুনেরা চুরি করিতে না পারে।

চাকর ভিতরে আসিয়া বলিল—মোটো চার জন লোক খন্দের। দু'জন ওদের ওখানে গেল।

বেচু চক্রান্তি বলিল—যাক্‌ গে। তুই আর একটা এগিয়ে যা—শান্তিপুত্র আসবার সময় হ'ল। এই গাড়ীতে দু'-পাঁচটা খন্দের থাকেই। আর ভেতরে বামনকে বলে আয়, শান্তিপুত্র আসবার আগে যেন আর ভাত না চড়ায়। এক ডেকারিতে এখন চলুক।

এমন সময় হোটেলের ঝি পশ্ম ঘরে ঢুকিয়া বলিল—পরমা দেও বাবু, দই নে আসি।

বেচু বলিল—দই কি হবে?

পশ্ম হাসিয়া বলিল—একজন ফাস্টো কেলাসে থাকে। আমার বলে পাঠিয়েছে। দই চাই, পাকা কলা চাই—

বেচু বলিল—কে বল্‌ তো? খন্দের?

—খন্দের তো বটেই। পরমা দিগে থাকে। এমনি না। আমার ভাইপো আসবে দেশ থেকে এই শান্তিপুত্রের গাড়ীতে।

—না—না—তাকে পরমা দিতে হবে না। সে ছেলমানুস, দু'-এক দিনের জন্যে আসবে—তার কাছ থেকে পরমা কিসের? দইয়ের পরমা নিয়ে যা—

বেচু একথা কখনো কাহাকেও বলে না, কিন্তু পশ্ম বিয়ের সম্বন্ধে অন্য কথা।

পদ্ম কি এ হোটেলে যা বলে তাই হয়। তাহার উপরে কথা বলিবার কেহ নাই, সেজন্য দৃষ্ট লোকে নানারকম মন্দ কথা বলে। কিন্তু সে-সব কথায় কান দিতে গেলে চলে না।

শান্তিপূরের গাড়ী আসিবার শব্দ পাওয়া গেল।

হোটেলের চাকর খন্দের আনিতে স্টেশনে বাইতোর্ডল, বেচু চক্রান্তি বলিল—খন্দের বেশী করে আনতে না পারলে আর তোমার রাখা হবে না মনে রেখো—আমার খরচা না পেয়ালে মিথো চাকর রাখতে বাই কেন? গেল হপ্তাতে তুমি মোটে তেইশটা খন্দের এনেছ—তাতে হোটেল চলে?

পদ্ম কি বলিল—তোমায় পই-পই করে বলে হার মেনে গেলাম; তিন আনা বাড়িয়ে চোন্দ পয়সা করো, আর ফাস্টো কেলাস্-টেলস্ তুলে দ্যাও। ক'টা খন্দের হয় ফাস্টো কেলাসে? বদু বাড়ুয়োর হোটেলে রেট্ কমিয়েছে—শুনে—

বেচু বলিল—চুপ চুপ, একটু আস্তে আস্তে বল না। কারও কানে কথা গেলে এখন—

এমন সময় ছ'জন খন্দের সঙ্গে করিয়া মতি চাকর ফিরিয়া আসিল।

বেচু বলিল—আসুন বাবু, পুটুলি এখানে রাখুন। কোন্ কেলাসে থাকেন বাবু? পাঁচ আনা আর তিন আনা—

একজন বলিল—তোমার সেই বাবুন ঠাকুরটি আছে তো? তার হাতের রান্না খেতেই এলাম। আমরা সে-বার খেয়ে গিয়ে আর ভুলতে পারি নে। মাংস হবে?

—না বাবু, মাংস তো রান্না নেই—তবে যদি অর্ডার দেন তো ওবেলা—

লোকটি বলিল—আমরা মোকদ্দমা করতে এসেছি কিনা, যদি জিতি পোড়ামা আর সিংহেশ্বরীর ইচ্ছে—তবে হোটেলে আমাদের আজ থাকতেই হবে। কাল উকীলের বাড়ী কাজ আছে—তা হ'লে আজ ওবেলা তিন সের মাংস চাই—কিন্তু সেই বাবুন ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করানো চাই। নইলে আমরা অন্য জায়গায় যাব।

ইহারা টিকিট কিনিয়া খাইবার ঘরে ঢুকিলে পদ্ম কি বলিল—পোড়ারমুখো মিন্‌সে আবার শুনতে না পার। কি যে ওর রান্নার সুখ্যাত করে লোকে, তা বলতে পারি নে—কি এমন মরণ রান্নার!

বেচু বলিল—টিকিটগুলো নিয়ে আর তো ভেতর থেকে। এ-বেলার হিসেবটা মিটিয়ে রাখি। আর এখন তো গাড়ী নেই—আবার সেই একটার মুড়োগাছা লোকাল—

পদ্ম বলিল—কেন আসাম মেলে—

—আসাম মেলে আর তেমন খন্দের আসছে কই? আগে আগে আসাম মেলে আটটা-দশটা খন্দের ফি দিন পাওয়া যেত—কি যে হয়েছে বাজারের অবস্থা—

পদ্ম কি ভিতরে গিয়া রসুয়ে-বাবুনের নিকট হইতে টিকিট আনিয়া বলিল—শোনো মজা, ফাস্টো কেলাসের ডাল যা ছিল সব সাবাড়। হাজারি ঠাকুরের কাণ্ড! ইদিকে এই খন্দের বাবুয়া গিয়ে তাকে একেবারে ম্বগ্‌গে তুলে দিচ্ছে, তুমি হেনো রাঁধো, তুমি তেনো রাঁধো বলে—যত অনাছিষ্টি কাণ্ড, যা দেখতে পারি নে তাই। এখন ডালের কি করবে বলো—

—ডাল কতটা আছে দেখলি?

—সকড়কা। আর মেরে-কেটে তিন জনের মত হবে—

—ক'জনের মত ডাল দিইছিলি?

—দশ জনের মত মূগের ডাল আলাদা ফাস্টো কেলাসের মূড়িম্বের জন্যে দিইছি—সেকেন্ কেলাসে দিশ জনের মূসুরি-খেসারি মিশেল ডাল—

—হাজারি ঠাকুরকে ডেকে দে—

পশ্ম ঝি হাজারি ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়াই আনিল।

লোকটার বরস প'ত্তারিগ্লশ-ছেচল্লিশ, একহারা চেহারা, রং কালো। দেখিলে মনে হয় লোকটা নিপাট ভালমানুষ।

বেচু চক্ৰবর্তী বলিল—হাজারি ঠাকুর, ভাল কম হ'ল কি ক'রে?

হাজারি ঠাকুর বলিল—তা কি ক'রে বলবো বাবু? রোজ যেমন ভাল খন্দেরদের দিই, তার বেশী তো দিই নি। কম হ'লে আমি কি করবো বলুন।

পশ্ম ঝি ঝঙ্কার দিয়া বলিল—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর। আমি পণ্ট দেখেছি তুমি ওই খন্দের বাবুদের মুখে রান্নার সুখ্যাতি শুনলে তাদের পাতে উড়কি উড়কি মূড়িঘণ্ট ঢালছো। পরস-কড়িও দিয়েছে বোধ হয় বকশিশ—

হাজারি বলিল—বকশিশ এ হোটেলের কত পাই দেখছো তো পশ্মদিদি। একটা বিড়ি খেতে কেউ দ্যায়—আজ পাঁচ বছর এখানে আছি? তুমি কেবল বকশিশ পেতে দ্যাখো আমাকে।

পশ্ম বলিল—তুমি মূখে-মূখে তক্কো ক'রো না বলে দিচ্ছি। পশ্ম ঝি কাউকে ভয় ক'রে কথা বলবার মেয়ে নয়। ফাস্টো কেল্যসের বাবুরা পুজোর সময় তোমার গেঞ্জি কিনে দেয় নি?

—ইস্—ভারী গেঞ্জি একটা—কিনে দিয়েছিল ব'ঝি, পুরনো গেঞ্জি—

বেচু চক্ৰবর্তী বলিল—মাও যাও, ঠাকুর, বাজে কথা নিয়ে বকো না। বেশী খন্দের আসে, ডালের দাম তোমার মাইনে থেকে কাটা যাবে।

—কেন বাবু আমার কি দোষ হ'ল এতে! পশ্মদিদি আট জনের ডাল মেপে দিয়েছে, তাতে খেয়েছে এগারো জন—

পশ্ম এবার হাজারি ঠাকুরের সামনে আসিয়া হাত-মুখ নাড়িয়া চোখ পাকাইয়া বলিল—আট জনের ডাল মেপে দিইছি—নজ্জার, বদমাইশ গাঁজাখোর কোথাকার—দশ জনের দশের অশ্লৈষিক পাঁচ পোয়া ডাল তোমায় দিই নি বের ক'রে?

হাজারি ঠাকুর আর প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস পাইল না।

পশ্ম ঝি অত অশ্লৈষিক বোধ হয় ছাড়িত না—কিন্তু ইতিমধ্যে খন্দেররা আসিয়া পড়াতে সে কথা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। হাজারি ঠাকুরও ভিতরে গেল।

বেলা প্রায় আড়াইটা।

আসাম মেল অনেকক্ষণ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে।

হাজারি ঠাকুর একা খাওয়ার ঘরে খাইতে বসিল। বড় ডেক্চিতে দুটিখানি মাত্র ভাত ও কড়ায় একটুখানি ঘাঁটা তরকারি পাড়িয়া আছে। ডাল, মাছ বাহা ছিল, পশ্ম ঝিকে তাহার বড় খালায় বাঁড়িয়া দিতে হইয়াছে—সে রোজ বেলা দেড়টার সময় রান্নাঘরের উন্মত্ত ডাল তরকারি মাছ নিজের বাসায় লইয়া যায়—রসুয়ে-বামনদের জন্যে কিছু থাকুক আর না থাকুক।

অন্য রসুয়ে-বামনটা উড়িয়া। তার নাম রতন ঠাকুর। সে হোটেলের বসিয়া খায় না—তাহারও বাসা নিকটে। সেও ভাত-তরকারি লইয়া যায়।

হাজারির এখানে কেহ নাই। সে হোটেলেরি থাকে, হোটেলেরি খায়। রোজই তার ভাগ্যে এই রকম। বেলা আড়াইটা পর্যন্ত খালি পেটে খাটিয়া দুটি কড়কড়ে ভাত, কোনোদিন সামান্য একটু ডাল, কোনোদিন ভাত না—ইহাই তাহার বরাদ্দ। ডেক্চিতে বেশী ভাত থাকিলে পশ্ম ঝি বলবে—অত ভাত খাবে কে? ও তো তিন জনের খোরাক—আমার খালায় আর দুটো বেশী ক'রে ভাত বেড়ে দিও।

হাজারি ঠাকুর খাইতে বসিয়া রোজ ভাবে—আর দুটো ভাত থাকলে ভাল হোত,

না-হয় তেঁতুল দিয়ে খেতাম। পশ্চাৎ কি সোজা বদমাইশ মাগী—পেট ভরে' যে কেউ খায়—তাও তার সহ্য হয় না। যদু বাঁড়ুধার হোটেলে খেলা এগারোটার সময় রাধুনি-বামুন একখানা ভাত খেয়ে নেয়। আমাদের এখানে তা হবার জো আছে? বাব্বা, যেমন কর্তা, তেমন গিন্নি—(পশ্চাৎ ঝিক মনে মনে গিন্নি বলিয়া হাজারি ঠাকুর খুব আমোদ উপভোগ করিল—মুখ ফুটিয়া যাহা বলা যায় না, মনে মনে তাহা বলিয়াও সুখ।)

খাওয়ার পরে মাঠ আড়াই ধপটা ছুটি।

আবার ঠিক বেলা পাঁচটায় উনুনে ডেকাচি চাপাইতে হইবে।

রতন ঠাকুর এই সময়টা বাসায় গিয়া স্বমোয়, কিন্তু হাজারি ঠাকুর চূর্ণী নদীর ধারের ঠাকুরবাড়ীতে, কিংবা রাধাবল্লভ-তলায় নাটমন্দিরে একা বসিয়া কাটায়।

না বদমাইয়া একা বসিয়া কাটাইবার মানে আছে।

হাজারি ঠাকুরের এই সময়টা হইতেছে ভাবিবার সময়। এ সময় ছাড়া আর নিষ্কর্মে ভাবিবার অবসর পাওয়া যায় না। সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত রাম্মার কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, রাত এগারটা পর্যন্ত খন্দেরদের পরিবেশন, রাত বারোটা পর্যন্ত নিজেরদের খাওয়া-দাওয়া, তার পর কর্তার কাছে চাল-ডালের হিসাব মিটানো। রাত একটার এদিকে শূই-বার অবসর পাওয়া যায় না। দু-দশু একা বসিয়া ভাবিবার সময় কই?

চূর্ণী নদীর ধারের জায়গাটি বেশ ভাল লাগে।

ও-পারে শান্তিপুত্র খাইবার কাঁচা সড়ক। খেয়া নৌকার লোকজন পারাপার হইতেছে। গ্রামের বাঁশবন, শিমূল গাছ, মাঠ, কলাই ক্ষেত; গাবভেরেণ্ডার বেড়া-ঘেরা গৃহস্থ-বাড়ী।

হাজারি ঠাকুর একটা বিড়ি ধরাইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিল।

আজ পাঁচ বছর হইয়া গেল বেচু চক্রান্তর হোটেলে।

প্রথম যেদিন রাগাঘাট আসিয়া হোটেলে ঢোকে, সে-কথা আজও মনে হয়। গাণাপুর হইতে রাগাঘাট আসিয়া সে প্রথমেই গেল বেচু চক্রান্তর হোটেলে কাজের সন্ধানেন।

কর্তা সামনেই বসিয়া ছিলেন। বলিলেন—কি চাই?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, রসুয়ে-বামুনের কাজ করি। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, বাবুর হোটেলে কাজ আছে?

—তোমার নাম কি?

—আজ্ঞে, হাজারি দেবশর্মা, উপাধি চক্রবর্তী।

এই ভাবে নাম বলিতে হাজারির পিতাঠাকুর তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিলেন।

—বাড়ী কোথায়?

—গাংনাপুর ইন্সটান্সে নেমে যেতে হয় এডোশোলা গ্রামে।

—রাধিতে জানো?

—বাবু, একদিন রাধিতে দেখুন! মাংস মাছ, যা দেবেন সব পারবো।

—আচ্ছা, তিন দিন এমনি রাধিতে হবে—তার পর সাত টাকা মাইনে দেবো আর খেতে পাবে। রাজি থাকো, আজই কাজে লেগে যাও।

সেই হইতে আজ পর্যন্ত সাত টাকার এক পরস্য মাহিমা বাড়ে নাই। অথচ খন্দের বাবুরা সকলেই তাহার রাম্মার সন্ধ্যাতি করে, যদিচ পশ্চাৎ ঝিকের মূখে একটা সন্ধ্যাতির কথাও সে কখনো শোনে নাই, ভালো কথা তো দুয়ের কথা, পশ্চাৎ ঝিক তাহাকে আশিবার্টি পাতিয়া পারে তো কোটে। গরীব লোক, এ বাজারে চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া খাইবেই বা

কোথায়? যাক্, তাহার জন্য সে তত ভাবে না। তাহার মনে একটা বড় আশা আছে, ভগবান তাহা যদি পূর্ণ করেন কোনোরূপে—তবে তাহার সকল খেদ দূর হইয়া যায়। হোটেলের কাজ সে খুব ভাল শিখিয়া লইয়াছে। সে নিজে একটা হোটেল খুলিবে। হোটেলের বাহিরে লেখা থাকিবে—

হাজারি চক্রবর্তীর হিন্দু-হোটেল
রাণাঘাট

ভদ্রলোকদের সন্তায় আহার ও বিশ্রামের স্থান।
আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!!

কর্তার মত তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া টিকিট বিক্রয় করিবে। রাধুনী-বামন ও বি 'বাবু' বলিয়া ডাকিবে। সে নিজে বাজারে গিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনিবে, এ হোটেলের মত ঘিয়ের উপর সব ভার ফেলিয়া দিয়া রাখিবে না। খন্দেরদের ভাল জিনিস খাওয়াইয়া খুশী করিয়া পয়সা লইবে। সে এই কয় বছরে কুখিয়া দেখিল, লোকে ভাল জিনিস, ভাল রান্না খাইতে পাইলে দু-পয়সা বেশী রেট দিতেও আপত্তি করে না।

এ হোটেলের মত জুয়াচুরি সে করিবে না। মুসুর ডালের সঙ্গে কম দামের খেসারি ভাল চালাইবে না, বাজারের কানা পোকাধরা বেগুন, রেল-চালানি বরফ-দেওয়া সস্তা মাছ বাছিয়া বাছিয়া হোটেলের জন্য কিনিবে না।

এখানে খন্দেরদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত নাই—বাহারা নিতান্ত বিশ্রাম করিতে চায়, কর্তার গদিতে বসিয়া এক-আধটা বিড়ি খায়—কিন্তু তাহার মনে হয় বিশ্রামের ভাল ব্যবস্থা থাকিলে সে হোটলে লোক বেশী আসিবে—অনেকেই খাওয়ার পরে একটু গড়াইয়া লইতে চায়, সে তাহার হোটলে একটা আলাদা ঘর রাখিবে খুচরা খন্দেরদের বিশ্রামের জন্য। সেখানে তক্তাপাশের ওপর শতরশি ও চামর পাতা থাকিবে, বালিশ থাকিবে, তামাক খাইবার বন্দোবস্ত থাকিবে, কেউ একটু ঘুমাইয়া লইতে চাহিলেও অন্যায়সে পারিবে। খাও-দাও, বিশ্রাম কর, তামাক খাও, চলিয়া যাও। রাণাঘাটের কোনো হোটলে এমন ব্যবস্থা নাই, যদি বাড়িঘরের হোটলেও না। বাবসা ভাল করিয়া চালাইতে হইলে এ-সব ব্যবস্থা দরকার, নইলে রেলগাড়ীর সময়ে ইস্টিশানে গিয়া শুধু 'আসুন বাবু, ভাল হিন্দু-হোটেল' বলিয়া চেঁচাইলে কি আর খন্দের আসে?

খন্দেররা খোঁজে আরামে ভাল খাওয়া। যে দিতে পারিবে, তাহার ওখানেই লোক কুণিকিবে।

অবশ্য ইহা সে বোঝে, আজ যদি একটা হোটলে বিশ্রামের ঘর করে, তবে দেখিতে দেখিতে কালই রাণাঘাটের বাজারময় সব হিন্দু-হোটলেই দেখাদেখি বিশ্রামের ঘর খুলিয়া বসিবে—যদি তাহাতে খন্দের টানা যায়।

তবুও একবার নাম বাহির করিতে পারিলে, প্রথম যে নাম বাহির করে তাহারই নুবিধা। আরও কত মতলব হাজারির মাধ্যমে আছে, শুধু খন্দেরের বিশ্রাম ঘর কেন, মৌকন্দমা মামলা বাহারা করিতে আসে। তাহার সারাদিনের খাটনির পরে হয়তো খাইয়া-দাইয়া একটু তাস খেলিতে চায়—সে ব্যবস্থা থাকিবে, পান-তামাকের দাম দিতে হইবে না, নিজেরাই সাজিয়া খাও বা হোটেলের চাকরেই সাজিয়া দিক।

চূর্ণা নদীর ধারে বসিয়া একা ভাবিলে এমন সব কত নতুন নতুন মতলব তাহার মনে আসে। কিন্তু কখনো কি তাহা ঘটিবে? তাহার মনের আশা পূর্ণ হইবে? বরস তো হইয়া গেল ছেঁচালিশের উপর—সারাজীবন কিছুর করিতে পারে নাই, সাত টাকা মাহিনার

চাকুরি আজও খুঁচিল না—জাঁ-পোষা গরীব লোক, কি করিয়া কি হইবে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না।

তবু সে কেন ভাবে রোজ এ-সব কথা। এই চুর্ণ নদীর ধারে বাসিয়া? ভাবিতে বেশ লাগে, তাই ভাবে।

তবে বয়স হইয়াছে বলিয়া দমিবার পাত সে নয়। ছেঁচিল্লশ বছর এমন কিছু বয়স নয়। এখনও সে অনেকদিন বাঁচবে। কাজে উৎসাহ তাহার আছে, হোটেল খুলিতে পারিলে সে দেখাইয়া দিবে কি করিয়া সুনাম করিতে পারা যায়। হোটেল খুলিয়া মরিয়া গেলেও তাহার দুঃখ নাই।

সময় হইয়া গেল। আর বেশীক্ষণ বাসিয়া থাকা চলিবে না। পশ্চিম ষ্ট্রিট এতক্ষণ উল্টুনে আঁচ দিয়াছে, দেরি করিয়া গেলে তাহার মুনখাড়া খাইতে হইবে। আর কি লাগানি-ভাঙানি! কর্তার কাছে লাগাইয়াছে সে নাকি গাঁজা খায়—অথচ সে গাঁজা ছোঁয় না কস্মিনকালে।

ফিরিয়ার পক্ষে ছোট বাজারে রাখাবল্লভ-তলা।

হাজারি ঠাকুর প্রতিদিন এখানে এই সময়ে ভক্তিরয়ে প্রণাম করিয়া যায়।

—বাবা রাখাবল্লভ, তোমার চরণে পড়ে আছি ঠাকুর! মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো। পশ্চিম ষ্ট্রিট ঝাঁটা খেতে আর পারি নে। ওই কর্তাবাবুর হোটেলের পাশে পশ্চিম ষ্ট্রিট দেখিয়ে দেখিয়ে যেন হোটেল খুলতে পারি।

হোটেল ফিরিয়া দেখিল রতন ঠাকুর এখনও আসে নাই, পশ্চিম ষ্ট্রিট উল্টুনে আঁচ দিয়া কোথায় গিয়াছে।

রোজ চক্রান্ত দিবানিন্দা হইতে উঠিয়া বাসা হইতে ফিরিয়াই হাজারিকে ডাক দিলেন।

—শোনো। আজ আমাদের এখানে ক'জন বাবু মাংস খাবেন, ফিফ্টি করবেন, তাঁরা আমার আগাম দামও দিয়ে গেলেন। যাতে সকাল সকাল চুকে যায় তার ব্যবস্থা করবে। ওঁরা মুরশিদাবাদের গাড়ীতে আবার চলে যাবেন। মনে থাকবে তো? রতন এখনও আসে নি?

হাজারির দুঃখ হইল, বেচু চক্রান্ত একথা তাহাকে কেন বলিল না যে, তাহার হাতের রান্না খুব ভাল, অতএব সে যেন নিজেই মাংস রাঁধে। কখনো ইহারা তাহার রান্না ভাল বলে না সে জানে। অথচ এই রান্না শিখিতে সে কি পরিশ্রমই না করিয়াছে!

—রান্না কি করিয়া ভাল শিখিল, সে এক ইতিহাস।

হাজারির মনে আছে, তাহাদের এড়োশোলা গ্রামে একজন সেকানের প্রাচীন রান্না বিধবা থাকতেন, তখন হাজারির বয়স নয়-দশ বছর। রান্নার তাঁর শূদ্ধ সাধারণ ধরণের সুখ্যাতি নয়, অসাধারণ সুনামও ছিল। গ্রামেও বাহিরেও অনেক জায়গায় লোকে তাঁর নাম জানিত।

হাজারির মা তাঁকে বলিল—খুড়ীমা, আপনার তৌ বয়েস হয়েছে, কবে চলে যাবেন—আপনার গুণ আমাকে দিয়ে যান। চিরকাল আপনার নাম করবো।

তিনি বলিলেন—আচ্ছা তাকে বৌ একটা জিনিস দিয়ে যাবো। কি ক'রে নিরীম্ম চচ্চড়ি রখিতে হয় সেটাই তাকে দিয়ে যাবো।

সেই বৃদ্ধা হাজারির মাকে ওই একটামাত্র জিনিস শিখাইয়াছিলেন এবং সেই একটি জিনিস রাখিবার গুণেই হাজারির মায়ের নাম ও-দিকের আট-দশখানা গ্রামে প্রসিদ্ধ ছিল। শুনিতে অতি সামান্য জিনিস—নিরীম্ম চচ্চড়ি, ওর মধ্যে আছে কি? কিন্তু এক-কথার জবাব পাইতে হইলে হাজারির মায়ের হাতের নিরীম্ম চচ্চড়ি খাইতে হয়।

দুঃখের বিষয় তিনি আর কাঁচিয়া নাই, ও-বৎসর দেহ রাখিয়াছেন।

হাজারি মায়ের রন্ধন-প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে—মাংস, মাছ সবই গ্রাণ্ধে ভাল—কিন্তু তার হাতের নিরনিম্ব চর্কাড়ি এত চমৎকার যে, বেচু চর্কান্তর হোটেল একবার যে খাইয়া যায়, সে আবার ঘূরিয়া সেখানেই আসে। রেল-বাজারে তো অতগুলো হোটেল রহিয়াছে—সে আর কোথাও বাইবে না।

আজও মাংস রান্না রাঁধবার ভার তাহারই উপর পড়িল। খন্দেররা মাংস খাইয়া খুব তারিফও করিতে লাগিল। কিন্তু আসলে তাহাতে হাজারির ব্যক্তিগত লাভ বিশেষ কিছুই নাই—খন্দেরের মূখের প্রশংসা ছাড়া। পক্ষি কি তাহাকে একটা উৎসাহের কথাও বলিল না। বেচু চর্কান্তরও তাই।

অনেক রাত্রে সে খাইতে বসিল। এত যে ভাল করিয়া নিজের হাতে রান্না মাংস, তাহার নিজের জন্য তখন আর কিছুই নাই। যাহা ছিল; কর্তাবাবু নিজের বাসায় পঠাইয়া দিয়াছেন। তার পরেও সামান্য কিছু যা অবশিষ্ট ছিল, পক্ষি কি চাটিয়া-পুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

খাইবার সময় রোজই এমন মূর্শকিল ঘটে। তাহার জন্য বিশেষ কিছুই থাকে না, এক-একদিন ভাত পর্য্যন্ত কম পড়িয়া যায়—মাছ, মাংস তো দূরের কথা। বয়স ছে'চল্লিশ হইলেও হাজারি খাইতে পারে ভাল, খাইতে ভালও বাসে—কিন্তু খাইয়া অধিকাংশ দিনই তার পেট ভরে না।

রাত সাড়ে বারোট। কর্তাবাবু হিসাব মিলাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। হোটেল সে আর মতি চাকর ছাড়া আর কেহ রাত্রে থাকে না। পক্ষি কি অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—রাত দশটার পরে সে থাকে না কোনোদিনই।

মতি চাকর বলিল—চলো, ছোট বাজারে যাত্রা হচ্ছে, শুনতে যাবে বামুনঠাকুর ?

—এত রাত্রে যাত্রা ? পাগল আর কি ! সারাদিন খেটে আবার ও-সব শখ থাকে ? আমি যাবো না—তুই হাস্ তো যা। এসে ভাঁড়ার ঘরের জানালায় টোকা মারিস্। দোর খুলে দেবো।

মতি চাকর ছোকরা মানুষ। তাহার শখও বেশী। সে চলিয়া গেল।

মতি যাইবার কিছুক্ষণ পরে কে একজন বাহির হইতে দরজা ঠেলিল। হাজারি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া পাশের হোটেলের মালিক খোদ যদু বাঁড়ুয়াকে দরজার বাহিরে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয়ের হোটেলের সঙ্গে তাহাদের রেযারেসি করিয়া কলবার চলে। তিনি এত রাত্রে এখানে কি মনে করিয়া ? কখনো তো আসেন না ! হাজারির মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গেল, যদু বাঁড়ুযোও একটা হোটেলের কর্তা, সুতরাং হাজারির কাছে সেও তার মানবের সমান দরের লোক, এক রকম মনিবই।

যদু বাঁড়ুযো বলিল—আর কে আছে ঘরে ?

যদুর আসিবার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া হাজারি ততক্ষণে মনে মনে আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিল—বিনীত ভাবে বলিল—কেউ নেই বাবু, আমিই আছি। মতি ছিল, ছোট বাজারে যাত্রা—

যদু বাঁড়ুযো বলিল—চল ঘরের মধ্যে বসি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরের মধ্যে চুকিয়া যদু বাঁড়ুযো বেচু চর্কান্তর গর্দভে বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর ?

—আজ্ঞে সাত টাকা আর খোরাকী।

—কাপড়-চোপড় দেয় ?

—আজ্ঞে বছরে দু'খানা কাপড়।

যদু বাঁড়ুযো কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া বলিলেন—শোন, আমার হোটেল তুমি

কাজ করতে যাবে? তোমায় দশ টাকা আর খোরাকী দেবো। বছরে তিনখানা কাপড় পাবে। ধোপা-নাঁপিত, তেল-তামাক। যাবে?

হাজারি দম্ভুরমত অম্বাক হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ সে কথা বলিতে পারিল না। তার পর বলিল—বাবু, এখন তো কিছু বলতে পারি নে। ভেবে বলবো।

—ভেবে বলাবলি আর কি, আমার যে কথা সেই কাজ। তুমি কাল থেকে এ হোটেল ছেড়ে আমার হোটেলে চলো, কাল থেকেই আমি নিতে রাজি। তবে হ্যাঁ, বেচু চক্ৰান্তর সঙ্গে আমি অস্বসর করতে চাইনে। সেও ব্যবসাদার, আমিও ব্যবসাদার।

হাজারির মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। কেহ দেখিতেছে না তো? পদ্ম বি কোথাও আড়ি পাতিয়া নাই তো? সে তাড়াতাড়ি বলিল—এখন আমি কোন কথা বলতে পারবো না বাবু। কাল ভেবে বলবো। কাল রাত্তিরে এমন সময় আসবেন।

যদু বাঁড়ুখো চলিয়া গেল।

হাজারি গাঁজা খায় এ খবর একেবারে মিথ্যা নয়, তবে খায় খুব সংগোপনে এবং খুব কম। আজ এ ব্যাপারের পরে সে এক কলিকা গাঁজা না সাজিয়া পারিল না। সংসারে কেহ এ পর্যন্ত তাহাকে ভাল লোক বা ভাল রাঁধে বলিয়া খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পুস্কর দিতে চায় নাই—খন্দেরের মূখে ফাঁকা কথার পেট ভরে না তো!

যদু বাবু নিজে বাড়ী বহিয়া আসিয়াছেন, তাহাকে দশ টাকা মাহিনার চাকরি (মায় খোরাকী ধোপা নাঁপিত) দিতে!

এতদিন রাণাঘাটের বাজারে আছে—কখনও কাহারও সঙ্গে মেশে না সে—মিশিতে ভালবাসে না। তাহার জীবনের আশা যে-টা, সে-টা দশজনের সঙ্গে মিশিয়া আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে পূর্ণ হইবে না। তাহাকে খাটিতে হইবে, বাজার কুঁকিতে হইবে, হিসাব রাখা শিখিতে হইবে, একটা ভাল হোটেল চালাইবার যাহা কিছু মূল্যক সম্ভান সব সংগ্রহ করিতে হইবে। সংসারে উন্নতি করিতে হইলে, দেশের কাছে হুড় মূখ দেখাইতে হইলে, পরের মূখে নিজের নাম শুনিতে হইলে—সেজন্য চেষ্টা চাই, খাটুনি চাই। আড্ডা দিয়া গাঁজা খাইয়া বেড়াইলে কিংবা মতি চাকরের মত ছোট বাজারের বারো-য়ারীর যাত্রা শুনিয়া বেড়াইলে কি হইবে?

রাত অনেক। মাথা গরম হইয়া গিয়াছে। ঘুম আসার নামটি নাই।

দরজায় খট্‌খট্‌ শব্দ হইল। হাজারি উঠিয়া দরজা খুলিল—সে আগেই বুঝিয়াছিল মতি চাকুর ফিরিয়াছে। মতি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—এখনো ঘুমোওনি ঠাকুর? এখনো জেগে যে!

হাজারি গাঁজার কলিকা লুকাইয়া রাখিয়া তবে মতিকে দরজা খুলিয়া দিতে গিয়াছিল। বলিল—যে গরম, ঘুম আসবে কি, সারাদিন আগুনের তাতে—যাত্রা দেখালি নে?

মতি বলিল—যাত্রার আসরে জায়গা নেই। লোক ভর্তি। ফিরে এলাম। চল এক জায়গায়, যাবে ঠাকুরমশায়?

—কোথায়?

—পাড়ার মধ্যে। চলো না—ঘুম যখন নেই, একটু ঘুরেই না হয় এলে। তোর ততো কোনদিন কোথাও—

হাজারি বলিল—তোরা ছেলে-ছোকরা আমার বয়স ছেঁচলিশ। আমি তোর বাপের বয়সের মানুষ, আমার সঙ্গে ও-সব কথা কেন?...তোর ইচ্ছে, যা বুঝিস, করগে যা!

—বাবুর কাছে কি পদ্মদিদির কাছে কিছু ব'লো না ঠাকুরমশাই, দোহাই, মতি পায়ে পড়ি।

আশ্চর্য্য এই যে, মন্দির এই কথা হাজারির মনে এক নতুন ধরণের ভাবনা আনিয়া দিল। তাহার উচ্চাশা আছে, মন্দির মত রাত বেড়াইয়া স্ফুর্তি করিয়া সময় নষ্ট করিলে ভগবান তাহাকে দয়া করিবেন না। মতি কি ভাবিয়া আর বাহিরে গেল না, বাসনের ঘরে (হোটেলের পিতল কাঁসার থালা-বাটি রান্নাঘরের পাশে সিন্দুকে থাকে, মজাঘবার পর রোজ রাতে বেচু চক্ৰান্তি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সেগুদীল গুঁণিয়া সিন্দুকে তুলিয়া রাখিয়া চাঁবি নিজে সপে করিয়া লইয়া যান) গিয়া শইয়া পড়িল। হাজারিও বাসনের ঘরে শোয়, আজ সে বাহিরের গদির মেজেতে তাহার পুরোনো মাদুরখানা পাতিয়া শইল।

না—মদুবাবুর হোটেলের সে যাইবে না। হোটেলের রাঁধুনিগিরি সব জায়গায় সমান। এ হোটেলের আছে পশ্ম, ও হোটেলের হয়তো আবার কে আছে কে জানে? তা ছাড়া, বেচুবাবু তাহার পাঁচ বছরের অন্নদাতা। লেভে পড়িয়া এতদিনের অন্নদাতাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া ঠিক নয়।

সে নিজে হোটেল খুলিবে, এই তো তাহার লক্ষ্য। রাঁধুনি-বাঁস্তি যতদিন করিতে হয়, এই হোটেলেরই করিবে। অন্য কোথাও যাইবে না। তাহার পর রাধাবল্লভ দয়া করেন, তখন অন্য কথা।

পরদিন খুব সকালে পশ্ম বি আসিয়া ডাকিল—ও ঠাকুর, দোর খোল—এখনও ঘুম—বারাঃ! কুম্ভকর্ণকে হার মানালে তোমরা!

হাজারি তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া ছেঁড়া মাদুরখানা গুটাইয়া রাখিয়া দোর খুলিয়া দিল। একটু পরেই বেচু চক্ৰান্তি আসিলেন। দরজায়, গদিতে ও ক্যাশ-বাক্সে গম্ভী জলের ছিটা দিয়া, ক্যাশ-বাক্সের ডালার উপরটা সামান্য একটু গম্ভীজল দিয়া মাজুনা করিয়া লইয়া পশ্ম কিকে বলিলেন—ধুনো দে—বেলা হয়ে গেল। আজ হাটবার, ব্যাপারীদের ভিড় আছে, শীগ্গির ক'রে আঁচ দে—আর সেদিনকার মত পচা দই-টাই আনিব্ নে বাপু। ওতে নাম খরাপ হয়ে যায়—শেষকালে স্যানিটারি বাবুর চোখে পড়ে যাবে। দরকার কি?

ব্যাপারীরা সাধারণতঃ পাড়গাঁয়ের চাষা লোক। তাহারা দই খাইতে গছন্দ করে বলিয়া প্রতি হাটবারে তাহাদের জন্য কয়েক হাঁড়ি দইয়ের বরাদ্দ আছে। এই দই পশ্ম বি তাহার নিজের ঘরে পাতিয়া হোটেলের বিক্রয় করিয়া দই পয়সা লাভ করিয়া থাকে। এবং সে যে প্রথম শ্রেণীর জিনিস সরবরাহ করে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

পশ্ম বি মূষ ঘুরাইয়া বলিল—বাবু আপনার যত সব অনাচ্ছিন্ত কথা! দই পচা না ঘট, কে বল্চে দই পচা! ওই মূষপোড়া হাজারি ঠাকুর তো? ওর ছেরাম্দের চাল যদি আজ—

হাজারি ঠাকুর কঁধাটা বলিয়াছিল বটে—তবে সে দই পচা কি তাজা তাহা বলে নাই—বলিয়াছিল ব্যাপারী খন্দেররা বলাবলি করিতেছিল এ রকম খরাপ দই খাইতে দিলে তাহারা চোন্দ পয়সার জায়গায় বারো পয়সার বেশি খেয়রাকি দিবে না।

পশ্ম বি রান্নাঘরের চৌকাঠে পা দিয়া রাজাঘোড়া ঝগড়ার সুরে বলিল—বলি, ও ঠাকুর—দই পচা তোমাকে কে বলেচে?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল—ওই সাবু মন্ডল আর তার ভাইপো রোজ হাটেই তো এখানে যায়—ওরাই বলাছিল—

—বলাছিল! তোমার গলা ধরে বলতে গিয়েছে ওরা! তোমার মত হিংসুক কুচুটে লোক তো কখন দেখিনি—আমি দই দই বলে তুমি হিংসেয় বুক ফেটে মরে যাচ্ছ সে কি আমি বুঝিনে! তোমার শখের কুসুম গরলানীর ছাপ-বাক্সে পয়সা না উঠলে কি আর

তোমার মনে শান্তি আছে!...গাঁজাখোর মড়ুই-পোড়া বামুন কোথাকার!

হাজারি জিত্ কাটিয়া বলিল—ছি ছি, কি যে বলো পশ্চাদ্দিত তার ঠিক নেই—কুসুমের বাপের বাড়ী আমাদের গাঁয়ে, আমার জাঠা ব'লে ডাকে, আমি তাকে মেয়ে বলি—তার নামে অমন কথা বল্লে তোমার পাপ হবে না?

ইহার উত্তরে পশ্চিমা বাহা বলিল, তাহা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা যায় না।

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। কুসুমকে সে সত্যই মেয়ের মত স্নেহ করে—তাহাদের গ্রামের রসিকলাল ঘোষের মেয়ে—রাণাঘাটে তাহার শ্বশুরবাড়ী—অস্পবয়সে বিধবা হইয়াছে, এখন দুধ বোঁচিয়া, দই বোঁচিয়া ছোট ছোট দুইটি ছেলেকে মানুষ করে। এক শাশুড়ী ছাড়া শ্বশুরবাড়ীতে কেহ নাই।

হঠাৎ একদিন পথে দু'জনের দেখা।

—জ্যাঠামশায় যে! দাঁড়ান একটু পায়ের ধুলো দিও। আপনি এখানে কোথায়?

—আরে কুসুম, কোথেকে তুই এখানে?

—এই তো আমার শ্বশুরবাড়ী, ছোট বাজারে মন্দিরের গায়েই। আপনি কি আজ বাড়ী থেকে এসেছেন?

—না রে—আমি রেল-বাজারে হোটলে কাজ করি। আজ মাস ছ'সাত আছি।

বিদেশে একই গ্রামের মানুষ দেখিয়া দু'জনেই খুব খুশী হইল। সেই হইতে কুসুম হাজারি ঠাকুরের হোটলে দুধ দই বোঁচিতে গিয়াছে। গরীব বলিয়া হাজারি ঠাকুর অনেকবার লুকাইয়া হোটেল হইতে রাধা ভাত-তরকারি তাহাকে থালা করিয়া বাড়িয়া দিয়াছে। দুধ দই বোঁচিয়া ফিরিবার সময় কুঁড়ুদের পাটের আড়তের গলিটার দাঁড়ইয়া কুসুম থালা লইয়া গিয়াছে। ইহাদের মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতা পশ্চিমা কির চোখ এড়ায় নাই, মৃতরাং সে বলিতেই পারে।

দুপরের পর হাজারি প্রতিদিনের মত চুর্ণীর ধারে যাইতেছে—এমন সময় কুসুমের সঙ্গে দেখা হইল।

কুসুম দুধের ভাঁড় হাতে ঝুলাইয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। তাহার বয়স চাবিশ-পঁচিশ, বেশ স্বেচ্ছা, রং শ্যামবর্ণ, মুখশ্রী বেশ শান্ত।

হাজারি বলিল—বাড়ী ফিরিছিস এত বেলায় যে!

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, বস্তু দেয়ি হয়ে গেল। নিজের তো দুধ নেই—কায়ের পাড়া থেকে দুধ আনি, তবে বিক্রী করি, তবে বাড়ী ফিরি। আসুন না আমাদের বাড়ী।

—না, এখন আর কোথায় যাবো! তুই যা, খাবি-দাবি।

কুসুম কিছুতেই ছাড়ি না, বলিল—আমার খাওয়া-দাওয়া জ্যাঠামশায়, শাশুড়ী রেখে রেখে দিয়েচে গিয়ে খাবো; কতক্ষণ লাগবে? আসুন না।

হাজারি অগত্যা গেল। ছ'চালা একখানা বড় ঘর, সেখানেতে কুসুমের শাশুড়ী থাকে—আর একখানা ছোট চারচালা ঘরে কুসুম ছেলে দুটি লইয়া থাকে। শাশুড়ীর সহিত কুসুমের খুব সম্ভাব নাই।

কুসুম নিজের ঘরে হাজারিকে লইয়া গিয়া বসাইল। ঘরের মধ্যে একখানা তক্ত-পোশ, পুর, কাঁথা পাতিয়া সুন্দর পরিপাটি বিছানা তাহার উপরে। তক্তপোশের নীচে বালি দেওয়া আর বছরের আলু। এককোণে কতকগুলি হাঁড়িভাঙ ও একটা বড় জালা—বাঁশের আলুনাতে কতকগুলি লেপ-কাঁথা বাঁধা। একটা জলচৌকিতে খানকতক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বকরকে পিতল কাসার বাসন। ঘর দেখিয়া হাজারির মনে হইল—কুসুম বেশ সাজাইয়া রাখিতে জানে জিহ্নিসপত্ত।

কুসুম বলিল—পান খাবেন জ্যাঠামশায় ?

—দে একটা। আর তুই খেতে যা। বেলা অনেক হয়েছে।

কিন্তু কুসুমের দেখা গেল, খাওয়ার সম্বন্ধে কোনো তাড়া নাই। হাজারিকে পান দিয়া সেই যে হাজারির সামনে মেজেতে বসিয়া গল্প করিতে লাগিল—প্রায় ঘণ্টাখানেক হইয়া গেল। সে নড়িবার নামও করে না দেখিয়া হাজারি ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বলিল—তুই খেতে যা না। আমি বাই, আবার উনুনে আঁচ দিতে হবে সকাল সকাল।

কুসুম বলিল—বাঁচ্ছ এবার।

বলিয়া আরও আধঘণ্টা কাটিয়া গেল।

কুসুম দেশে আর যায় নাই। বাবা মারা গিয়াছে, ভাইবোরা গরীব বলিয়া হউক বা ভাইবোদের জন্যই হউক—তাহাকে বাপের বাড়ীতে কেহ লইয়া যায় না। নিজে দু-একবার গিয়াছিল, বেশী দিন টিকিতে পারে নাই। ভাইবোদের ব্যবহার ভাল নয়।

হাজারির সঙ্গে কুসুম সেই সব কাহিনীই বলিতে লাগিল। ছেলেবেলায় গ্রামে কি পথে করিয়াছিল কি, সেই বিষয়ে কথাও তাহার আর ফুরায় না।

—এখানে ছেলার শাক পরসা দিয়ে কিনতে হয়। আমাদের গাঁয়ের মৃগী পাড়ার মাঠে আমরা ছেলার শাক তুলতে যেতাম জ্যাঠামশায়—একবার, তখন আমার বয়েস ন'বছর, আমি আর সাধু কুমোরের মেয়ে আদর, আমরা দুজনে গিয়েছি ছেলার শাক তুলতে—একটা মিনেস দেশি জ্যাঠামশায় ছেলার ক্ষেতে বসে কাঁচ ছোলা তুলে তুলে খাচ্ছে। আমাদের না দেখে দোড় দোড়, বিষম দোড়! আমরা তো হেসে বাঁচিনে—ভেবেছে বুঝি আমাদের ক্ষেত!

বলিয়া কুসুম মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি!

হাজারি দেখিল, ইহার ছেলেমানুষী গল্প শুনিতে গেলে ওঁদিকে হোটলে বাইতে বিলম্ব হইবে—গল্প ঝি মৃগ-নাড়ার চোটে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে।

সে উঠিতে বাইতেছে, কুসুম বলিল—দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, আপনার জন্যে একটা জিনিস করে রেখিছি। সেইটে দেবার জন্যেই আপনাকে নিয়ে এলাম।

বলিয়া একটা কাপড়ের পুটলি খুলিয়া একখানা কাঁথা বাহির করিয়া হাজারির সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল—কেমন হয়েছে কাঁথাখানা?

—বাঃ, বেশ হয়েছে রে!

কুসুম কাঁথাখানি পাট করিতে করিতে হাসিমুখে বলিল—আপনি এখানা রাত্রে পেতে গেলেন। আপনি শুধু মাদুরের উপর শুয়ে থাকেন হোটলে,—আমরা অনেক দিনের ইচ্ছে একখানা কাঁথা আপনাকে সেলাই করে দেব। তা দু-তিন মাস ধরে একটু একটু করে এখানা আজ দিন পাঁচ-ছয় হ'ল শেষ হয়েছে।

হাজারি ভারি খুশী হইল।

কুসুমের বাবা রাসিক ঘোষ প্রায় তাহার সমবয়সী। কুসুম তাহার মেয়ের সমান। একই গাঁয়ের লোক—তাহা হইলেও কি সুবাই করে? গাঁয়ে তো কত লোক আছে!

মুখে বলিল, বেঁচে থাক মা, মেরে না হ'লে বাপের জন্যে এত আশ্রয় দেখায় কে? ভারী চমৎকার কাঁথা। আমি পেতে শুয়ে বাঁচিবো এখন। ভারী চমৎকার কাঁথা। বেশ, বেশ!

কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, আপনি তো বলছেন মেরে না হ'লে কে করে—কিন্তু আমিও বলছি, বাবা না হ'লে হোটেল থেকে নিজের মৃত্যুর ভাতের খদ্দা কে মেরেকে দেয় লুকিয়ে—প্রায় মাসের সেই উপব্রান্ত বাদলায়—

কুসুমের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে সে বাঁ-হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া চুপ করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—মাথার ওপর ভগবান জানেন—আর কেউ জানে না—আপনি আমার জন্যে যা করছেন। আপনি ব্রাহ্মণ, দেবতা—আমি ছোট জাতের মেয়ে—আমার ছোট মুখে বড় কথা সাজে না, তবে আমিও বলছি ওপরের দেলেওয়ালা আপনাকে ভাতের থালার বদলে মোহরের থালা যেন দেন। আমিও যেন দেখে মরি।

বলিয়াই সে আসিয়া হাজারির পায়ে গড় হইয়া গলার আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

সেদিন ছিল বেশ বর্ষা।

হাজারি দেখিল, হোটেলের গদির ঘরে অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া আছে। অন্যদিন এ ধরনের খন্দের এ হোটেলের সাধারণতঃ আসে না—হাজারি ইহাদের দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল।

বেচু চক্ৰান্ত ডাকিল—হাজারি ঠাকুর, এদিকে এস—হাজারি গদির ঘরে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে ভদ্রলোকদের একজন বলিলেন—এই ঠাকুরটির নাম হাজারি?

বেচু চক্ৰান্ত বলিল—হাঁ বাবু, এরই নাম হাজারি।

বাবুটি বলিলেন—এর কথাই শুনেছি। ঠাকুর তুমি আজ বর্ষার দিনে আমাদের মাংস খোলাও রেখে ভাল করে খাওয়াতে পারবে? তোমার আলাদা মজুরী যা হয় দেবো।

বেচু বলিল—ওকে আলাদা মজুরী দেবেন কেন বাবু, আপনাদের আশীর্বাদে আমার হোটেলের নাম অনেক দূর অর্থাৎ লোকে জানে। ও আমারই ঠাকুর, ওকে কিছু দিতে হবে না। আপনারা যা ইচ্ছা করবেন তা ও করবে।

এই সময় পশ্চিম ঝি বেচু চক্ৰান্তের ডাকে ঘরে ঢুকিল।

বেচু চক্ৰান্ত কিছু বলিবার পূর্বে জনৈক বাবু বলিল—ঝি, আমাদের একটু চা ক'রে খাওয়াও তো এই বর্ষার দিনটোতে। না হয় কোনো দোকান থেকে একটু এনে দাও। বুঝলেন চক্ৰান্ত মশায়! আপনার হোটেলের নাম অনেক দূর পর্য্যন্ত যে গিয়েছে বঙ্গের—সে কথা মিথ্যে নয়। আমরা এখন আজ শিকারে বেরিয়েছি, তখন আমার পিসতুতো ভাই ব'লে দিয়েছিল, রাণাঘাট যাচ্চ, শিকার ক'রে ফেরবার পথে রেল-বাজারের বেচু চক্ৰান্তের হোটেলের হাজারি ঠাকুরের হাতে মাংস খেয়ে এসো। তাই আজ সারাদিন জলার আর বিলে পাখী মেরে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ভাবলাম, ফিরবার গাড়ী তো রাত দশটায়। তা' এ বর্ষার দিনে গরম গরম মাংস একটু খেয়েই যাই। মজুরী কেন দেব না চক্ৰান্ত মশায়? ও আমাদের রান্না করুক, আমরা ওকে খুশি ক'রে দিয়ে যাবো। ওর জন্যেই তো এখানে আসা। কথা শুনিয়া হাজারি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল, আরও সে খুশি হইল এই ভাবিয়া যে, চক্ৰান্ত মশায়ের কানে কথাগুলি গেল—তাহার ঠাকুরির উন্নতি হইতে পারে। মনিবের সুনজরে পড়িলে কি না সম্ভব? খুশির চোটে ইহা সে লক্ষাই করিল না যে, পশ্চিম ঝি তাহার প্রশংসা শুনিয়া এদিকে হিংসার নীলবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

বাবুরা হোটেলের উপর নিভর করিল না—তাহারা জিনিসপত্র নিজেরাই কিনিয়া আনিল। হাজারি ঠাকুর মাংস প্রার্থনার একটি বিশেষ প্রণালী জানে। মাংস একটুকু জল না দিয়া নেপালী ধরনের মাংস রান্নার কাঙ্গদা সে তাহাদের গ্রামের নেপাল-ফেরত ডাক্তার শিবচরণ গাঙ্গুলীর স্ত্রীর নিকট অনেকদিন আগে শিখিয়াছিল। কিন্তু হোটেলের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার মধ্যে মাংস কোনদিনই থাকে না—তবে বাঁধা খরিশদারগণের মনস্তত্ত্বের জন্য মাসে একবার বা দু'বার মাংস দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বটে—সে রান্নার মধ্যে বিশেষ

কৌশল দেখাইতে গেলে চলে না, বা হাজারির ইচ্ছাও করে না—যেমন ভাল প্রোতা না পাইলে গায়কের ভাল গান করিতে ইচ্ছা করে না—তেমনি।

হাজারি ঠিক করিল, পশ্ম ঝি তাহাকে দুই চক্ষু পাড়িয়া যেমন দেখিতে পারে না—তেমনি আজ মাংস রাঁধিয়া সকলের বাহবা লইয়া পশ্ম ঝির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে, তাহাকে খত ছোট মনে করে ও, তত ছোট সে নয়। সেও মানদু, সে অনেক বড় মানদু।

ভাল যোগাড় না দিলে ভাল রান্না হয় না। পশ্ম ঝি যোগাড় দিবে না এ জানা কথা। হোটেলের অন্য উড়ে বান্দনটিকে বলিতে পারা যায় না—কারণ সে-ই হোটেলের সাধারণ রান্না রাঁধিবে।

একবার ভাবিল—কুসুমকে আমবো?

পরক্ষণেই স্থির করিল, তার দরকার নাই। লোকে কে কি বলিবে, পশ্ম ঝি তো বর্ণিটা পাতিয়া কুটিবে কুসুমকে। যাক্, নিজেই বাহা হয় করিয়া লইবে এখন।

বেলা হইয়াছে। হাজারি বাজার হইতে কেনা ভরি-ভরকারী, মাংস নিজেই কুটিয়া বাছিয়া লইয়া রান্না চাপাইয়া দিল। বর্ণিও যেন নামিয়াছে হিমালয় পাহাড় ভাঙিয়া। কাঠগুলা ভিজিয়া গিয়াছে—মাংস সে কয়লার জ্বলে রাঁধিবে না। তাহার সে বিশেষ প্রণালীর মাংস রান্না কয়লার জ্বলে হইবে না।

সব রান্না শেষ হইতে বেলা দুইটা বাজিয়া গেল। তারপর খরিসন্দার বাবুরা খাইতে বসিল। মাংস পরিবেশন করিবার অনেক পুশ্বেই ওস্তাদ শিল্পীর গর্ব ও আত্ম-প্রত্যয়ের সহিত হাজারি বুকিয়াছে, আজ যে ধরনের মাংস রান্না হইয়াছে—ইহাদের ভাল না লাগিয়া উপায় নাই। হইলও ভাই।

বাবুরা বেচু চক্রান্তকে ডাকাইলেন, হাজারি ঠাকুরের সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিলেন যে, বেচু চক্রান্তও যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল সে কথা শুনিয়া। চাকরকে ছোট করিয়া রাঁধিয়া মনিবের সন্নিধি আছে, তাহাকে বড় করিলেই সে পাইয়া বসিবে। যাইবার সময় একজন বাবু হাজারিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন—তুমি এখানে কত পাও ঠাকুর?

—সাত টাকা আর খাওয়া-পরা।

—এই দুটো টাকা তোমাকে আমরা বকশিশ দিলাম—চমৎকার রান্না তোমার। যখন আবার এদিকে আসবো, তুমি আমাদের রোঁধে খাইও।

হাজারি ভারি খুশি হইল। বকশিশ ইহারা হয়তো কিছু দিবেন সে আশা করিয়া ছিল বটে, কিন্তু দু-টাকা দিবেন তা সে ভাবে নাই।

যাইবার সময় বেচু চক্রান্তের সামনে বাবুরা হাজারির রান্নার আশ্রয় এক দফা প্রশংসা করিয়া গেলেন। আর একবার শীঘ্রই শিকারে আসিবেন এদিকে। তখন এখানে আসিয়া হাজারি ঠাকুরের হাতে মাংস না খাইলে তাঁহাদের চলিবেই না। বেশ হোটেল করেছেন চক্রান্ত মশায়।

বেচু চক্রান্ত বিনীত ভাবে কাঁচুমাচু হইয়া রান্না—আজ্ঞে বাবু মশায়েরা রাজসই লোক, সব দেখতে পাচ্ছেন, সব বুঝতে পাচ্ছেন। এই রাণাঘাট রেল-বাজারে হোটেল আছে অনেকগুলো, কিন্তু আপনাদের মত লোক যখনই আসেন, সকলেই দয়া করে এই গরীবের কুড়োতেই পায়ের ধূলো দিয়ে থাকেন। তা আসবেন, যখন আপনাদের ইচ্ছা হয়, আগে থেকে একখানা চিঠি দিবেন, সব মজুদ থাকবে আপনাদের জন্যে; বলবেন কলকাতায় ফিরে দু'চারজন আলাপী লোককে—যাতে এদিকে এলে তাঁরাও এখানেই এসে ওঠেন। বাবু—তা আমার বান্দনের মজুরীটা?...হেঁ-হেঁ—

—কত মজুরী দেবো ?

—তা দিন বাবু একবেলার মজুরী আট আনা দিন।

বাবুরা আরও আট আনা পয়সা বেচুর হাতে দিয়া চলিয়া গেলেন।

বেচু হাজারী ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—ঠাকুর আজ আর বেরিও না কাথাও ; বেল গিয়েচে। উননে আট আর একটু পরেই দিতে হবে। পশ্ম কোথায় ?

—পশ্মদিদি থালা বাসন বার করচে, ডেকে দেবো ?

পশ্ম ঝি আজ যে মুখ ভার করিয়া আছে, হাজারী তাহা বুঝিয়াছিল। আজ হোটেলের সকলের সামনে তাহার প্রশংসা করিয়া গিয়াছে বাবুরা, আজ আর কি তাহার মনে সুখ আছে ? পশ্ম ঝির মনস্তৃষ্টি করিবার জন্য তাহার ভাতের থালায় হাজারী বেশী করিয়া ভাত তরকারি এবং মাংস দিয়াছিল। পশ্ম ঝি কিছুমাত্র প্রসন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। মুখ যেমন ভার তেমনিই রহিল।

ভাতের থালা উঠাইয়া লইয়া পশ্ম ঝি হঠাৎ প্রশ্ন করিল—রাখা মাংস আর কতটা আছে ঠাকুর ?

বলিয়াই ডেক্‌চির দিকে চাহিল। এমন চমৎকার মাংস কুসুমের ঝাড়ী কিছু দিয়া আসিবে (সে ব্রাহ্মণের বিধবা নর, মাছ-মাংস খাইতে তাহার আপত্তি নাই) ভাবিয়া ডেক্‌চিতে দেড় পোয়া আন্দাজ মাংস হাজারী রাখিয়া দিয়াছিল—পশ্ম ঝি কি তাহা দেখিতে পাইল ?

পশ্ম দেখিয়াছে বুঝিয়া হাজারী বলিল—সামান্য একটু আছে।

—কি হবে ওটুকু ? আমার দাও না—আমার আজ ভাগ্নীজামাই আসবে—তুমি ত মাংস খাও না—

কুসুমের জন্য রাখা মাংস পশ্ম ঝিকে দিতে হইবে—যার মুখ দেখিতে ইচ্ছা করেনা হাজারীর ! হাজারী মাংস খায় না তাহা নয়, হোটেলের মাংস রান্না হইলেই হাজারী নিজের ভাগের মাংস লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসে—নিজেকে বঞ্চিত করিয়া। পশ্ম ঝি তাহা জানে, জানে বলিয়াই তাহাকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা উহার মনে জাগিয়াছে ইহাও হাজারী বুঝিল।

হাজারী বলিল—তোমায় তো দিলাম পশ্মদিদি, একটুখানি পড়ে আছে ডেক্‌চির তলায়—ওটুকু আর তুমি কি করবে ?

—কি করবো বললুম, তা তোমার কানে গেল না ? ভাগ্নীজামাই এসেছে শুনলে না ? যা দিলে এতটুকুতে কি কুপ্‌বে ? ঢেলে দাও ওটুকু।

হাজারী বিপন্ন মুখে বলিল—আমি একটু রেখে দিইছি, আমার দরকার আছে।

পশ্ম ঝি ঘুরিয়া দাঁড়ইয়া শেলয়ের সুরে বলিল—কি দরকার ? তুমি ভোঁ খাও না—কাকে দেবে শুন ?

হাজারী বলিল—দেবো—ও একজন একটু চেয়েছে—

—কে একজন ?

—আছে—ও সে তুমি জানো না।

পশ্ম ঝি ভাতের থালা নামাইয়া হাত নাড়িয়া বলিল—না, আমি জানিনে। তা কি আর জানি ? আর সে জানা-জানি আমার দরকার নেই। হোটেলের জিনিস তুমি কাউকে দিতে পারবে না, তোমায় অনেকদিন বলে দিইছি। বেশ তুমি আমায় না দাও, চক্কান্ত মশায়ের শালাও আজ কলিকাতা থেকে এসেছে—তার জন্যে মাংস বাটি করে আলাদা রেখে দাও—ওবেলা এসে থাকবে এখন। আমি না পেতে পারি, সে হোটেলের মালিকের আপনার লোক, সে তো পেতে পারে ?

যেচু চক্রান্তর এই শালাটিকে হাজারি অনেকবার দেখিয়েছে—মাসের মধ্যে দশ দিন আসিয়া ভগ্নীপতিতর বাড়ী পড়িয়া থাকে, আর কালিপোড়ে ধৃতি পরিয়া টেরি কাটিয়া হোটেলের আসিয়া সকলের উপর কর্তৃত্ব চালায়—কথায় কথায় ঠাকুর-চাকরকে অপমান করে ; চোখ ঝাঙায়, যেন হোটেলের মালিক নিজেই।

তাহাদের গ্রামের মেয়ে, দরিদ্রা কুসুম ভালটা মন্দটা খাইতে পাওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পেটের ভাত জুটাইতে পারে না—তাহার জন্য রাখিয়া দেওয়া এত বস্ত্রের মাংস শেষকালে সেই চালবাজ বার্ডসাই-খোর শালাকে দিয়া খাওয়াইতে হইবে—এ প্রস্তাব হাজারির মোটেই ভাল লাগিল না। কিন্তু সে ভালমানুষ এবং কিছু ভীতু ধরনের লোক, বাহাদের হোটেল, তাহার যদি খাইতে চায়, হাজারি তাহা না দিয়া পারে কি করিয়া—অগত্যা হাজারিকে পশম ঝিরের সামনে বড় জামবারিটে ডেক্‌লি মাংসটুকু ঢালিয়া রামাঘরের কুলঙ্গিতে রেকারি চাপা দিয়া রাখিয়া দিতে হইল।

সামান্য একটু বেলা আছে, হাজারি সেটুকু সময়ের মধ্যেই একবার নদীর ধারে ফাঁকা জায়গায় বেড়াইতে গেল।

আজ তাহার মনে আশ্চর্য্য খুব বাড়িয়া গিয়াছে—দুইটি জিনিস আজ বুঝিয়াছে সে। প্রথম, ভাল রামা সে ভুলিয়া যায় নাই, কলিকতার বাবুদরও তাহার রামা খাইয়া তারিফ করেন। দ্বিতীয়, পরের তাঁবে কাজ করিলে মানুষকে মায়াদরী বিসর্জন দিতে হয়।

আজ এমন চমৎকার রামা মাংসটুকু সে কুসুমকে খাওয়াইতে পারিল না, খাওয়াইতে হইল তাহাদের দিয়া, বাহাদের সে দুই চক্ষু পড়িয়া দেখিতে পারে না। কুসুম বৌদন কাঁথাখানি দিয়াছিল, সৌদন হইতে হাজারির কেমন একটা অন্তত ধরনের স্নেহ পড়িয়াছে কুসুমের ওপর।

বয়সে তো সে মেয়ের সমান বটেই, কাজও করিয়াছে মেয়ের মতই। আজ যদি হাজারির হাতে পরসা থাকিত, তবে সে বাপের স্নেহ কি করিয়া দেখাইতে হয়, দেখাইয়া দিত। অন্য কিছু দেওয়া তো দূরের কথা, নিজের হাতে অমন রামা মাংসটুকুই সে কুসুমকে দিতে পারিল না।

ছেলেবেলাকার কথা হাজারির মনে হয়। তাহার মা গঙ্গাসাগর যাইবেন বলিয়া যোগাড়-বন্দ্য করিতেছেন—পাড়ার অনেক বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া বিধবাদের সঙ্গে। হাজারি তখন আট বছরের ছেলে—সেও ভীষণ বারনা বলিল গঙ্গাসাগর সে না গিয়া ছাড়িবেই না। তাহার বুঝি লইতে কেহই রাজী নয়। সকলেই বলিল—তোমার ও ছেলেকে কে দেখা-শুনো করবে বাপ, অত ছোট ছেলে সেখানে নানান ঝঞ্জি—তাহা তোমার যাওয়া হয় না।

হাজারির মা ছেলেকে ফেলিয়া গঙ্গাসাগরে যাইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁর যাওয়াই হইল না। জীবনে আর কখনোই তাঁর সাগর দেখা হয় নাই, কিন্তু হাজারির মনে মায়ের এই স্মৃতিভাণ্ডারের ঘটনটুকু উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়া আছে।

হাজারি ভাবিল—যাক গে যদি কখনো নিজের হোটেল খুলতে পারি, তবে এই রাণঘাটের বাজারে বসেই পশম ঝিকে দেখাবো—তুই কোথায় আর আমি কোথায়! হাতে পয়সা থাকলে কালই না হোটেল খুলে দিতাম। কুসুমকে রোজ রোজ ভাল জিনিস খাওয়াবো আমার নিজের হোটেল হলে।

কতকগুলি বিষয় সে যে খুব ভাল শিখিয়াছে, সে বেশ বুঝিতে পারে। বাজার-করা হোটেলওয়ালার একটি অত্যন্ত দরকারী কাজ এবং শক্ত কাজ। ভাল বাজার করার উপরে হোটেলের সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে এবং ভাল বাজার করার মানেই হইতেছে

সম্ভ্রান্ত ভাল জিনিস কেনা! ভাল জিনিসের বদলে সম্ভ্রান্ত জিনিস—অথচ দেখিলে তাহাকে মোটেই খেলো বলিয়া মনে হইবে না—এমন দ্রব্য খুঁজিয়া বাহির করা। যেমন বাটা মাছ ঘোঁদন বাজারে আত্মা—সেদিন ছ'আনা সের রেল-চালানী রাস্ মাছের পোনা কিনিয়া তাহাকে বাটা বলিয়া চালাইতে হইবে—হঠাৎ ধরা বড় কঠিন, কোনটা বাটার পোনা, কোনটা রাসের পোনা।

পরিদর্শন হাজারি চণ্ডীর ঘাটে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তাহার মন, কাল হইতে ভাল নয়। পশ্ম ক্রির নিকট ভাল ব্যবহার কখনও সে পায় নাই, পাইবার প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু তবুও কাল সামান্য একটু রাধা মাংস লইয়া পশ্ম বি যে কান্ডটি করিল, তাহাতে সে মনোকণ্ট পাইয়াছে খুব বেশী। পরের চাকরি করিতে গেলে এমন হয়। কুসুমকে একটুখানি মাংস না দিতে পারিয়া তাহার কণ্ট হইয়াছে বেশী—অমন ভাল রান্না সে অনেক দিন করে নাই—অত আশার জিনিসটা কুসুমকে দিতে পারিলে তাহার মনটা খুশি হইত।

ভাল কাজ করিলেও চাকুরির উন্নতি তো দূরের কথা, 'ইহারা সুখ্যাতি পর্যন্ত করিতে জানে না। বরঞ্চ পদে পদে হেনস্থা করে। এক একবার ইচ্ছা হয় যদুবাবুর হোটেলে কাজ লইতে। কিন্তু সেখানেও যে এরকম হইবে না তাহার প্রমাণ কিছুই নাই। সেখানেও পশ্ম বি জটিলিতে বিলম্ব হইবে না। কি করা যায়।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। আর বেশীক্ষণ বসা যায় না। বহু পাপ না করিলে আর কেহ হোটেলের রাধুনীগারি করিতে আসে না। এখনি গিয়া ডেকাচি না চড়াইলে পশ্ম বি এক বুড়ি কথা শুনাইয়া দিবে, এতক্ষণ উনুনে আঁচ দেওয়া হইয়া গিয়াছে।... কিন্তু ফিরবার পথে সে কি মনে করিয়া কুসুমের বাড়ী গেল!

কুসুম আসন পাতিয়া দিয়া বলিল—বাবাঠাকুর আসুন, বড় সোঁভাগ্য অসময়ে আপনার পায়ের ধুলো পড়লো।

হাজারি বলিল—দ্যাখ্ কুসুম, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে এলাম।

কুসুম সাগ্রহ-দৃষ্টিতে মূখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি বাবাঠাকুর?

—আমার বয়েস ছে'চাল্লিশ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার তত বয়েস দেখায় না, কি বলিস কুসুম? আমার এখনও বেশ খাটবার ক্ষমতা আছে, তুই কি বলিস?

—হাজারির কথাবার্তার গতি কোনদিকে বৃদ্ধিতে না পারিয়া কুসুম কিছু বিস্ময়, কিছু কৌতূকের সুরে বলিল—তা—বাবাঠাকুর, তা তো কটেই। বয়েস আপনার এমন আর কি—কেন বাবাঠাকুর?

কুসুমের মনে একটা কথা উঁকি মারিতে লাগিল—বাবাঠাকুর আবার বিয়ে-টিয়ে করবার কথা ভাবেন নাকি?

হাজারি বলিল—আমার বড় ইচ্ছে আছে কুসুম, একটা হোটেল করব নিজের নামে। পরশা যদি হাতে কোনদিন জমাতে পারি, এ আমি নিশ্চয়ই করবো, তুই জানিস! পরের বাঁটা খেয়ে কাজ করতে আর ইচ্ছে করে না। আমি আজ দশ বছর হোটেল কাজ করছি, বাজার কি করে করতে হয় ভাল করে শিখে ফেলেছি। চক্কীত মশায়ের চেয়েও আমি ভাল বাজার করতে পারি। মাথামুপরের হাট থেকে ফি হাটের যদি তিরতরকারী কিনে আনি তবে রাণাঘাটের বাজারের চুয়ে টাকায় চার আনা ছ'আনা সম্ভ্রান্ত পড়ে। এ ধরো কম লাভ নয় একটা হোটেলের ব্যাপারে। বাজার করবার মধ্যেই হোটেলের কাজের আশ্বেক লাভ। আমার খুব মনে জোর আছে কুসুম, টাকা পরশা হাতে যদি কখনো পড়ে, তবে হোটেল যা চালাবো, বাজারের সেরা হোটেল হবে, তুই দেখে নিস।

কুসুম হাজারি ঠাকুরের এ দীর্ঘ বক্তৃতা অবাক হইয়া শুনিতোছিল—সে হাজারিকে বাবার মত দেখে বলিয়াই মেয়ের মত বাবার প্রতি সর্বপ্রকার কাল্পনিক গুণ ও জ্ঞানের আরোপ করিয়া আসিতেছে। হোটেলের ব্যাপারের সে বিশেষ কিছু বুঝুক না বুঝুক, বাবাঠাকুর যে বাল্মীকিমান, তাহা সে হাজারির বক্তৃতা হইতে ধারণা করিয়া লইল।

কিছুক্ষণ পরে কি ভাবিয়া সে বলিল—আমার এক জোড়া মূলি ছিল, এক গাছা বিক্রী ক'রে দিগেছি আমার ছোট ছেলের অসুখের সময় আর বছর। আর এক গাছা আছে। বিক্রী করলে হাট-সস্তর টাকা হবে। আপনি নেবেন বাবাঠাকুর? ওই টাকা নিয়ে হোটেল খোলা হবে আপনার।

হাজারি হাসিয়া বলিল—দূর পাগলী! হাট টাকায় হোটেল হবে কি রে?

—কত টাকা হ'লে হয়?

—অন্ততঃ দুশো টাকার কম তো নয়। তাতেও হবে না।

—আচ্ছা, হিসেব ক'রে দেখুন না বাবাঠাকুর।

—হিসেব ক'রে দেখব কি, হিসেব আমার মূখে-মুখে। ধরো গিয়ে দুটো বড় ডেকা'চি, ছোট ডেকা'চি তিনটে। থানা-বাসন এক প্রস্থ। হাতা, খুঁত, বোঁড়ি; চামচে; চায়ের বাসন। বাইরে গদির ঘরের একখানা তক্তপোশ, বিছানা, ভাঙ্কিয়া। বাল্ল, থেরো বান্ধানো খাতা দু'খানা। বাল্টি, লন্ঠন, চাকি, বেলুন—এই সব নানান মটখটি জিনিস কিনতেই তো দুশো টাকার ওপর বেরিয়ে যাবে। পাঁচদিনের বাজার খরচ হাতে ক'রে নিয়ে নামতে হবে। চাকর-ঠাকুরের দু'মাসের মাইনে হাতে রেখে দিতে হয়—যদি প্রথম দু'মাস না হোল কিছু, ঠাকুর চাকরের মাইনে আসবে কোথা থেকে? সে-সব থাক-গে, তা ছাড়া তোর টাকা নেবোই বা কেন?

কুসুম ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—আমার থাকতো যদি তবে আপনি নিতেন না কেন—ব্রাহ্মণের সেবায় যদি লাগে ও-টাকা, তবে ও-টাকার ভাগ্য বাবাঠাকুর। সে ভাগ্য থাকলে তো হবে। আমার অত টাকা যখন নেই, তখন আর সে কথা বলছি কি ক'রে বলুন! যা আছে, ওতে যদি কখনো-সখনো কোন দরকার পড়ে আপনার মেয়েকে জানাবেন।

হাজারি উঠিল। আর এখানে বসিয়া দৌর করিলে চলিবে না। বলিল—না রে কুসুম, ওতে আর কি হবে। আমি যাই এখন।

কুসুম বলিল—একটু কিছু মুখে না দিলে মেয়ের বাড়ী থেকে কি ক'রে উঠবন বাবাঠাকুর, বসুন আর একটু। আমি আসছি।

কুসুম এত দ্রুত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, যে হাজারি ঠাকুর প্রতিবাদ করিবার অবসর পৰ্যন্ত পাইল না। একটু পরে কুসুম ঘরের মধ্যে একখানা আসন আনিয়া পাতিল এবং মেজের উপর জলের হাত ব্লাইয়া লইয়া আবার বাহিরে গেল। কিছুক্ষণ পরে একবাটি দুধ ও একখানা রেকাবিতে পেঁপে কাটা, আমের টুকুড়া ও দুটি সম্বেশ আনিয়া আসনের সামনে মেজের উপর রাখিয়া বলিল—একটু জল খান, বসুন এসে, আমি খাবার জল আনি। হাজারি আসনের উপর বসিল। কুসুম বকবকে করিয়া মাজা একটা কাঁচের গেলাসে জল আনিয়া রেকাবির পাশে রাখিয়া সামনে দাঁড়াইয়া রহিল।

খাইতে খাইতে হাজারির মনে পড়িল সেদিনকার সেই মাংসের কথা। মেয়ের মত স্নেহ-যত্ন করে কুসুম, তাহারই জন্যে ভুলিয়া রাখা মাংস কিনা খাওয়াইতে হইল চক্ৰান্ত মহাশয়ের গাজাখোর শাল্যকে দিয়া শব্দ—ওই পশু বিশ্বের জন্যে। দাসত্বের এই তো সূত্র!

হাজারি বলিল—তুই আমার মেয়ের মতন কুসুম-মা।

কুসুম হাসিয়া বলিল—মেয়ের মতন কেন বাবাঠাকুর, মেয়েই তো।

—ঠিক, মেয়েই তো। মেয়ে না হলে বাপের এত যত্ন কে করে?

—যত্ন আর কি করেচি, সে ভাগ্য ভগবান কি আমার দিয়েছেন? একে কি যত্ন করা বলে? কাঁথাখানা পেতে শূঁছেন বাবাঠাকুর?

—তা শূঁচি বই কি রে। রোজ তোর কথা মনে হয় শোবার সময়। মনে ভাবি কুসুম এখানা দিয়েছে! ছেঁড়া মাদুরের কাঠি ফুটে ফুটে পিঠে দাগ হয়ে গিয়েছিল। পেতে শূঁয়ে বোঁচোছি।

—আহা, কি যে বলেন! না, সন্দেহ দূটোই খেয়ে ফেলুন, পায়ে পড়ি। ও ফেলতে পারবেন না।

—কুসুম, তোর জন্যে না রেখে খেতে পারি কিছ্ মা? ওটা তোর জন্যে রেখে দিলাম।

কুসুম লজ্জার চুপ করিয়া রইল। হাজারি আসন হইতে উঠিয়া পড়িলে বলিল—
পান আনি, দাঁড়ান।

তাহার পর সামনে দরজা পর্যন্ত আগাইয়া দিতে আসিয়া বলিল—আমার ও রুলি গাছা রইল তোলা আপনার জন্যে, বাবাঠাকুর। যখন দরকার হয়, মেরের কাছ থেকে নেবেন কিন্তু।

সেদিন হোটেল ফিরিয়া হাজারি দেখিল, প্রায় পনেরো সের কি আধ মণ ময়দা চাকর আর পশ্চি মিলিয়া মাথিতেছে।

ব্যাপার কি! এত লুচির ময়দা কে খাইবে?

পশ্চি কি কথার সঙ্গে বেশ খানিকটা কাজ মিশাইয়া বলিল—হাজারি ঠাকুর, তোমার বা বা রবিবার আগে সেয়ে নাও—তারপর এই লুচিগুলো ভেজে ফেলতে হবে। আচার-পাড়ার মহাদেব ঘোষালের বাড়ীতে খাবার যাবে, তারা অভ্যাস দিয়ে গেছে সাড়ে ন'টার মধ্যে চাই, বুকলে?

হাজারি ঠাকুর অবাক হইয়া বলিল—সাড়ে ন'টার মধ্যে ওই আধ মণ ময়দা ভেজে পাঠিয়ে দেবো, আবার হোটেলের রান্না রখিবো! কি যে বল পশ্চিদিদি, তা কি করে হবে? রতন ঠাকুরকে বল না লুচি ভেজে দিক, আমি হোটেলের রান্না রখিবো।

পশ্চি কি চোখ রাঙ্গাইয়া ছাড়া কথা বলে না। সে গরম হইয়া কথার দিয়া বলিল—তোমার ইচ্ছে বা খুঁশিতে এখনকার কাজ চলবে না। কর্তা মশায়ের হুকুম। আমায় যা বলে গেছেন তোমায় বললাম, তিনি বড় বাজারে বেরিয়ে গেলেন—আসতে রাত হবে। এখন তোমার মর্জি—করো আর না করো।

অর্থাৎ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু ইহাদের এই অবিচারে হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল। নিছক অবিচার ছাড়া ইহা অন্য কিছু নহে। রতন ঠাকুরকে দিয়া ইহারা সাধারণ রান্না অনায়াসেই করাইতে পারিত, কিন্তু পশ্চি কি তাহা ইহলে খুঁশি হইবে না। সে যে কি বিষ-চক্ষে পড়িয়াছে পশ্চি বিয়ের! তাহাকে জম্ম করিবার কোনো ফাঁকি পশ্চি ছাড়ে না।

ভীষণ আগুনের তাতে মখে বসিয়া রতন ঠাকুরের সঙ্গে দৈনিক রান্না কার্যেতেই প্রায় ন'টা বাজিয়া গেল। পশ্চি কি তাহার পর ভীষণ তাগাদা লাগাইল লুচি ভাজতে হাত দিবার জন্য। পশ্চি নিজে খুঁটিতে কাজ নয় সে গেল খরন্দারদের খাওয়ার তদারক করিতে। আজ আবার হাটয়ার, বহু ব্যাপারী খরন্দার। রতন ঠাকুর তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। হাজারি এক ছিলিম তামাক খাইয়া লইয়াই আবার আগুনের তাতে বসিয়া গেল লুচি ভাজিতে।

আধশতা পরে—তখন পাঁচ সের ময়দাও ভাজা হয় নাই—পশ্চি আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, লুচি হয়েছে? ওদের লোক এসেছে নিতে।

হাজারি বলিল—না এখনো হয়নি পদ্মাদিদি। একটু ঘুরে আসতে বল।

—ঘুরে আসতে বললে চলবে কেন? সাড়ে নটার মধ্যে ওদের খাবার তৈরি ক'রে রাখতে হবে বলে গেছে। তোমায় বলিনি সেকথা?

—বল্লে কি হবে পদ্মাদিদি? মন্তরে ভাজা হয়ে আধমণ ময়দা? নটার সময় তো উনুনে ব্রহ্মার নেচি ফেলোচ্চি—জিগ্যেস করো মতিকে।

—সে সব আমি জানিনে। যদি ওরা অর্ডার ফেরত দেয়, বোঝাপড়া ক'রো কর্তার সঙ্গে, তোমার মাইনে থেকে আধ মণ ময়দা আর দশ সের ঘির দাম একমাসে তো উঠবে না, তিন মাসে ওঠতে হবে।

হাজারি দেখল, কথা কাটাকাটি করিয়া লাভ নাই। সে নীরবে লুচি ভাজিয়া যাইতে লাগিল। হাজারি ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস করে নাই—কাজ করিতে বসিয়া শূদ্ধ ভাবে কাজ করিয়া যাওয়াই তাহার নিয়ম—কেউ দেখুক বা না-ই দেখুক। লুচি ঘিয়ে ডুবাইয়া তাড়াতাড়ি তুলিয়া ফেলিলে শীঘ্র শীঘ্র কাজ চুকিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাতে লুচি কাঁচা থাকিয়া যাইবে। এজন্য সে ধীরে ধীরে সময় লইয়া লুচি তুলিতে লাগিল। পদ্ম কি একবার বলিল—অত দৌর ক'রে খেলা নামাচ্ছ কেন ঠাকুর? হাত চালাও না—অত লুচি ডুবিয়ে রাখলে কড়া হয়ে যাবে—

হাজারি ভাবিল, একবার সে বলে যে রান্নার কাজ পদ্ম ঝিয়ের কাছে তাহাকে শিখিতে হইবে না, লুচি ডুবাইলে কড়া কি নরম হয় সে ভালই জানে, কিন্তু তখনই সে বদলিল, পদ্ম কি কেন একথা বলিতেছে।

দশ সের ঘি হইতে জলুতি বাদে বাহা বাকী থাকিবে পদ্ম ঝিয়ের লাভ। সে বাড়ী লইয়া যাইবে লুকাইয়া। কর্তৃমশায় পদ্ম ঝিয়ের বেলায় অন্ধ। দেখিয়াও দেখেন না।

হাজারি ভাবিল, এই সব জুয়াচুরির জন্য হোটেলের দুর্নাম হয়। খন্দেরে পয়সা দেবে, তারা কাঁচা লুচি খাবে কেন? দশ সের ঘিয়ের দাম তো তাদের কাছ থেকে আদায় হয়েছে, তবে তা থেকে বাঁচানোই বা কেন? তাদের জিনিসটা যাতে ভাল হয়, তাই তো দেখতে হবে? পদ্ম কি বাড়ী নিয়ে যাবে বলে তারা দশ সের ঘিয়ের ব্যবস্থা করে নি। পরক্ষণেই তাহার নিজের স্বপ্নে সে ভোর হইয়া গেল।

এই রেল-বাজারেই সে হোটেল খুলিবে। তাহার নিজের হোটেল। ফাঁকি কাহাকে বলে, তাহার মধ্যে থাকিবে না। খন্দের যে জিনিসের অর্ডার দিবে, তাহার মধ্যে চুরি সে করিবে না। খন্দের সন্তুষ্ট করিয়া ব্যবসা। নিজের হাতে রাখিবে, খাওয়াইয়া সকলকে সন্তুষ্ট রাখিবে। চুরি-জুয়াচুরির মধ্যে সে নাই।

লুচি ভাজা ঝিয়ের বৃন্দদের মধ্যে হাজারি ঠাকুর বেন সেই ভবিষ্যৎ হোটেলের ছবি দেখিতে পাইতেছে। প্রত্যেক ঝিয়ের বৃন্দদটোতে! পদ্ম কি সেখানে নাই, বেচু চক্কির গাজাখোর ও মাতাল শালাও নাই। বাইরে গদির ঘরে দিবা ফসী বিছানা পাতা, খন্দের যতক্ষণ ইচ্ছা বিক্রম করুক, তামাক খাইতে ইচ্ছা করুক, খাঁকি বাড়তি পয়সা আর একটিও দিতে হইবে না। দুইটা করিয়া মাছ, ইষ্টায় তিন দিন মাংস বাধা-খন্দেরদের। এসব না করিয়া শূদ্ধ ইন্টিশনের প্রাচীনে—হি-ই-ই-লু হোটেল, হি-ই-ই-লু হোটেল, বলিয়া মতি চাকরের মত চেঁচাইয়া গলা ফাটাইলে কি খন্দের ভিড়বে?

পদ্ম কি আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, তোমার হোল? হাত চালিয়ে নিতে পাছ না? বাবুদের নোক যে বসে আছে।

বলিয়াই ময়দার বারকোশের দিকে চাহিয়া দেখিল, বেলা লুচি যতগুলি ছিল, হাজারি প্রায় সব খেলায় চাপাইয়া দিয়াছে—খান পনেরো কুড়ির বেশী বারকোশে নাই। মতি চাকর পদ্ম ঝিকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি হাত চালাইতে লাগিল।

পশ্ম বি বলিল—তোমার হাত চলচে না, না? এখনো দশ সের ময়দার তাল ডাঙায়, ওই রকম করে লুচি বেললে কখন কি হবে?

হাজারি বলিল—পশ্মদিদি, রাত এগারোটা বাজবে ওই লুচি বেলতে আর এক হাতে ভাজতে। তুমি বেলবার লোক দাও।

পশ্ম বি মূখ নাড়িয়া বলিল—আমি ভাড়া করে আমি বেলবার লোক তোমার জন্যে। ও আমার বাবু রে! ভাজতে হয় ভাজো, না হয় না ভাজো গে—ফেরত গেলে তখন কর্তৃমশায় তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন এখন।

পশ্ম বি চলিয়া গেল।

মতি চাকর বলিল—ঠাকুর, তুমি লুচি ভেজে উঠতে পারবে কি করে? লুচি পোড়াবে না? এত ময়দার তাল আমি বেলবো কখন বলো।

হঠাৎ হাজারির মনে হইল, একজন মানুষ এখনি তাহাকে সাহায্য করিতে বসিয়া যাইত—কুসুম! কিন্তু সে গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থের ঘরের বোঁ—তাহাকে তো এখানে আনা যায় না। যদিও ইহা ঠিক, খবর পাঠাইয়া তাহার বিপদ জানাইলে কুসুম এখনি ছুটিয়া আসিত।

তারপর একঘণ্টা হাজারি অন্য কিছু ভাবে নাই, কিছু দেখে নাই—দেখিয়াছে শুধু লুচির কড়া, ফুটন্ত ঘি, ময়দার তাল আর বাথারির সরু আগায় ভাজিয়া তোলা রাপ্পা রাপ্পা লুচির গোছা—তাহা হইতে গরম ঘি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভীষণ আগুনের ভাত, মাজা পিঠ বিবম টন টন করিতেছে, ঘর্ম ঝরিয়া কাপড় ও গামছা ভিজিয়া গিয়াছে, এক ছিলিম তামাক খাইবারও অবকাশ নাই—শুধু কাঁচা লুচি কড়ায় ফেলা এবং ভাজিয়া তুলিয়া ঘি ঝরাইয়া পাশের ধামাতে রাখা।

রাত দশটা।

মুর্শিদাবাদের গাড়ী আসিবার সময় হইল।

মতি চাকর বলিল—আমি একবার ইন্সটানে বাই ঠাকুরমশায়। টেরেনের টাইম হয়েছে। খন্দের না আনলে কাল কর্তৃমশায়ের কাছে মার খেতে হবে। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

ঠিক কথা, সে খানিকক্ষণ প্রাটফর্ম পায়চারি করিতে করিতে 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' 'হি-ই-ই-ন্দু হোটেল' বলিয়া চেঁচাইবে। মুর্শিদাবাদের ট্রেন আসিতে আর মিনিট পনেরো বাকী।

হাজারি বলিল—একা আমি বেলবো আর ভাজবো। তুই কি খেপালি মতি? দেখালি তো এদের কাণ্ড। রতনঠাকুর সরে পড়েছে, পশ্মদিদিও বোধ হয় সরে পড়েছে। আমি একা কি করি?

মতি বলিল—তোমাকে পশ্মদিদি দূরোখে দেখতে পারে না। কারো কাছে বোলো না ঠাকুর—এ সব তারই কারসাজি! তোমাকে জল করবার মতলবে এ কাজ করেছে। আমি বাই, নইলে আমার চাকরি থাকবে না।

মতি চলিয়া গেল। অন্ততঃ পাঁচ সের ময়দার তাল তখনও বাকী। লোচি পাকানো সেও প্রায় দেড় সের—হাজারি গুণিয়া দেখিল যোল গন্ডা লেচি। অসম্ভব! একজন মানুষের খারা কি করিয়া রাত বারোটার কমে বেলা এবং ভাড়া দুই কাজ হইতে পারে!

মতি চলিয়া যাইবার সময় খেঁ বিড়িটা দিয়া গিয়াছিল সেটি তখনও ফুরায় নাই—এমন সময় পশ্ম উর্ধ্বক মারিয়া বলিল—কেবল বিড়ি খাওয়া আর কেবল বিড়ি খাওয়া! ওদিকে বাবুর বাড়ী থেকে নোক, দুবার ফিরে গেল—তখনি তো বলিচি হাজারি ঠাকুরকে দিয়ে এ কাজ হবে না—বলি বিড়িটা ফেলে কাজে হাত দেও না, রাত কি আর আছে?

হাজারি ঠাকুর সত্যই কিছু অপ্রীতিভ হইয়া বাড়ি ফেলিয়া দিল। পদ্ম বিশ্বের সামনে সে একথা বলিতে পারিল না যে, লুচি বেলবার লোক নাই। আবার সে লুচি ভাজিতে আরম্ভ করিয়া দিল একাই।

রাত এগারোটার বেশী দেরি নাই। হাজারির এখন মনে হইল যে, সে আর বাসিতে পারিতেছে না। কেবল এই সময়টা মনে আসিতেছিল দুটি মুখ। একটি মুখ তাহার নিজের মেয়ে টেঁপার—বহুর বারো বয়স, বাড়ীতে আছে ; প্রায় পাঁচ ছ'মাস তার সঙ্গে দেখা হয় নাই—আর একটি মুখ কুসুমের। ওবেলা কুসুমের সেই স্বপ্ন করিয়া বসাইয়া জল খাওয়ারো...তার সেই হাসিমুখ...টেঁপার মুখ আর কুসুমের মুখ এক হইয়া গিয়াছে...লুচি ও বিশ্বের বৃন্দুদে সে তখনও যেন একখানা মুখই দেখিতে পাইতেছে—টেঁপি ও কুসুম দুইয়ে মিলিয়া এক...ওরা আজ যদি দু'জনে এখানে থাকিত। ওদিকে কুসুম বসিয়া হাসিমুখে লুচি বেলিতেছে এদিকে টেঁপি...

—ঠাকুর !

স্বয়ং কর্ত্তামশায়...বেচু চক্ৰান্ত। পিছনে পদ্ম ষি। পদ্ম ষি বলিল—ও গাঁজাখোর ঠাকুরকে দিয়ে হবে না আপনারকে তখনই বলিনি বাবু ? ও গাঁজা খেয়ে বৃন্দ হরে আছে, দেখচো না ? কাজ এগুবে কোথেকে !

হাজারি ভটম্ব হইয়া আরও তাড়াতাড়ি লুচি খোলা হইতে তুলিতে লাগিল। বাবুদের লোক আসিয়া বসিয়া ছিল। পদ্ম ষি যে লুচি ভাজা হইয়াছিল, তাহাদের ওজন করিয়া দিল কর্ত্তাবাবুর সামনে। পাঁচ সের ময়দার লুচি বাকী থাকিলেও তাহারা লইল না, এত রাতে লইয়া গিয়া কোনো কাজ হইবে না।

বেচু চক্ৰান্ত হাজারিকে বলিলেন—ওই ঘি আর ময়দার দাম তোমার মাইনে থেকে কটা যাবে। গাঁজাখোর মানুষকে দিয়ে কি কাজ হয় ?

হাজারি বলিল—আপনার হোটেলে সব উল্টো বন্দোবস্ত বাবু। কেউ তো বেলে দিতে আসেনি এক মতি চাকর ছাড়া। সেও গাড়ীর টাইমে ইন্টিশনে খন্দের আনতে গেল, আমি কি করবো বাবু !

বেচু চক্ৰান্ত বলিলেন—সে সব শুনচিনে ঠাকুর। ওর দাম তুমি দেবো। খন্দের অর্ডার ফেরত দিলে সে মাল আমি নিজের ঘর থেকে লোকসান দিতে পারিনে, আর মাথা নোচকাটা ময়দা।

হাজারি ভাবিল, বেশ, তাহাকে যদি এদের দাম দিতে হয়, লুচি ভাজিয়া সে নিজে লইবে। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত খাটিয়া ও মতি, চাকরকে কিছু অংশ দিবার জন্য লোভ দেখাইয়া তাহাকে দিয়া লুচি বেলাইয়া সব ময়দা ভাজিয়া তুলিল। মতি তাহার অংশ লইয়া চলিয়া গেলেন এখনও তিন-চার বুড়ি লুচি মজুত।

পদ্ম ষি উর্কি মারিয়া বলিল—লুচি ভাজচো এখনও বসে ? আবার খানকতক দাও দিকি—

বলিয়া নিজেই একখানা গামছা পাতিয়া নিজের হাতে স্থান পঁচিশ-ত্রিশ গরম লুচি তুলিয়া লইল। হাজারি মুখ ফুটিয়া বারণ করিতে পারিল না। সাহসে কুলাইল না।

অনেক রাতে সুপ্রোখিতা কুসুম চোখ মুছিতে মুছিতে নাহিরের দরজা খুলিয়া সম্মুখে মস্ত এক পোটলা-হাতে-কোজানো অবস্থায় হাজারি ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল—কি বাবাঠাকুর, কি মনে করে এত রাতে ?...

হাজারি বলিল—এতে লুচি আছে মা কুসুম। হোটেলে লুচি ভাজতে দিয়েছিল খন্দের। বেলে দেবার লোক নেই—শেষকালে খন্দের পাঁচ সের ময়দার লুচি নিলে না, কর্ত্তাবাবু বলেন আমার তার দাম দিতে হবে। বেশ আমার দাম দিতে হয় আমিই নিয়ে

নিই। তাই তোমার জন্যে বাই নিয়ে বাই, কুসুমকে তো কিছু দেওয়া হয় না কখনো। রাত বন্ধ হয়ে গিয়েচে—বুড়িয়ে ছিলে বুড়ি? ধর তো মা, বোঁচকাটা রাখা গে যাও।

কুসুম বোঁচকাটা হাজারির হাত হইতে নামাইয়া লইল। সে একটু অবাধ হইয়া গিয়াছে, বাবাঠাকুর পাগল, নতুবা এত রাত্রে—(তাহার এক ঘুম হইয়া গিয়াছে—), এখন আসিয়াছে লুচির বোঁচকা লইয়া।

হাজারি বলিল, আমি বাই মা—লুচি গরম আর টাটকা এই ভেজে তুলিচি। তুমি খানকতক খেয়ে ফেলো গিয়ে এখনি। কাল সকালে বাসি হয়ে যাবে। আর ছেলের পিলেদের দাও গিয়ে। কত আর রাত হয়েছে—সড়ে বারোটার বেশী নয়।

হোটলে ফিরিয়া হাজারি ঠাকুর একটি দুসাহসের কাজ করিল।

মতি ঢাকর পূর্ব হইতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে তুলিয়া বলিল—মতি, আমি রাত তিনটের গাড়ীতে বাড়ী যাই। এত লুচি কি হবে, বাড়ীতে দিয়ে আসি। তুমি থাকো, আমি কাল সকাল দশটার গাড়ীতে এসে রান্না করবো, কতটা মশায়কে বলো।

মতি অবাধ হইয়া বলিল—এত রাত্রে লুচি নিয়ে বাড়ী যওনা হবে!—

—এত লুচি কি হবে? এখানে থাকলে কাল সকালে বারোভূতে খাবে তো। আমার জিনিস নিজের বাড়ী দিয়ে আসি। আমার বাড়ীতে ছেলেমেয়ে আছে, তারা খেতে পার না, তাদের দিয়ে আসি! ছ'টা পরস্রা তো খরচ।

হাজারি আর ঘুমাইল না। টেঁপির জন্য তার মন-কেনন করিয়া উঠিয়াছে। কুসুম যেমন, টেঁপও তেমন। আরও দুটি ছেলে আছে ছোট ছোট। তাদের মুখ বশিষ্ট করিয়া এত লুচি এখানে রাখিয়া পদ্ম কি আর কতটা মশায়ের বাড়ীতে খাওয়াইয়া কোন লাভ নাই।

রাত সাড়ে তিনটার সময় গাংনাপুর স্টেশনে নামিয়া হাজারি নিজের গ্রামের পথ ধরিল এবং সাড়ে তিন ত্রিশ পথ হাঁটিয়া ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে স্বগ্রামে পৌঁছিল।

এড়োশালা এক সময়ে বর্ষিষ্ণু গ্রাম ছিল—এখন পূর্বের নী নাই। গ্রামের জমিদার কর বাবুবা এখান হইতে উঠিয়া কলিকাতা চলিয়া যাওয়াতে গ্রামের মাইনর স্কুলটির অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। বড় দীঘিটা মজিয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে এখান হইতে বাস উঠাইয়া কেহ রাণাঘাট, কেহ কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। নিত্যন্ত নিরুপায় যারা তারাই গ্রামে পড়িয়া আছে।

হাজারির বাড়ীতে দুখানা খড়ের ঘর। ছোট উঠান, একদিকে কাঁটাল গাছ, অন্যদিকে একটা সজনে গাছ এবং একটা পেয়ারা গাছ। এই পেয়ারা গাছটা হাজারির মা নিজের হাতে পুতিয়াছিলেন—বেশ বড় বড় পেয়ারা হয়, কাশীর পেয়ারার বীজের চারা।

হাজারির ডাকডাকিতে হাজারির স্ত্রী উঠিয়া দোর খুলিয়া, এ অবস্থায় স্বামীকে দেখিয়া বলিল—এসো, এসো। শেষ রাতের গাড়ীতে এলে কেন গো? এই দুর্ভাগ্যের রাস্তা, অন্ধকার রাত—আবার বন্ধ সাপের ভয় হয়েছে—সাপের কামড়ে দু-তিনটি মানুষ মরে গিয়েছে এর মধ্যে।

—আমাদের গাঁয়ে?

—আমাদের গাঁয়ে নয়—নতুন কাওরা পাড়ায় একটা মরেচে আর বামন পাড়ায় শুনচি

একটা—অত বড় বোঁচকাতে কি গো?

হাজারি লুচির আসল ইতিহাস কিছু বলিল না। স্ত্রীর আনন্দপূর্ণ সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল বলিল—পেয়ছি গো পেয়ছি। ভগবান দিয়েছেন, সবাই মিলে খেয়ে নাও নজা করে। টেঁপকে খুব করে খাওয়াও ও পেট ভরে খাবে আমি দেখি।

সেদিন সকালের গাড়ীতে হাজারি রাণাঘাটে ফিরিতে পারিল না।

দুপুরের পরে হাজারি কুসুমের বাপের বাড়ী বেড়াইতে গেল।

এই গ্রামেই গোয়ালপাড়ায় কুসুমের জ্যেষ্ঠামশায় হরি ঘোষের অবস্থা এক সময় ষষ্ঠেট ভাল ছিল, এখনও বাড়ীতে গোহাল-পোরা গরুর মধ্যে আট-দশটি অবশিষ্ট আছে, দুটি ছোট ছোট ধানের গোলাও বজার আছে।

হাজারিকে হরি ঘোষ খুব খাতির করিয়া খেজুর পাতার চটে বসিতে দিল। বলিল—কবে আলেন বাবাঠাকুর? সখা ভালো?

—তোমরা সব ভাল আছ?

—আপনার ছিচরগের আশিষ্বাদে এক রকম চলে যাচ্ছে। রাণাঘাটেই কাজ করছেন তো?

—হ্যাঁ! সেখান থেকেই তো এলাম।

—আমাদের কুসুমের সঙ্গে দেখা-দেখা হয়?

হাজারি পাড়গাঁয়ের লোক, এখানকার লোকের খাত চেনে। কুসুমের সঙ্গে সর্বদা দেখাশোনা বা তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি টানের কোন পরিচর সে এখানে দিতে চায় না। ইহারা হয়তো সহজ ভাবে সেটা গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রামে কথাটা রাষ্ট্র হইয়া গেলে লোকে নানারূপ কদর্থ টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবে তাহা হইতে। সুতরাং সে বলিল—হ্যাঁ—দু-একবার হয়েছিল। ভাল আছে।

—এবার যদি দেখা হয়, একবার আসতে বলবেন হাঁদিকে। তার গায়ে আসবার দিকে তত টান নেই, শহরে দুখ বেচে চালানো যে কি মিষ্ট লেগেছে!

হাজারি কথার গতি অন্য দিকে ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল—এবার আবাদপত্র কি রকম হোল বল?

—ধানের আবাদ করিচি বারো বিঘে আর বাকী সব তরকারি। কুমড়া দু-বিঘে, আলু, পেঁয়াজ—তা এবার আকাশের অবস্থা ভাল না বাবাঠাকুর, ক্ষেতে মাটি ফেটে যাচ্ছে!

তরকারির কথার হাজারির নিজের গোপনীয় উচ্চাশার কথা মনে পড়িল। তরকারি তাহার গ্রাম হইতে কিনিলে রাণাঘাট বাজারের চেয়ে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়। এখান হইতেই সে আনাজপত্র লইয়া যাইবে।

হরি ঘোষকে বলিল—আচ্ছা, তোমাদের আলু ক'মণ হ'তে পারে?

—বাবাঠাকুর তার কি কোন ঠিক আছে? তবে ত্রিশ-চল্লিশ মণ খুব হবে।

—তুমি সমস্ত আলু আমায় দিতে পারবে? নগদ দাম দেবো।

হরি ঘোষ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—বাবাঠাকুর, আজ্ঞাকাল কাঁচামালের ব্যবসা করছেন নাকি?

—ব্যবসা এখনও করিনি, তবে করবো ভাবিচি। সে তোমার বলব একদিন।

গোয়ালপাড়া হইতে আসিবার পথে একটা খুব বড় বাঁশবনের মাঝখান দিয়া পথ। এখানে লোকজন নাই এড়োশোলা গ্রামেই লোকজনের বসত নাই। আগে ছিল—ম্যাংল-রিয়ান মরিয়া হাজিয়া লোকশুন্য হইয়া পড়িয়াছে। শূন্য বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান ও বাঁশবনের জঙ্গল।

এই বাঁশবনের মধ্যে পুরোনো দিনে পালিত পাড়া ছিল, হাজারি বাল্যকালেও দেখিয়াছে। পালিতেরা বেশ বর্ষিক ছিল গ্রামের মধ্যে, পূজাপার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত হইয়াছে রাজেন পালিতের বাড়ী। এখন জঙ্গলের মধ্যে পালিতদের ভিটাটা পড়িয়া আছে এই পর্য্যন্ত। দিনমানেই বোধ হয় বাঘ লুকাইয়া থাকে।

বাঁশঝাড়ের কট-কট করিয়া শব্দকনো বাঁশের শব্দ হইতেছে—ঘন ছায়া, শব্দকনো বাঁশ-পাতার ও সোলার শব্দ। যিস্বে, শালিখ পাখীর কলরব। হাজারির মনে হইল, আজ যেন তার হোটেলের দাসত্ব-জীবন গতে মৃত্তির দিন। সেই ভীষণ গরম উদ্‌নের সামনে বসিয়া আজ আর তাকে ডেকাচিত্রে ভাত-ডাল রান্না করিতে হইবে না। পদ্ম ঝয়ের কড়া তাগাদা ও মৃদুস্বিয়ানা সহ্য করিতে হইবে না। বাঁশঝনের ছায়ায় পূর্ণ শান্তিতে সে যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া ঘুমায়—তাহা হইলেও কেহ কিছু বলিতে পারিবে না।

এই মৃত্তি সে ভাল ভাবেই আশ্বাদ করিতে চায় বলিয়াই তো হোটেল খুলিবার কথা এত ভাবে।

সে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। এইবার কিছু টাকা হইলেই সে রাণাঘাটের বাজারে হোটেল খুলিয়া দিতে পারে।

হাজারি সত্যিই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল, টাকা কোথায় ধার পাওয়া যাইতে পারে। এক গ্রামের গোসাঁইরা বড় লোক, কিন্তু তাহারা প্রায় সবাই থাকে কলকাতায়। এখানে বৃদ্ধ কেশব গোসাঁই থাকেন বটে—কিন্তু লোকটা ভয়ানক কৃপণ—তিনি কি হাজারির মত সামান্য লোককে বিনা বন্ধকে, বিনা জামিনে টাকা ধার দিবেন?

হাজারির জামিন হইবেই বা কে!

তাহার অবস্থা অত্যন্তই খারাপ। দুখানা মাত্র চালাঘর। রান্নাঘরখানা গত বর্ষায় পড়িয়া গিয়াছে—পরসা অভাবে সারানো হয় নাই, উঠানের আমতলায় রান্না হয়—বৃষ্টির দিন এখন ক্রমশঃ চলিয়া গেল, এখন তত অসুবিধা হয় না।

বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছে।

হাজারি বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার ছোট মেয়ে টেঁপ ঘরের দাওয়ার বসিয়া উল বুলিতেছে। টেঁপ বাবাকে দেখিয়া বলিল—তোমার জন্যে আসন বুনাচি বাবা—কাল তুমি যদি থাকো, কালকের মধ্যে হয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে দিয়ে দেবো।

হাজারি মনে মনে হাসিল। বেচু চক্রান্তির হোটেল সে রঙীন পশমের আসন প্যাতরা খাইতে বসিয়াছে—ছাঁবিট বেশ বটে। পদ্ম ঝি কি মন্তব্য করিবে তাহা হইলে?

মেয়েকে বলিল—দৌধ কেনমন আসন? বাচ বেশ হচ্ছে তো, কোথায় শিখালি তুই বুনাতে?

টেঁপ বলিল—মুখুয়ো-বাড়ীর নীলা-দি আর অতসী-দি'র কাছে। আমি রোজ ফই-দুপরে ওরা আমায় গান শেখায়, বোনা শেখায়।

—ওরা এখনও আছে? হরিচরণবাবু চলে যান নি এখনও?

—ওরা নাকি এ ঘাসটা থাকবে। থাকলে তো আমারই ভাল—আমি কাজটা শিখে নিতে পারি। কি চমৎকার গান গাইতে পারে অতসী-দি! আজ শুনবে বাবা?

—তুই গান শিখলি কিছু?

টেঁপ লাজুক সুরে বলিল—দু-একটা। সে কিছু নয়! তুমি অতসী-দি'র গান যদি শোনো, তবে বলবে যে কলের গানের রেকর্ড শুনছি। ওদের বাড়ী খুব বড় কলের গানও আছে। রোজ সম্ভোর পর বাজায়। কত রকমের গান আছে—যাবে শুনতে সম্ভোর পর? অতসী-দি নিজে কল বাজায়। আমিও যাবো তোমার সঙ্গে—অতসী-দি'কে বলবো বাবা এসেচে, ভালো ভালো বেছে গান দেবে।

হাজারি বলিল—হ্যাঁরে, হরিচরণবাবুর শরীর সেরেচে জানিস?

—তা তো জানিনে, তবে তিনি বৈঠকখানায় বসে রোজই তো সবার সঙ্গে গল্প করেন। একদিন বৈঠকখানায় কলের গান বাজিয়েছিলেন। কি চমৎকার কীর্তন!

সঙ্গীত-শিল্পের প্রতি বড় মানে হাজারির তত আগ্রহ নাই, হাজারির উদ্দেশ্য হরি-

চরণবাবুকে বলিয়া কহিয়া অন্ততঃ শ'দুই টাকা ধার করা যায় কিনা, সেদিকে।

হরিচরণ মৃধুজ্ঞে মহাশয় এ গায়ের মধ্যে একমাত্র শিক্ষিত, অবস্থা-পন্ন ও সম্ভ্রান্ত লোক। তাঁহার এ গ্রামের জমিদার—কিন্তু অনেক দিন হইতেই গ্রাম ছাড়িয়াছেন। প্রকাণ্ড তিন-মহলা বাড়ী পড়িয়া আছে, দু-একজন বৃদ্ধ পিসী-মাসী ছাড়া বাড়ীতে আর কেহ এতদিন ছিল না।

আজ মাস চার-পাঁচ হইল হরিচরণ মৃধুজ্ঞের একমাত্র পুত্র কলিকাতায় মারা যার বসন্ত রোগে। পুত্রের মৃত্যুর পর হইতেই আজ প্রায় তিন মাস হইল হরিচরণবাবু সপরি-বারে দেশের বাটীতে আসিয়া যে কেন বাস করিতেছেন—সে খবর হাজারি রাখে না। তবে ইহা জানে যে, হরিচরণবাবু গ্রামের উত্তর মাঠে একটি দীর্ঘ খনন করিবার জন্য জেলা বোর্ডের হাতে অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন এবং পুত্রের নামে একটি ডিস্‌পেন্সারী করিয়া দিবে গ্রামে। হরিচরণবাবু কারো বাড়ী যান না। নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন সব সময়। তাঁর দুই মেয়ে ও স্ত্রী এখানেই, জাছাড়া চাকর-বাকর ও দু'জন দরওয়ান আছে বাড়ীতে।

সন্ধ্যার পর সাহসে ভর করিয়া হাজারি হরিচরণবাবুর পৈতৃক আমলের বৈঠকখানার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল। বৈঠকখানা বাড়ীর সামনে বড় বড় খামওয়াল সাদা মার্বেল পাথর বাঁধানো বারান্দা। বারান্দার সামনে একটা মাঝারি গোছের কামরা। পাশে একটা ছোট কামরা, পূর্বে নবীনবাবু বলিয়া ইহাদের এক সারিক বড় বৈঠকখানার পাশে পৃথক ভাবে নিজের জন্য আর একটি বৈঠকখানা তৈরী করিয়াছিলেন—তিনি আজ পঁচিশ বৎসর হইল নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাওয়াতে, উক্ত বৈঠকখানা ঘর বর্তমানে বিচালি রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

হাজারি টেঁপকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিল। টেঁপ বলিল—বাবা তুমি বোসো, আমি অতসী-দিকে বলিগে তুমি এসেছ কলের গান শুনতে। এখনি দেবে গান।

বৈঠকখানার সামনে হাজারিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া টেঁপ পাশের ছোট দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে সরিয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে ভেলের চোঁপায়া লন্ঠন জ্বলিতেছে। ইহা সাবেকী কলের বন্দোবস্ত, এখনও ঠিক বজায় আছে। হাজারি বারান্দার দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে ঘরে ঢুকিবে কিনা, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে স্বয়ং হরিচরণবাবু বারান্দার বাহির হইয়াই সামনে হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন—কে?

হাজারি বিনীত ভাবে হাত জোড় করিয়া মাথা নীচু করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু, আমি হাজারি—

—ও, হাজারি! কি মনে করে, এসো এসো। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ঘরের মধ্যে এসো। মাস-দুই তোমার দেখিনি। তোমার মেয়ে মাঝে মাঝে আসে বটে, আমার বড় মেয়ে অতসীর সঙ্গে তার বেশ ভাব।

হরিচরণবাবুর বয়স পঞ্চাশ-ছাপাশ হইবে, গৌরবর্ণ, লম্বা আড়ার চেহারা, বড় বড় চোখ—গলার স্বর গম্ভীর। তিনি খুব শৌখীন লোকে ছিলেন। এখনও এই বয়সেও এবং ছেলে মারা যাওয়া সত্ত্বেও বেশ শৌখীনতা ও সূর্য্যচির পরিচয় আছে তাঁর আটপোরে পোশাকেও।

হাজারি আসলে অ্যাসিয়াছে টাকা ধার করিবার কথা বলিতে। কিন্তু বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া প্রকাণ্ড বড় সেতুলে প্রায় সাইজের আয়নাখানায় নিজের আপাদ-মস্তক দেখিয়াই তাহার সাহসটুকু সব উবিয়া গেল।

হরিচরণবাবুর নির্দেশ মত সে একখানা চেয়ারে বসিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—চা খাবে হাজারি ?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল—আজ্ঞে, চা আমি—থাক্‌গে, সে কেন আবার কষ্ট—

হরিচরণবাবু বলিলেন—বিলক্ষণ ! কষ্ট কিসের ? আমি তো চা খাবোই এখন দাঁড়াও আনতে বলি—

এই সময় টেঁপি বৈঠকখানার যে দোর অভঃপুরের দিকে, সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। হরিচরণবাবুকে বৈঠকখানার মধ্যে দেখিয়াও সে বেশ সহজ ভাবেই বলিল—বাবা দাঁড়াও, অতসী-দি কলের গান বাজাচ্ছে—আমি বলিচি আমার বাবা তোমাদের কলের গান শুনতে এসেচে—

হরিচরণবাবু বলিয়া উঠিলেন—কলের গান শুনতে এসেচ হাজারি ! তা আমাকে বলতে হয় এতক্ষণ ! শুনতে আসবে এর আর কথা কি ? তোমরা দু-পাঁচজন আস-যাও, বড় আনন্দের কথা। গ্রাম তো লোকশূন্য হয়ে পড়েছে। ওরে খুকি, তোর বাবার জন্যে আর আমার জন্যে দু'পেয়ালা চা আনতে বলে দে তোর অতসী-দিদিকে।

হাজারি মনে মনে টেঁপির উপর চটিয়া গেল। হতভাগ্য মেয়েটা সব দিল মাটি করিয়া। কে তাহাকে বলিয়াছিল কলের গান শুনিতে সে যাইতেছে মৃৎখুন্ডে বাড়ীতে ? অভঃপুর টাকার কথা উত্থাপন করা কি ভালো দেখায় ? না, যত ছেলেমানুষ নিয়া হইয়াছে কারবার !

হরিচরণবাবুর মেয়ে অতসী এই সময় দু' পেয়ালা চা-হাতে ঘরে ঢুকিল। প্রথমে হাজারির সামনে টেঁবিবে একটি পেয়ালা নামাইয়া অন্য পেয়ালাটি হরিচরণবাবুর হাতে দিল। অতসীর বরষ আঠারো-উনিশ, বেশ ধপ্পধপে ফসী, সুন্দর মৃৎখুন্ডী—ভাগর ভাগর চোখ—এক কথায় অতসী সুন্দরী মেয়ে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন অথচ সহজ অনাড়ম্বর সাজগোজ, হাতে কয়েক গাছি সরু সোনার চুড়ি এবং কানে ইয়ারিং ছাড়া অলঙ্কারেরও কোন বাহুল্য নাই।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা—প্রণাম কর অতসী !

অতসী আগাইয়া আসিয়া হাজারির সামনে নীচু হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। হাজারি সন্তোষিত হইয়া বলিল—থাক্‌ থাক্‌, এসো মা, রাজ্যরাণী হও মা—এসো, কল্যাণ হোক !

— অতসীকে হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকা গান শুনবেন ! গ্রামো-ফোনটা নিয়ে এসো।

অতসীর সঙ্গে টেঁপি খুব ভাব করিয়াছে। টেঁপির বাবাকে অতসী এই প্রথম দেখিল—বন্ধুর পিতা কি রকম দেখিতে, কোতুহলের সহিত সে চাহিয়া দেখিতেছিল, বাবার কথায় বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে চাকরের হাতে দিয়া গ্রামো-ফোন রেকর্ডের বাস্‌ বাহিরে পাঠাইয়া দিল।

হরিচরণবাবু চাকরকে বলিলেন—বাজাবে কে ? তোর দাঁদিমণি আসচে না ?

—দাঁদিমণি যে বলেন আপনি বাজাবেন—

—আমি ভাল চোখে দেখতে পার্‌ না। তাকেই পাঠিয়ে দিগে যা—। একটু পরে অতসী, টেঁপি এবং পাড়ার আরও দু' তিনটি মেয়ে ঘরে ঢুকিল। কলের গান বাজনা শুন হইল এবং চলিল ঘণ্টা-দুই। আরও একবার চা দিয়া গেল চাকরে, কিন্তু পরিবেশন করিল অতসী !

সব মিটিয়া চুকিয়া যাইতে রাত্রি প্রায় সাড়ে নটা বাজিয়া গেল।

হাজারি ছটফট করিতেছিল, গান শুনিতে সে এখানে আসে নাই।

গান বন্ধ হইলে অতসী, টের্পি ও মেয়ের দল যখন বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল, তখন হাজারি সাহসে ভয় করিয়া বলিল—আপনার কাছে একটা আর্জি ছিল বাবু।

হরিচরণবাবু বলিলেন—কি বল ?

—আমার কিছু টাকা দরকার, যদি আমায় কিছু ধার দিতেন, তাহলে আমার একটা মস্ত বড় আশার কাজ মিটতো।

—মেয়ের বিয়ে দেবে ?

—আপ্তে না বাবু, তা নয়, ব্যবসা করবো।

—কি ব্যবসা ?

—বাবু, আপনি তো জানেন আমি হোটেলের কাজ করি। আপনার কাছে লুক্কোবো না। আমি নিজে একটা হোটেল খুলতে চাইছি এবার। টাকাটা সেজন্যে দরকার।

—কত টাকা দরকার ?

—অন্ততঃ দুশো টাকা আমায় যদি দয়া করে দেন বাবু, আমার খালধারের কাঁঠাল বাগান আমি বন্দক রাখছি আপনার কাছে। এক বছরের মধ্যে টাকাটা শোধ করবো।

হরিচরণবাবু ভাবিয়া বলিলেন—বাগান বন্ধ রেখে টাকা আমি দিতাম না, দিতাম তো তোমাকে এমনি দিতাম, কিন্তু অত টাকা এমন সময় আমার হাতে নগদ নেই।

হাজারি এ-কথার পরে আর কোনো কথা বলিতে পারিল না, বিশেষতঃ সে জানিত হরিচরণবাবু উদার মেজাজের মানুষ, সভাবাদী লোক। টাকা হাতে থাকিলে, হাতে টাকা না থাকার কথা বলিতেন না।

অতসী আসিয়া বলিল—কাকা, আপনি একটু বসুন। টের্পি খেতে বসেচে, মা ছাড়লে না। মেয়েরা, যারা গান শুনতে এসেছিল, সবাইকে না খাইয়ে যেতে দেবেন না। একটু দেরি হবে। না হয় আপনি যান, আমি ঝির সঙ্গে পাঠিয়ে দেব এখন। হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, একটু বসে যাও না হাজারি। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই। কেউ বড় একটা আপসে না আমার এখানে—। হাজারি বসিল।

—তুমি কোথায় কোন হোটেলের কাজ কর ?

—আপ্তে রাণাঘাট, বেচু চক্কিত্তির হোটেল, রেল-বাজারের মধ্যে।

—কত মাইনে পাও ?

—বাবু সে আর বলবার কথা নয়, খাওয়া আর সাত টাকা মাসে। তাই ভাবিছিলাম পরের তাঁবে থাকবো না। এদিকে বয়স হলো, এইবার একটা হোটেল খুলে নিজে চালাবো।

—হোটেল চালাতে পারবে ?

—তা বাবু আপনার আশীর্বাদে একরকম সবই জানি ও-লাইনের। বাজার আর রাস্তা, হোটেলের দুটো মস্ত কাজ। এ যে শিখেচে, সে হোটেল খুলে লাভ করতে পারে। আমি অনেকদিন থেকে চেষ্টা করে ও দুটো কাজ শিখে নিইচি—খন্দের কি চায় তাও জানি। চাকরি করি রাধুনীর বটে বাবু কিন্তু আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে, আপনার আশীর্বাদে চোখ-কান খুলে কাজ করি।

—বেশ ভাল।

উৎসাহ পাইয়া হাজারি তাহার বহাদুরের আশা ও সাধ একাটি ‘আদর্শ হিন্দু-হোটেল’ প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিল। চুর্ণানন্দীর দ্বারে বসিয়া অবসর মুহূর্তে তাহার সে স্বপ্ন দেখার কথাও গোপন করিয়া না। তাহার রাস্তা খাইয়া কলিকাতার বাবুরা কি রকম সুখ্যাতি করিয়াছে, বাবু বাঁড়ুয়ের হোটেলের তাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইবার চেষ্টা, কিছুই বাদ দিল না। হরিচরণবাবু বলিলেন—দেখ হাজারি, তোমার কথা শুনে তোমার ওপর আমার হিংসে হয়। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, তোমার জীবনে মস্ত বড় আশা

রয়েচে একটা কিছূ গড়ে তুলবো! এই আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, আমার ছেলেটা মারা যাওয়ার পর আমার জীবনে যেন সব-কিছূ ফুরিয়ে গিয়েছে মনে হয়। আর যেন কিছূ করার নেই, ক'রে কি হবে, কার জন্যে করবো এই সব কথা মনে ওঠে। তা ছাড়া জীবনে কখনোই কিছূ দরকার হয়নি। বাবার সম্পত্তি ছিল যথেষ্ট—নতুন কিছূ গড়ে তুলবো এ ইচ্ছে কোনোদিন জাগেনি। তোমার বয়েস হোলে কি হবে, ওই একটা আশাই তোমার ধুবক ক'রে রেখে দেবে যে! আমার মাথায় এত পাকা চুল ছিল না। থোকা মারা যাওয়ার পরে জীবনের উদ্যম, আশা-ভরসা যেন চলে গেল, অমনি মাথার চুলও পেকে উঠলো। তবে এখন ইচ্ছে আছে থোকর নামে একটা স্কুল ক'রে দেবো। আবার ভাবি, স্কুলে পড়বেই বা কে? আমাদের এ অঞ্চলে তো লোকের বাস নেই। তার চেয়ে না হয় একটা ডাক্তারখানা ক্রুরে দিই। উদ্যমই জীবনের সবটুকু, যার জীবনে আশা নেই, বা কিছূ করার ছিল সব হয়ে গেছে—তার জীবন বড় কষ্টকর! যেন ধরো দাঁড়িয়েচে আমার। থোকা মারা না গেলে আজ আমার ডাবনা হে হাজারি! ভেবেছিলুম কয়লার ধনি ইজারা নেবো—কত উপসাহ ছিল। এখন মনে হয় কার জন্যে করবো? তাই বল-ছিলুম, তোমার দেখে হিংসে হয়। তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে—আমার তা নেই। আর এই দেখ, এই পাড়াগাঁয়ে একলাটি আছি পড়ে, ভালো লাগে কি? ভালো লাগে না। কখনো থাকিনি, কিন্তু বাইরেও আর হৈ-চৈ-এর মধ্যে থাকতে ভাল লাগে না। ওই মেয়েটা আছে, কলের গান এনেচে একটা—বাজায়, আমি শুনি। ওর মায়ের জন্যে বেছে বেছে ভক্তি আর দেহতত্ত্বের গান কিনে দিইচি, যদি তা শূনে তাঁর মনটা একটু ভাল থাকে! মেয়েমানুষ, কষ্টটা লেগেছে তাঁর অনেক বেশী।

হাজারি এই দীর্ঘ বক্তৃতার সবটা তেমন বুঝিল না—কেবল বুঝিল, পুত্রশোক বৃদ্ধের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

সে সহানুভূতিসূচক দু-চার কথা বলিল। বেশী কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া গুছাইয়া বলিতে কখনো সে শেখে নাই, তবুও পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের জন্য তাহার সত্যকার দৃষ্টি হওয়াতে ভাবিয়া ভাবিয়া মনে মনে বানাইয়া কিছূ বলিল।

হরিচরণবাবু বলিলেন—আর একটু চা খাবে?

—আজ্ঞে না। চা খাওয়া আমার তেমন অভ্যাস নেই, আগনি খান বাবু।

এমন সময় টেপ আসিয়া বলিল—বাবা, যাবে?

হাজারি হরিচরণবাবুর কাছে বিদায় লইয়া মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইল। জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, ভেঁদের বাড়ীর উঠানে রাঙাকাঠ কাটিয়াছে—রাঙাকাঠের গন্ধ বাহির হইতেছে। সিধু ভড় দাওয়ার জাল বুনিতেছিল, বলিল—দা-ঠাকুর কনে ছিলেন এত রাত অবদি?

হাজারি বলিল—বাবুর বাড়ী। বাবু ছাড়েন না কিছূতে, চা খাও, কলের গান শোন, শেষে তো টেপিকে না খাইয়ে ছাড়লেন না গিরাই মা। হাজারির বড় ভাল লাগিয়াছিল আজ সন্ধ্যাটা। বড় লোকের বৈঠকখানায় এমন ভাবে বসিয়া চা সে কখনো খায় নাই, খাতির করিয়া তাহার সঙ্গে কোনো বড় লোকের মনের কথাও কখনো বলে নাই। কলের গান তো আছেই। মেয়েকে বলিল—টেপি কি খেলি রে? টেপি একটু ভোজন-প্রিয়! খাইতে ভালবাসে আর গরীবের মেয়ে বলিয়াই অতসীর মা তাহাকে না খাওয়াইয়া ছাড়েন না। বলিল—পায়েটা-মাছের ডালনা, সর্জি, পটলডাঙা, আলুডাঙা—

হাজারির স্ত্রী অনেকক্ষণ রান্না সারিয়া বসিয়া আছে, বলিল—এত রাত্তির পুজন্ত ছিলে কেথায় সব? পাড়া বেড়ানো শেষ হয় না যে তোমাদের, বসে বসে কেবল ঘুম আসচে—

টোঁপ বলিল—আমি খেয়ে এসেছি মা, অতসী-দিদির মা ছাড়লেন না কিছুতে। আমি কিছু খাবো না।

—হ্যাঁরে, তুই খেয়ে এলি! ওবেলার সেই বাসি লুচি তোর জন্যে রয়েছে যে! লুচি খাবি না?

অনেকদিন ইহাদের সংসারে এমন সচ্ছলতা হয় নাই যে, লুচি ফেলিয়া ছড়াইয়া ছেলে-মেয়েরা খাইতে পার। বলিয়াও সুখ।

টোঁপ বলিল—তুমি খাও মা। আমি খুব খেয়ে এসেছি। সেখানেও তো পরোটা, সুজি, মাছের ডালনা এই সব খাইয়েছে। আজ দিনটা বেশ কটল—না মা? ভাল খাওয়া সকাল থেকে শুরু হয়েছে আর রাত পর্যন্ত চলছে।

আহারাদি শেষ করিয়া হাজারি বাহিরে বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল।

হরিচরণবাবুর কথায় তাহার অনেকখানি উৎসাহ আজ বাড়িয়া গিয়াছে।

লুচি! টোঁপ কত লুচি খাইতে পারে, সে তাহার ব্যবস্থা করিবে। তাহার এই সব লোভাতুর ছেলে-মেয়ের মুখে ভাল খাবার-দাবার সে দিতে পারে না—কিন্তু যাতে পারে সে চেষ্টা করিবার জন্যই তো সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

হরিচরণবাবুর টাকা আছে বটে, কিন্তু তাহার মত লোভাতুর ছেলে-মেয়ে নাই তাহার ঘরে, কাহাদের মুখে সুখাদ্য তুলিয়া দিবার আশায় তিনি খাটিবেন?

আজ হরিচরণবাবুর মিকট হইতে সে টাকা ধার পায় নাই বটে, কিন্তু এমন একটা জিনিস পাইয়া আসিয়াছে, যাহার মূল্য টাকা-কড়ির চেয়ে বেশী।

তাহার সংসারে ছেলে-মেয়ে আছে, টোঁপ আছে, তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাতে পায়ে বল আসিবে, মনে জোর পাইবে। হরিচরণবাবুর জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার বয়স ছেঁচলিশ হইলে কি হয়, টোঁপ যে ছেলেমানুষ। তাহার নিজের সুখ কিসের? টোঁপকে একখানা ভাল শাড়ী কিনিয়া দিলে ওর মুখে যে হাসি ফুটিবে, সেই হাসি তাহাকে অনেক দূরে লইয়া যাইবে কর্ম্মের পথে।

আহা, যদি এমন কখনো হয়।

যদি টোঁপকে একটা কলের গান কিনিয়া দেওয়া যায়? গান এত ভালবাসে যখন...

হয়তো স্বপ্ন...কিন্তু ভাবিয়াও তো আনন্দ। দেখা যাক, না কি হয়।

বাঁশঝাড় শন শন শব্দ হইতেছে। রাত অনেক হইয়াছে। গ্রাম নীরব হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে হাজারি স্ত্রীকে বলিল—ওগো, আমার গামছাখানা বন্ড ময়লা হয়েছে, একটু সোডা দিয়ে ভিজিয়ে দাও তো, কাল খুব সকালে কেচে দিও—আমি কাল সকালে উঠেই রাণাঘাট যাবো।

—সকালে কেন, এখনই কেচে দিই। ভিজ়ে গামছা নিয়ে যাবে কি করে, এখন কেচে হাওয়ায় মেলে দিলে রান্ধরের মধ্যে শুকিয়ে যাবে।

সকালে উঠিয়া হাজারি ঠাকুর রাণাঘাট চলিয়া আসিল।

হোটলে ঢুকিবার আগে তাহার ভয় করিতে লাগিল। কর্তাবাবু এবং পদ্ম যি তাহাকে কি না জানি বলে! একদিন কামাই করিবার জন্য কৈফিয়ত দিতে দিতে তাহার প্রাণ যাইবে।

হইলও তাই।

ঢুকিবার পথেই বসিয়া স্বয়ং বেচু চক্রান্তমশায়—খোদ কস্তুরী। হাজারিকে দেখিয়া হাতের হুঁকা নামাইয়া কড়া সুঁরে বলিলেন—কাল কেথায় ছিলে ঠাকুর? হাজারি মিথ্যা কথা বলিল না, বাড়াইতে কাহারও অসুখ ইত্যাদি ধরনের বানানো মিথ্যা কথা সে কখনও

বলে না। বলিল—আজ্ঞে, অনেক দিন পরে বাড়ী গেলাম কর্ত্তামশায়, ছেলে-মেয়ে রয়েছে—তাই একটা দিন—

—না বলে-ক'য়ে এভাবে হোটেল থেকে পারিলে যাবার মানে কি? কার কাছে ছুটি নিয়ে গিয়েছিলে?

এ কথার জবাব সে দিতে পারিল না। নুটি দিতে গিয়াছিল বাড়ীতে, তাহা বলিতেও বাধে। সে চুপ করিয়া রহিল।

—তোমার হাড়ে হাড়ে বদমাইশি ঠাকুর—পদ্ম কি ঠিক কথা বলে—দেখতে ভাল-মানুষ হলে কি হবে? তুমি এত বড় একটা হোটেলের রান্নাবান্না ফেলে রেখে একেবারে নির্ভীক হয়ে গেলে কাজকে কিছু না বলে? বল একেবারে নাকের জলে চোখের জলে সবাই মিলে—গাঁজাখোর, লেমকহারাম কোথাকার! চালান্নির আর জামগা পাওনি?

বেচু চক্রান্তর গলার জোর আওয়াজ পাইয়া পদ্ম কি ব্যাপার কি দেখিতে আসিল এবং দোরের উপর মারিয়া হাজারিকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—এই যে! কি মনে করে! আবার যে উদর হ'লে? কাল আমি বলি আর দরকার নেই, ও আপদ বিবেক ক'রে দেন কর্ত্তা, গাঁজা খেয়ে কোথায় নেশায় ব'ন্দ হয়ে পড়েছিল—চেহারা দেখছেন না?

হাজারি একটু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দেওয়ালে টাঙানো গজাল-আটা ছোট্ট আয়না-খানায় নিজের মূখখানা দেখবার চেষ্টা করিল—কি দেখিল পদ্ম কি তাহার চেহারাতে! গাঁজা তো দূরের কথা, একটা বিড়ি পৰ্য্যন্ত সকাল হইতে সে খায় নাই!

—বাও, কাল একটা ঠিকে ঠাকুর আনা হয়েছিল, তার মজদুর এক টাকা, আর জল-খাবারের চার আনা তোমার এ মাসের মাইনে থেকে কাটা যাবে। ফের যদি এমন হয়, সেই দিনই বিদেয় ক'রে দেবো মনে থাকে মেন—বেচু চক্রান্ত রায় দিখেন।

হাজারি অপ্রতিভ মুখে রান্নাঘরের মধ্যে গিয়া চুকিল—সেখানেও নিস্তার নাই। কর্ত্তার হাত হইতে নিষ্কৃত পাইলেও, পদ্ম কির হাতে অত সহজে পরিগ্রাণ পাওয়া দুশ্কর। পদ্ম কি হাজারির পেছনে পেছনে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—করবে না তো তোমার কাজ ওরা—কেন করবে?...একা হাঁড়ি তৈলো আজকে—যেমন বদমাইশ তার তেরনি। একা বড় ডেক'চি নামাও, ফেন গালো, ভাত বাড়ো পদ্মেরদের—কাল সব কাজ মূখ বুজে ঠাকুর করেছে একা—নবাবপুত্রের গাঁজা খেয়ে কোথায় পড়ে আছেন আর ওর জন্যে খেটে মরবে সবাই—উড়পুড়ে মড়ুইপোড়া বামন কোথাকার।

পদ্ম কি রাগের মাথায় ভুলিয়া গিয়াছিল, এই মার বেচু চক্রান্ত বলিয়াছেন যে, কাল হাজারির বদলে ঠিকা ঠাকুর রাখা হইয়াছিল বাহার মজদুর হাজারির মাহিনা হইতে কাটা যাইবে।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল, একা কি রকম? এই তো ঠিকে ঠাকুর রাখা হয়েছে বল্লেন কর্ত্তাবাবু?

পদ্ম কি সামলাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল—হইছিল তো। হয়নি তো কি? কর্ত্তা-মশায় কি মিথ্যে কথা বলেন তোমার কাছে? যদি নাই বা পাওয়া যেত ঠাকুর তবে ও-ঠাকুরকে একা খাটতে হোত না? তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার সময় নেই আমার—মুশিদাবাদ আসবার সময় হোল। এখনি ইন্টনানের খন্ডের সব আসবে। ডাল সাংলে ফেলো তাড়াতাড়ি চক্কাটা চাড়িয়ে দ্যাও।

মুশিদাবাদ ট্রেন সশব্দে আসিয়া প্র্যাটফর্ম দাঁড়ইল। এইবার কিছু খরিশদারের ডিড় হইবে।

হাজারি ছোট ডেক'চিটার মধ্যে হাতা ভুয়াইয়া ডাল সাংলাইছেছে এমন সময় বাহিরে খাঁদর ঘরে বেচু চক্রান্তর চড় গলার আওয়াজ এবং তর্কবিতর্কের শব্দ শুনিয়া সে রান্না-

ঘরের দোরের কাছে আসিয়া বাহিরের ঘরের দিকে চাহিল।

যতীশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কর্তৃমিশারের কথা কাটাকাটি হইতেছে। যতীশ ভট্টাচার্য অনেক দিন হইতে তাহাদের খরন্দার—আগে আগে নগদ পরস্যা দিয়া খাইয়া যাইত, আজ মাস-ছয় হইতে মাসিক হারে খায়। বরস পঞ্চাশ-বাহার, ম্যালেরিয়া রোগীর মত চেহারা, মাথার চুল প্রায় পাকিয়া গিয়াছে, রং পূর্বে ফর্সা ছিল, এখন পুড়িয়া আধকালো হইয়া আসিয়াছে প্রায়। পরনে ময়লা ধূতি, গায়ে লংকথের ময়লা পাঞ্জাবি, পায়ে বিবর্ণ কোম্বিসের জুতা।

বেচু চক্ৰবর্তী বলিতেছেন—না, আপনি অন্যান্তর চেষ্টা করুন ভট্টাচার্য মশাই। আমি পারবো না সোজা কথা। হোটেল খুলিচি দু'পরস্যা রোজগারের চেষ্টায়, অন্যছত্তর জে খুলিনি ?

যতীশ ভট্টাচার্য বলিতেছে—টাকার জন্যে আপনি ভাববেন না চক্ৰবর্তী মশাই। এ ক' মাসের বাকী আমি একসঙ্গে দেবো।

—না মশাই—আপনি অন্যান্তর চেষ্টা করুন। যা গিয়েচে, গিয়েচে—আর আপনাকে খাইয়ে আমি জড়াতে রাজী নই।

যতীশ ভট্টাচার্য বেশ নরম সুরে বলিল—না না, যাবে কেন ? বিলক্ষণ ! পাই-পরস্যা শোধ করে দেবো। তবে পড়ে গিইচি একটু ফেরে কর্তৃমিশাই, ('খুব খোশামোদ জুড়ে দিলেচে ! ') তা এই ক'টা দিন যেমন খাচি তেমন খেয়ে যাই—সামনের মাসের পরপর দোসরা—

—না মশাই, সামনের মাসের পরপর দোসরার এখনো ঢের দেরি। ও-সব আর চলবে না। মাপ করবেন, আপনি অন্যান্তরে দেখুন—

যতীশ ভট্টাচার্যের চেহারা দেখিয়া হাজারির মনে হইল, লোকটা খুব ক্ষুব্ধ, সকাল হইতে কিছু খায় নাই। এত বেলায় না খাওয়াইয়া কর্তৃমিশাই তাড়াইয়া দিতেছেন, কাজটা কি ভালো ? হয়ত কিছু কষ্টে পুড়িয়া থাকিবে, নতুবা দুমুঠা খাইবার জন্য লোকে এত খোশামোদ করে না।

হাজারির ইচ্ছা হইল, একবার সে বলে—কর্তৃমিশাই আমি আজ খাবো না—কাল দেশে একটা নেমস্তন্ন ছিল, খেয়ে শরীর খারাপ আছে। আমার ভাতটা না হয় ভট্টাচার্য মশাই খেয়ে যান—কিন্তু কথাটা বলিলে কর্তৃমিশারের অপমান করা হইবে, বিশেষ করিয়া পদ্ম তাহা হইলে তাহাকে আন্ত রাখিবে না।

যতীশ ভট্টাচার্য শেষ পর্যন্ত না খাইয়া চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিল—আহা, পুরোনো খম্বের—ওকে এক থালা ভাত দিলে কি ক্ষেতি হোত হোটেলের—আমি যদি কখনো হোটেল করি, খেতে এলে কাউকে ফেরাবো না—এতে আমার হোটেল উঠে যায় আর থাকে। একে তো ভাত বেচে পরস্যা—তার ওপর খিদের সময় লোককে ফেরাবো ?

ট্রেনের প্যাসেঞ্জার খরন্দারগণ আসিয়া পুড়িয়াছে। খাইবার ঘরে বেশ ভিড়। মতি সেকর আজ দশ-বারোটি লোক জুটাইয়া আনিয়াছে। পদ্ম আসিয়া বলিল—দশ থালু ভাত বাড়ো—দু'থালু নিরান্না। আলুর ডাল না দিও।

আবশ্যটা পরে মুর্শিদাবাদ ট্রেনের খরন্দার বিদায় হইলে, অপ্রত্যাশিত ভাবে বম-পাক্সের ট্রেনের সময় কতকগুলি লোক খাইতে আসিল। বেলা দুইটা, এ সময় নতুন লোক প্রায়ই আসে না, পদ্ম ঐ যখন হাঁকিল পাঁচ থালা ভাত ঠাকুর-হাজারি তাহাকে ডাকিয়া চুপ চুপ বলিল—ভাল একেবারেই নেই—দু'জনের মত হবে কি না—

পদ্ম ঐ ডেক্টির কাছে আসিয়া নাচু হইয়া দেখিয়া চাপা কণ্ঠে বলিল—ওমা,

এ তো একেবারেই নেই বললে হয়! এখন খন্দের খাওয়ানো কি দিয়ে? তোমার দোষ, যখন ভাল কমে আসচে, এখনও দু'খানা টেরেন্ বাকি, তখন একটু ফেন মিশিয়ে সাঁতলে নিলে না কেন? কতবার তোমায় বলে দেওয়া হয়েছে! ফেন আছে?

হাজারি বলিল—আছে।

—আছে তো দু'বাটি দ্যাও ডালে ফেলে—দিয়ে একটু নুন দিয়ে গরম ক'রে নাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখচো কি?

হাজারি এ ধরনের কাজ কখনো করে নাই। করিতে তাহার বাধে। সে সত্যি ভাল রাধুনী। ইচ্ছা করিয়া হাতের ভাল রান্নাটা নষ্ট করিতে বা এভাবে খরন্দার ঠকাইতে তাহার মন সরে না। কিন্তু পশু বিদ্র হুকুম না মানিয়া উপায় কি? বাধ্য হইয়া ডালে ফেন মিশাইয়া খরন্দার বিদায় করিতে হইল।

ছটি পাইল সোদিন প্রায় বেলা আড়াইটার।

একটুখানি গড়াইয়া লইয়া রোদ একটু পড়িয়া আসিলে সে চুর্ণানদীর তীরে তাহার অভ্যাসমত বেড়াইতে চলিল। আজ ক'দিন নদীর ধারে যায় নাই—আর সেই পরিচিত নিষ্কর্ষন নিমগাছটার তলায় বসিয়া গাছের গাড়ি ঠেস দিয়া ওপারের খেরাঘাটের দিকে এবং শান্তিপুুরে বাইবার রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকে নাই। বেশ লাগে জায়গাটা।

আর ওখানে গিয়া বসিলেই হাজারির মাথায় হোটেল সংক্রান্ত নানা রকম নতুন কথা আসে, অন্য কোথাও তেমনি হয় না।

আজ জায়গাটাতে গিয়া বসিতেই হাজারির প্রথমে মনে হইল, হোটেল চলে রান্নার গুণে। বাহারা পরসা দিয়া খাইতে আসিবে, তাহারা চার ভাল জিনিস খাইতে—ফেন-মিশানো ডাল খাইতে তারা আসে না।

পশু বিদ্রের অন্যায়ের দরুন বেচু চক্রান্তির হোটেল উঠিয়া যাইবে। তাহার নিজের হোটেল ততদিনে খোলা হইয়া যাইবে। তাহার রান্নার গুণেই হোটেল চলিবে। হঠাৎ হাজারি লক্ষ্য করিল, যতীশ ভট্টাচার্য, চুর্ণীর খেরাঘাটে দাঁড়াইয়া আছে। বোধ হয় পার হইয়া ওপারে যাইবে।

—ও ভট্টাচার্য মশায়—ভট্টাচার্য মশায়—

যতীশ চাহিয়া দেখিয়া উঠিয়া হাজারির কাছে আসিল।

—কোথায় যাবেন?

—যাচ্ছি একটু ফুলে-নব্বা, আমার ভায়রাভাই থাকে, তারই ওখানে। দেখলে তো হাজারি তোমাদের চক্রান্তি মশায়ের কাণ্ডটা আজ! বল টাকা কি আমি দিতাম না? দু'পদুরবেলা না খাইয়ে কি-না বললে অন্য জায়গায় চেষ্টা করুন গিয়ে! ভাত-বেচা বামন যদি ছোটলোক না হয়, তবে আর কে হবে! বিড়ি আছে? দাও তো একটা—

হাজারির নিকট হইতে বিড়ি লইয়া ধরাইয়া বলিল—দু'শো বাঁটা মরি শহরের মাথায়। আর থাকিচ নে। যাচ্ছি ফুলে-নব্বা, আমার বড় ভায়রাভাই পার্বত্য চক্রান্ত সেখানে একজন নাম-করা লোক। পার্বত্য দাদা একবার বলেছিল ওদের জমিদারী কাছারীতে একটা চাকরি ক'রে দেবে। পার্বত্যদুরীদের জমিদারী। মস্ত কাছারী। সেখানেই যাচ্ছি। একটা হিলে হলে বাবেই।

হাজারি বলিল—একটা কথা বলি ভট্টাচার্য মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—

যতীশ ভট্টাচার্য বলিল—কি?—টাকাকড়ি এখন কিছু নেই আমার কাছে তা বলে দিচ্ছি। তবে দেনা আমি রাখবো না—খাওয়ার টাকা আগে শোধ দিয়ে তখন অন্য কথা। সে তুমি বলে দিও চক্রান্তি মশাইকে।

হাজারি বলিল—টাকাকড়ির কথা বলিনি। বলছিলাম, আপনি আহা করছেন?

যতীশ ভট্টাচার্জ্ কিছুমাত্র না ভাবিয়া সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল—না। কোথায় করবে? অত বেলায় চক্রান্ত মশায়ের হোটেল থেকে ফিরে আর ভাত কে আমার জন্যে নিয়ে বসে ছিল?

হাজারি থপু করিয়া যতীশ ভট্টাচার্জের ডান হাতখানা ধরিয়া বলিল—আমার সঙ্গে চলুন ভট্টাচার্জ্ মশায়—আমি আপনাকে রেখে খাওয়াবো আজ। আসুন আমার সঙ্গে—যতীশ ভট্টাচার্জ্ বলিল—কোথায়? কোথায়? আরে না, না হাজারি, আজ ও-সব থাক্। আমি জল-টল খেয়ে—আর এমন অবেলায়—

হাজারি নাছোড়বান্দা। তাদের হোটেলের একজন পুরানো খন্দের আজ পরস্য নাই বলিয়া সারাদিন অনাহারে থাকিয়া রাণাঘাট হইতে চলিয়া যাইতেছে—কি জানি কেন, এ ব্যাপারটার জন্য হাজারি যেন নিজেকেই দায়ী করিয়া বসিল।

যতীশ ভট্টাচার্জ্ বলিল—আমি তোমাদের হোটলে আর যাবো না কিন্তু হাজারি। আজ্ঞা তুমি যখন ছাড়চো না তখন বরং একটু জল-টল খাওয়াও।

—হোটলে নিয়েই বা যাবো কেন? আসুন না জল-টল নয়, ভাত খাওয়াবো রেখে।

যতীশ ভট্টাচার্জ্ ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, ফুলে-নব্বা যেতে পারবো না আজ তাহলে। আজ সেখানে পৌঁছতেই হবে।

নিব্বটেই কুসুমের বাড়ী, একবার হাজারি ভাবিল ভট্টাচার্জকে সেখানে লইয়া বাইবে কি না। শেষে ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাই করিল। ভদ্রলোককে নতুবা কোথায় বসাইয়া সে খাওয়ায়?

কুসুমের বাড়ীর দোরে কড়া নাড়িতেই কুসুম আসিয়া দোর খুলিয়া হাজারিকে দৌধিয়া হাসিমুখে কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ যতীশ ভট্টাচার্জের দিকে দৃষ্টি পড়ায় সে লজ্জিত হইয়া নীচুসূত্রে বলিল—বাবাঠাকুর কি মনে করে? উনি কে সঙ্গে?

—ওঁর জনোই আসা। উনি বামুন মানুষ, আজ সারাদিন খাওয়া হয়নি। আমার চেনাশূনা—আমাদের হোটেলের পুরোনো খন্দের। পরস্য ছিল না বলে খেতে দেয়নি কর্তামশাই। উনি না খেয়ে শান্তিপূর চলে যাচ্ছিলেন, আমার সঙ্গে দেখা—ঘরে আনলুম। ওঁকে কিছু না খাইয়ে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাইরের ঘরটা খুলে দাও গিয়ে—

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বাহরের ঘরের দোর খুলিতে গেল। যতীশ ভট্টাচার্জ্ কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারি তাহাকে ডাক দিয়া বাহরের ঘরে বসাইল। তাহার পর বাড়ীর ভিতর যাইতেই কুসুম উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিল—কি করবেন বাবাঠাকুর, রান্না করবেন? সব যোগাড় করে দিই! আর ততক্ষণে ঘরে যা-কিছু আছে ও বাবাঠাকুরকে দিই, কি বলেন?

হাজারি বলিল—রান্না করে খাওয়াতে গেলে চলবে না কুসুম। উনি থাকতে পারবেন না; ফুলে-নব্বা যাবেন। আমি বাজার থেকে খাবার কিনে আমি—এখানে একটু বসবার জন্যে নিয়ে এলাম।

কুসুম হাসিয়া বলিল—বাবাঠাকুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না দিকিনি! আমি সব যোগাড় করিচি জলখাবারের। আমার ঘরে সব আছে, ঘরে থাকতে বাজারে যাবেন খাবার আনতে কেন? আমার বাড়ীতে যখন সন্ধ্যার পায়ের ধুলো পড়েছে, তখন আমার ঘরে যা আছে তাই দিয়ে খেতে দেব—কিন্তু বাবাঠাকুর, সেই সঙ্গে আপনিও—মনে থাকে বেন। হাজারি প্রতিবাদ-বাক্য উচ্চারণ করার পূর্বেই কুসুম ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল—অগত্যা হাজারি বাহরের ঘরে যতীশ ভট্টাচার্জের কাছে ফিরিয়া আসিল।

যতীশ ভট্টাচার্জ্ বলিল—তোমার কোনো আত্মীয়ের বাড়ী নাকি হে?

—না, আত্মীয় নয়, এরা হোল ঘোষ-গোয়াল। এই বাড়ীতে আমার ধর্ম্মমন্দিরের

বিয়ে হয়েছে, ওই যে দোর খুলে দিলে, ওই মেয়েটি!

পনেরো মিনিট আন্দাজ পরে খন্ কন্ করিয়া শিকল নাড়িয়া উঠিতে হাজারি বাহিরের বাড়ীর অন্দরের দিকে দাওয়ার গিয়া দাঁড়াইল—দাঁড়াইয়া দাওয়ার দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। দ্ব'খানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আসন পাতা—দ্ব'খটি জ্বাল দেওয়া দ্ব'খ। দ্ব'খানা খালে ফল-মূল কাটা, বড় বাতাসা, ছানা, দ্ব'টি মূখ-কাটা ডাব। অক্'বকে করিয়া স্বাজা দ্ব'টি কাদার গ্রাসে দ্ব'গ্রাস জল।

হাসিমুখে কুসুম বলিল—ওঁকে ডাকুন, সেবা করতে বলুন। যা বাড়ীতে ছিল একটু মুখে দিয়ে নিন দ্ব'জনে।

—তা তো হোল—কিন্তু আমি আবার কেন কুসুম?

—মেয়ের বাড়ী যে—না খেয়ে যাবার কি জো আছে? ডাকুন ওঁকে।

যতীশ ভট্টাচার্জ খাইতে বাসিয়া ঘেরূপ গোত্রাসে খাইতে লাগিল, দৌখিয়া মনে হইল, সে বড়ই ক্ষুব্ধ ছিল। তাহার থালায় একটুও কিছু পাড়িয়া রহিল না। কুসুম পান সাজিয়া বাহিরের ঘরে পাঠাইয়া দিল, খাওয়ার পরে। যতীশ ভট্টাচার্জ বিদায় সন্ধ্যার সময় বলিল—তোমার মেয়েটিকে একবার ডাকো হাজারি, আশীর্বাদ করে বাই।

কুসুম আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দ্ব'জনকে প্রণাম করিল। যতীশ ভট্টাচার্জ বলিল—মা শোনো, সারাদিন সন্ধ্যাই খাইনি। ভারি তৃষ্ণার সঙ্গে খেলাম তোমার এখানে। তুমি বড় ভাল মেয়ে, ছেলোপলে নিয়ে সুখে থাকো, আশীর্বাদ কর।

হাজারি যতীশ ভট্টাচার্জের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

পথে আসিয়া বলিল—ভট্টাচার্জ মহশয়, একটা হোটেল নিজে খুলবো অনেক দিন থেকে ইচ্ছে আছে। আপনি কি বলেন?

—অনায়াসে করতে পারে। খুব লাভের জিনিস—তোমার হবেও। তোমার মনটা বড় ভালো। কিন্তু পয়সা পাবে কোথায়?

—তাই নিয়েই তো গোলমাল। নইলে এতদিন খুলে দিতাম—দেখি, চেষ্টার আছি—ছাড়িচ নে—ওই যে আমার মেয়ে দেখলেন, ওই কুসুম, ও একবার টাকা দিতে চেয়েছিল। তা কি নেওয়া ভাল? ও গরীব বেওয়া লোক, কেন ওর সামান্য পুঁজি নিতে যাবো? তাই নই নি। নিলে ও এখনি দেয়—তবে সে টাকা খুব সামান্য। তাতে হোটেল খোলা হবে না।

—যতীশ ভট্টাচার্জ চুপুঁর খেয়ার ধারে আসিয়া বলিল—আচ্ছা, চলি হাজারি—তুমি হোটেল খুললে তোমার হোটেল আমি বাঁধা খন্দের থাকবো, সে তুমি ধরে নিতে পারো। আর কোথাও যাবো না—তোমার মত রান্না কটা ঠাকুর রাখতে পারে হে? বেচু চক্রান্তির হোটেল আমি যে যেতাম শুনু তোমার নিরামিষ রান্না খাওয়ার লোভে! ভাল চলে তোমার হোটেল। এদিগরে তোমার মত রাখতে পারে না কেউ, বলে যাচ্ছি।

যতীশ ভট্টাচার্জ তো চলিয়া গেল, কিন্তু হাজারির মনে তাহার শেষ কথাগুলি একটা খুব বড় বল ও প্রেরণা দিয়া গেল।

সে জানে, তাহার হাতের রান্না ভাল—কিন্তু স্বরিন্দ্রের মুখে সে কথা শুনিলে শুধে না তৃপ্ত। ক্ষুব্ধান্ত রান্নাধকে খাওয়াইয়াছিল বটে—কিন্তু সে যাইবার সময় বাহা দিয়া গেল হাজারির মনের আনন্দ ও উৎসাহের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহা খুব মূল্যবান ও সার্থক প্রতিদান।

হাজারি যখন হোটলে ফিরিল, তখন বেলা বেশী নাই। রতন ঠাকুর ভাল-ভাল চাপাইয়া দিয়াছে, মতি চাকর বা পদ্ম বি কেহই নাই। গদির ঘরে বেচু চক্রান্তি কহাদের সঙ্গে কথাবাস্তা বলিভেছিল।

হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকিলে কিন্তু হাজারির মনে নতুন বলের সঞ্চার হয়। বরং ছুটি পাইয়া বাহিরে গেলেই যত দুর্ভাবনা আসিয়া জোটে—প্রকাশ্য উন্নতির উপরে ফুটন্ত চেকটির সম্মুখে বসিয়া হাজারি নিজেকে বিজয়ী বীরের মত কল্পনা করে। তখন না মনে থাকে কুসুমের কথা না মনে থাকে অন্য কোনো কিছু। অবসাদ আসে কাজ হাতে না থাকিলে, এ বরাবর দেখিয়া আসিতেছে সে।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর ফিরিল।

হাজারিকে চুপি চুপি বলিল—একটি কথা আছে। আমার দেশের একজন লোক এসেছে—আমার কাছে থেকে চাকরি খুঁজবে। বড় গরীব—তাকে বিনা টিকিটে খাওয়ার ক্ষেত্রে ঢুকিয়ে খেতে দিতে হবে। তোমার যদি মত হয়, তবে তাকে বল।

হাজারি বলিল—নিয়ে এসো, তার আর কি। গরীব মানুষ খাবে, আমার কোনো অমত নেই। রতন ঠাকুর খুব খুশী হইয়া চলিয়া গেল। রাতে তাহার লোক যখন খাইতে আসিল, রতন ঠাকুর হাজারিকে ডাকিয়া ইঙ্গিতে লোকটাকে চিনাইয়া দিতে, হাজারি পরিতোষ করিয়া তাহাকে খাওয়াইল।

পক্ষি বিশ্বের অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া লোকটা বিনা টিকিটে খাইয়া চলিয়া গেল—কেহ কিছু ধরিতেও পারিল না।

এই রকম চলিল এক-আধ দিন নয়, দশ-বারো দিন! একদিন আবার তাহার অন্য এক সঙ্গী জুটাইয়া আনিয়াছে, তাহাকে বিনামূল্যে খাইতে দিতে হইল।

ব্যপারটি সামান্য, হাজারি কিন্তু একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা পাইল ইহা হইতে। এত সতর্ক ব্যবস্থার মধ্যেও চুরি তো বেশ চলে! বেহু চক্কতির টিকিট ও পয়সাতে ঠিক মিল আছে, সুতরাং তার দিক দিয়া সন্দেহের কোন কারণ নাই—পক্ষি কি যে পক্ষি কি, সে পর্যন্ত বিলম্ববিসর্গ জানিল না ব্যপারটার। ভাত তরকারি কিছু মাপ থাকে না যে কম পাড়বে। সুতরাং কে ধরিতেছে? কেন? এ ধরনের চুরি ধরিবার কি উপায় নাই কোনো?

কয়দিন ধরিয়া হাজারি চুপচাপ ঘাটে নিজেই বসিয়া শুধু এই কথা ভাবে। ঠাকুরে ঠাকুরে বড়বন্দ্য করিয়া যদি বাহিরের লোক ঢুকাইয়া খাওয়ায়, তবে সে চুরি ধরিবার উপায় কি? অনেক ভাবিয়া একটা উপায় তাহার মাথায় আসিল একদিন বিকালে। থালায় নম্বর যদি দেওয়া থাকে, আর টিকিটের নম্বরের সঙ্গে যদি তার মিল থাকে, তবে থালা এটো হইলেই ধরা পড়িবে অমূল্য নম্বরের থালার খন্দের বিনা টিকিটে খাইয়াছে—না পয়সা দিয়া খাইয়াছে।

মাঝে মাঝে তদারক করিলেই জিনিসটা ধরা পড়িবে। তা ছাড়া থালা মাজিবার সময় কি বা চাকরের নিকট হইতে এটো থালার নম্বরগুলি জানিয়া লইলেই হইবে।

হাজারি খুব খুশী হইল। ঠিক বাহির করিয়াছে বটে—একটা ফাঁক আবিষ্কার আছে, সেও জানে—যদি কল্যাণিতায় খাইতে দেওয়া হয়। যদি বিনা নম্বরী থালা সেই লোকটা বাহির হইতে আনে—তাহাতে নিস্তার নাই, কারণ কি-চাকরের দ্বারা তখনই ধরা পড়িবে। এটো থালা সেই লোকটা কিছু মাজিতে বসিতে পারে না হোটেলের মধ্যেই। কপার পাতায় কেহ খাইতেছে, ইহা চোখে পড়িলে তখনই কি-চাকরে সন্দেহ করিবে বলিয়া ইঠাৎ কেহ সাহস করিবে না কাহাকেও পাতায় ভাত দিতে।

দুশো-আড়াইশো টাকা যদি যোগাড় করা যায়, তবে এই রেলবাজারেই আপাততঃ হোটেল খুলিয়া দেওয়া যায়। টাকা দেয় কে?

যতীশ ভট্টাচার্য্যের কথা তাহার মনে পড়িল।

বেচারী বড় কষ্টে পড়িয়াছে! শেষে কিনা ভায়রাভাইয়ের বাড়ী চলিয়াছে আগ্রয় প্রার্থনা করিতে! লোকে কি সোজা কষ্ট পাইলে তবে কুটুম্বস্থানে যায় চাকুরির উদ্দেশ্যে

হইয়া।

যদি সে হোটেল খোলে, যতীশ ভট্টাচার্যকে আনিয়া রাখিবে। বৃন্দ মানুষ, দুটি করিয়া খাইতে পারিবে আর কিছু হাত খরচ মিলিবে। ইহার বেশী তাহার আর কিসেরই বা দরকার।

প্রতিদিনের মত আজও বেলা পড়িয়া আসিল। গত দু' বৎসর যেরূপ হইয়া আসিতেছে। সেই একই ঘোড়ানিম গাছে, সেই একই চুর্ণীর খেয়াঘাট, পালেদের সেই একই কয়লার ডিপোতে মৃটে ও সরকার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া চলিতেছে—সবই পুরাতন।

দিন যায়, কিন্তু তাহার সাথ পূর্ণ হইবার তো কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। বরং দিন দিন আরও ক্রমে অবস্থা খারাপের দিকেই চলিয়াছে।

সামান্য মাইনে হোটেলের—কি হইবে ইহাতে? বাড়ীতে টেপিকে একখানা ভাল শখের কাপড় দেওয়া যায় না, পেট পুরিয়া খাইতে দেওয়া যায় না।

টেপির মা গরীব ঘরের মেয়ে। যেমন পাপের বাড়ীতে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই, স্বামীর ঘরে আসিয়াও তাই। সংসারে গভীর খাটুনি খাটিয়া ছেলেমেয়ে মানুষ করিতেছে—মুখ ফুটিয়া কোনোদিন স্বামীর কাছে কোনো আদর-আবদার করে নাই—ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিয়া পরিতেছে, আধপেটা খাইয়া নিজে ছেলেমেয়েদের জন্য দু-মুঠা বেশী ভাত জল দিয়া রাখিয়া দিতেছে হাঁড়িতে, তাহারা সকাল বেলা খাইবে। কখনো কোনোদিন সেজন্য বিরক্তি প্রকাশ করে নাই, অদৃষ্টকে নিন্দা করে নাই।

হাজারি সব বোঝে।

তাই তো সে আজকাল সর্বদা একমনে উপায় চিন্তা করে—কি করিয়া সংসারের উন্নতি করা যায়। চর্তুশ মশায়ের হোটেল রাধুনীবস্ত্রি করিলে কখনও যে উন্নতি করা যাইবে না আর পদ্ম কির খাঁটা খাইয়া মাঝে পড়িয়া হাড় কালি হইয়া যাইবে।

ভগবান যদি দিন দেন, তবে তাহার আজীবনের সংকল্প সে কার্যে পরিণত করিবে। হোটেল একখানা খুলিবে।

কুসুমের সঙ্গে এই যে আলাপ হইয়াছে, হাজারি এটাকে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করে। কুসুম চমৎকার মেয়ে—প্রবাস-জীবনে কুসুমের সাহচর্য, তাহার মধুর ব্যবহার—হোক, না সে গোয়ালার মেয়ে—কিন্তু বড় ভাল লাগে, আরও ভাল লাগে এইজন্য যে ঠিক কুসুমের মত স্নেহপ্রবণ কোনো আত্মীয়া মেয়ের সংস্পর্শে সে কখনও আসে নাই।

— অনেকখানি যে নির্ভর করা যায় কুসুমের ওপর। সব বিষয়ে নির্ভর করা যায়। মনে হয়, এ কাজের ভার কুসুমের উপর দিয়া নিশ্চিত হওয়া যায়, সে প্রতারণা করিবে তো নাই—ই, বরং প্রাণপণ-বন্ধে কাজ উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে, যেমন আপনার লোকে করিয়া থাকে।

হাজারি যদি নিজের দিন ফিরাইতে পারে, তবে কুসুমের দিনও সে অগ্নি রাখিবে না।

টেপিও তার মেয়ে, কিন্তু টেপি বালিকা, কুসুম বৃদ্ধিমতী। ও যেন তার বড় মেয়ে—যে বাপের দুঃখকষ্ট সব বোঝে এবং বুঝিয়া তাহা দূর করিবার চেষ্টা করে। মন-প্রাণ দিয়া চেষ্টা করে। মেয়েও কটে, বন্ধও বটে।

সকালে সোদিন রতন ঠাকুর আসিল না।

পদ্ম কি আসিয়া বলিল, ও ঠাকুর আজ আর আসবে না, কাল ব'লে গিয়েচে : তরকারীগলো তুমি কুটে নাও, নিয়ে রান্না চাপিয়ে দাও, আমি আঁচ দিয়ে দিচ্ছি।

হাজারি প্রমাদ গণিল। আজ হাটবার, দুপুরে অন্ততঃ একশো দেড়শো হাটুরে খরিশদার খাইবে : একহাতে তাহাদের রান্না করা এবং খাওয়ানো সোজা কথা নয়।

পদ্ম বিশ্বের কথামত সে বশি পাতিয়া তরকারি কুটিতে বসিয়া গেল—বেলা সাড়ে-

আটটার সময় সবে ডাল-ভাত নামিয়াছে—এমন সময় একজন খরিশদার টিকিট লইয়া খাইতে আসিল।

হাজারি বলিল—আজ্ঞে বাবু, সবে ডাল-ভাত নেমেছে, কি দিয়ে খাবেন?

লোকটি রাগিয়া বলিল—ন'টা বেজেচে, মোটে ডাল-ভাত? কি রকম ঠাকুর তুমি? যদি বাঁড়ুঘোর হোটেল এতক্ষণ তিনটে তরকারি হয়ে গিয়েচে। এ রকম করলেই তোমাদের হোটেল চলেচে!

হাজারি বলিল—ন'টা তো বাজেনি বাবু, সাড়ে-আটটা।

লোকটার মেজাজ রুদ্ধ ধরনের। বলিল—আমি বলিচি ন'টা, তুমি বলচো সাড়ে-আটটা! আবার মূখে মূখে তর্ক? আমি ঘাড় দেখতে জানিনে?

—সে কথা তো হয় নি বাবু। ঘাড় কেন দেখতে জানবেন না, আপনারা বড় লোক! কিন্তু ন'টা বাজলে কেষ্টনগরের গাড়ী আসে। সে গাড়ী তো এখনো আসে নি?

—আবার তর্ক? এক চড় মারবো গালে—

বোধ হয় লোকটা মারিয়াই বাসিত, ঠিক সময় পশ্ম ঝি গোলমাল শুনিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু?

লোকটা পশ্ম ঝির দিকে ফিরিয়া বলিল—তোমাদের এই অসভ্য ঠাকুরটা আমার সঙ্গে মূখোমুখি তর্ক করছে কি! জানোয়ার! হোটেলের রাঁধুনীগার করতে এসে আবার লম্বা লম্বা কথা, আজ দিতাম তোমাকে একটি চড় কবিয়ে, টের পেতে তুমি মজা—

পশ্ম ঝি বলিল—বাক বাবু, আপনি ক্ষমা দেন। ওর কথায় চটলে কি চলে? আসুন, আপনি থাকেন এখানে।

—খাবো কি, তোমাদের ঠাকুর বলচে এখনও কিছু রান্না হয় নি। তাই বলতে গেলাম তো আমার সঙ্গে তর্ক। রান্না হয় নি তো টিকিট বিক্রি করেছিঙ্গে কেন তোমরা? দেখাবো তোমাদের মজা! যত বদমায়েশ সব।

পশ্ম ঝি ঝাজের সহিত বলিল—ঠাকুর, তুমি কি রকম মানুষ? বাবুর সঙ্গে মূখো-মুখি তর্ক কো করা তোমার কি দরকার ছিল? রান্না কেনই বা হয় না। যা হয়েছে তাই দিয়ে ভাত দাও, আর মাছ ভেজে দাও। যান বাবু, আপনি গিয়ে বসুন।

খানিক পরে লোকটা খাওয়া ফেলিয়া বলিল—মাছটা একেবারে পচা। রান্নো রান্নো কেন মরতে এ হোটেল খেতে এসেছিলুম—ছি ছি—এই ঠাকুর এদিকে এসো—

পশ্ম ঝি হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু, কি হয়েছে?

—কি হয়েছে? যত সব ন্যাকামি? মাছ একদম পচা, লোকজনকে মারবার মতলব তোমাদের—না? আজই রিপোর্ট করে দিচ্ছি তোমাদের নামে—

রিপোর্টের কথা শুনিয়া পশ্ম ঝির মুখ শুকাইয়া গেল, সে তড়াতাড়ি বলিল—বাবু, আপনার পায়ে পাড় বসুন, না খেয়ে উঠবেন না, আমি দই এনে দিচ্ছি। একদিন যা হয়ে গিয়েচে ক্ষমা চেষ্টা করে নিন বড় বাবু।

সে তড়াতাড়ি দই ও বাতাসা আনিয়া দিল। লোকটি খাইয়া উঠিয়া খাইবার সময় বেচু চক্রান্ত বিনীতসুরে নিতান্ত কাঁচমাচু হইয়া বলিল—বাবু, একটা কথা আছে, আপনার টিকিটের পয়সাটা তো নিতে পারি নে। আপনার খাওয়াই হোল না। পয়সা ক'আনা আপনি নিয়ে যান।

লোকটা বলিল—না না থাক। পয়সা দিতে হবে না ফেরত—কিন্তু এরকম আর যেন কখনও না হয়।

বেচু চক্রান্ত জোর করিয়া লোকটার হাতে পয়সা কয়েক আনা গুঁজিয়া দিল।

একটু পরে গদির ঘরে হাজারি ঠাকুরের ডাক পড়িল। হাজারি গিয়া দেখিল সেখানে

পশ্ম কি দাঁড়াইয়া আছে।

বেচু চক্রান্ত বলিল—ঠাকুর, খন্দেরদের সঙ্গে ঝগড়া করিতে করিন্দন শিখেচ ?

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—ঝগড়া ? কার সঙ্গে ঝগড়া করলাম বাবু ?

পশ্ম কি বলিল—ঝগড়া করেছিলে না তুমি ওই বাবুর সঙ্গে ? সে মদুখোমুখি তুক্কো কি ! বাবু তো চড় মারবেনই ! আমি গিয়ে না পড়লে দিত কষিয়ে দড়-চার ঘা। আগে কি বলেচে না বলেচে আমি তো শুনিনি, গিয়ে দেখি বাবু রেগে লাল হয়ে গিয়েচেন। ওর কি কাণ্ডজ্ঞান আছে ? তখনও সমানে ঝগড়া চালাচে—

বেচু চক্রান্ত বলিল—খন্দের যাই কেন বলুক না তাই শুনতে যেতে হবে, এ তুমি বুড়ো হয়ে মরতে চলে, আজও শিখলে না তুমি ?

—বাবু, আপনি শুনতে বিচার করুন। ঝগড়া তো আমি করি নি—উনি বলেন নাটা বেজেচে, আমি বললাম সাড়ে-আটটা বেজেচে। এই উনি আমায় বলেন, আমি কি ঘড়ি দেখতে জানিনি ?

পশ্ম কি বলিল—তোমার সব মিথ্যে কথা ঠাকুর। ও কথার কখনো ভন্দের লোক চটে না। তুমি বৈয়াদপের মত তুক্কো করেচো তাই বাবু চটে গিয়েচেন। আমি গিয়ে স্বকস্মে শুনছি তুমি যা তা বলচো।

অবশ্য এখানে পশ্ম কিয়ের উক্তি সত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই চলিতে পারে না, এ কথা হাজারি ভাল করিয়া জানিত। বেচু চক্রান্ত মহাশয় কাহারও কথা শুনবেন না, পশ্ম কি যাহা বলিবে তাহাই শ্রব সত্য বলিয়া মানিয়া লইবেনই। সে অগত্যা চুপ করিয়া রহিল।

বেচু চক্রান্ত বলিল—পচা মাছ কে এনেছিল ?

হাজারি উত্তর দেবার পক্ষেই পশ্ম কি বলিল—ওই গিয়েছিল বাজারে। ওই এনেচে।

হাজারি বিস্ময়ে কাঁপ হইয়া গেল। কি সর্ব্বনেশে মিথ্যে কথা ! পশ্ম কি খুব ভাল করিয়াই জানে, কাল রাতে প্রায় দেড়পায়া আন্দাজ পোনা মাছ উদ্ধৃত হইলে, পশ্ম কি-ই তাহাকে বলিয়াছিল, মাছগুলো চাকিয়া রাখিতে এবং পরদিন কড়া করিয়া আর একবার ভাজিয়া লইয়া মাছের খাল করিতে ; তাহা হইলে খরিন্দার টের পাইবে না যে মাছটা বাসি। বাসি মাছ ভাজা সে খরিন্দারকে দিতে যায় নাই, পশ্ম কি নিজেই ভাজা মাছ দিবার কথা বলিয়াছিল !

কিন্তু এ সব কথা বেচু চক্রান্তকে বলিয়া কোন লাভ নাই।

বেচু চক্রান্ত বলিল—তোমার আট-আনা জরিমানা হোল। মাইনের সময় কাটা যাবে—যাও।

হাজারি রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল—কিন্তু তাহার চোখ দিয়া যেন জল বাহির হইয়া আসিতে চাহিতোছিল, কি অসহ্য অবিচার ! সে বাজারে গিয়াছিল ইহা সত্য, মাছ কিনিয়াছিল তাহাও সত্য, কিন্তু সে মাছ পচা নয়, সে মাছ খরিন্দারের পাতে দেওয়াই হয় নাই। অথচ পশ্ম কি দিয়া তাহার ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিল, আর সেই মিথ্যা অপরাধে তাহার হইল জরিমানা।

পশ্ম কি তাহার সঙ্গে যে কৈশ্ব এখনি করিয়া লাগে—কি করিয়াছে সে পশ্ম কিদির ?

রতন ঠাকুর আজ নাই, খাটুনি সবই তাহার ওপর। আট-দশজন লোক ইতিমধ্যে টীকট কিনিয়া খাবার ঘরে টুকিল, চাকরে জালগা করিয়া দিল। হাজারি তাড়াতাড়ি আলু ভাজিয়া ইহাদের ভাত দিল। তাহার খুব গোলমাল করিতে লাগিল, শব্দ, আলু-ভাজা আর ভাল দিয়া খাওয়া যায় ? ইহারা সকলেই রেলের যাত্রী। স্টেশন হইতে তাহাদের

হোটেলের চাকর বলিয়া আনিয়াছে যে একমাত্র তাহাদেরই হোটেল এত সকালে সব হইয়া গিয়াছে—মাছের কোল, অম্বল পর্য্যন্ত। এখন দেখা যাইতেছে যে ডাল আর আলুতাজা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই, এ কি অন্যায়—ইত্যাদি।

পশ্ম কি দরজার কাছে মূখ বাড়াইয়া বলিল—ও ঠাকুর, দাও না মাছ ভেজে, বাবুরা কলচেন শুনতে পাও না? বাবুরা খাবেন কি দিয়ে?

অর্থাৎ সেই পচা মাছ ভাজা আবার দাও। আজকার মাছ এখনও কোটা হয় নাই, পশ্ম তাহা জানে।

হাজারি ঠাকুর কিন্তু পচা মাছ আর খরিন্দারদের পাতে দিবে না। সে বলিল—ভাজা মাছ আর নেই। যা ছিল ফুরিয়ে গিয়েচে।

পশ্ম কি বলিল—তবে একটু বসুন বাবুরা, একখানা তরকারী করে দিচ্ছে, বসুন আপনারা, উঠবেন না।

শিক্ষামত মতি চাকর আসিয়া বলিল—ও ঠাকুর, বনগাঁয়ের গাড়ী আসবার যে সময় হোল, রাস্তাবাসী কিছু হোল না এখনও? ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে যে।

খরিন্দারেরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিল। ইহারাও গাড়ীতে কুক্ষণগরে যাইবে! একজন বলিল—ঘণ্টা পড়ে গিয়েচে?

মতি চাকর বলিল—হ্যাঁ বাবু, অনেকক্ষণ। গাড়ী গাংনাপুর ছেড়েচে—এল বলে। মাছভাজা খাওয়া মাখায় থাকুক—তাহারা তাজাতাড়ি উঠিতে পারিলে বাঁচে। গাড়ী ফেল হইয়া গেলে অনেকক্ষণ আর গাড়ী নাই।

পশ্ম কি বলিল—আহা-হা উঠবেন না বাবুরা, ধীরে-সুস্থে খান। মাছ ভেজে দাও ঠাকুর, আমি তাজাতাড়ি কুটে দিচ্ছি। বসুন বাবুরা।

খরিন্দারেরা উঠিয়া পড়িল—ধীরভাবে বসিয়া খাওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহারা চলিয়া যাইতেই পশ্ম কি বলিল—মাক্, এইবার মাছগুলো কুটি। এত সকালে কোন হোটলে রাস্তা হয়েচে? হ'খানা মাছের গাদা বেঁচে গেল।

এই জুয়াচুরিগুলো হাজারি পছন্দ করে না।

শুধু এখানে বলিয়া নয়, রেল বাজারের সব হোটলেই এই ব্যাপার সে দেখিয়া আসিতেছে। খরিন্দারকে খাওয়াইতে বসাইয়া দিয়া বলে—বাবু, গাড়ীর ঘণ্টা পড়ে গেল। খরিন্দার আগপেটা খাইয়া উঠিয়া যায়, হোটেলের লাভ।

ছিং—ন্যায় পয়সা গুনিয়া লইয়া এ কি জুয়াচুরি!

হাজারি ঠাকুর এতদিন এখানে কাজ করিতেছে, কখনো মুখ দিয়া একথা বাহির করে নাই যে ট্রেনের সময় হইয়া গেল।

অনেক সময় ট্রেনের সময় না হইলেও ইহারা মিথ্যা করিয়া ধূয়া তুলিয়া দেয়, যাহাতে খরিন্দার ব্যস্ত হইয়া পড়ে—অধিকাংশই পাড়াগেয়ে লোক, রেলের টাইমটেবল মূখন্দ করিয়া তাহারা বসিয়া নাই, ইহাদের ধাধা লাগাইয়া দেওয়া কঠিন কাজ নয়।

মতি চাকরকে শিখানো আছে, সে সময় বুঝিয়া রেলগাড়ীর ধূয়া তুলিয়া দিবে—আজ পাঁচ-বছর হাজারি দেখিয়া আসিতেছে এই ব্যাপার।

নিজের হোটেল যখন সে বুঝিবে ব্যবসাতে লাভ করিবার জন্য এসব হীন ও নীচ কৌশল সে অবলম্বন করিবে না। ন্যায় পয়সা লইবে, ন্যায়মত পেট ভরিয়া খাইতে দিবে। এই সব নিরীহ পঙ্কীবাসী রেলযাত্রীদের ঠকাইয়া পয়সা না লইলে যদি তাহার হোটেল না চলে, না হয় না-ই চলিল হোটেল।

ফাঁকি দেওয়া যায় না হাটুরে খরিন্দারদের!

আজ মদনপুরের হাট—এখানকারও হাট। পাড়ারাই হইতে দুধ ও তরিতরকারী

লইয়া বহুলোক আসে—তাহারা অনেকে এখানে খায়। বার বার যাতায়াত করিয়া তাহারা চালাক হইয়া গিয়াছে—মতি চাকর প্রথম প্রথম দু-একবার ইহাদের উপর কৌশল খাটাইতে গিয়া বেকুব বনিয়াছে।

তাহারা বলে—হোক, হোক, গাড়ীর ঘণ্টা, লাও তুমি। না হর পরের গাড়ীভার যাবানি। তা' বলে সারাদিন খাটবার পরে ভাত ফেলে ভো উঠিতি পারিনে? হ্যাঁদে লিয়ে এসো আর দু-হাতা ডাল—ও ঠাকুর—

হাট্টরে লোকজন খাইতে আসিতে আরম্ভ করিল। বেলা একটা।

ইহাদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত। ইহারা চাষা লোক, খায় খুব বেশী! তা ছাড়া খুব শৌখিন রকমের খাদ্য না পাইলেও ইহাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু পেট ভরা চাই।

সাধারণ বাবু-খরন্দারদের জন্য যে চাল রান্না হয়, ইহাদের সে চাল নয়। মোটা নাগুরা চালের ভাত ইহাদের জন্য বরাদ্দ। কেন মেশনো ডাল ও একটা চক্ষাড়ি। ইহাদের সাধারণতঃ দেওয়া হয় চিংড়ি মাছ বা কুচা মাছ। পোনা মাছ ইহাদের দিয়া পায়া যায় না। কুচো চিংড়ি কিছু বেশী দিতেও গায়ে লাগে না। ইহাদের মধ্যে অনেক সময় হাজারির নিজে গ্রামের লোকও থাকে—তাহাদের মূখে বাড়ীর খবর পাওয়া যায়, কিন্তু আজ তাহার স্বপ্নাম হইতে কেহ আসে নাই।

রতন ঠাকুর নাই—একা হাতে এতগুলি লোকের রান্না ও পরিবেষণ করিয়া হাজারি নিতান্ত ক্লান্ত দেহে যখন খাইতে বসিবার যে গাড় করিতেছে তখন বেলা প্রায় তিনটার কম নয়। পশ্চিম ঝি অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই থালায় ভাত বাড়িয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, কেচু চক্ষাড়ি গদিতে বসিয়া এবেলার কাশ মিলাইতেছেন—এই সময় পাশের হোটেলের বংশীধর ঠাকুর আসিয়া বলিল—ও ভাই হাজারি, দুটো ভাত হবে?

বংশীধর মেদিনীপুর জেলার লোক, তবে বহুকাল রাণামাটে থাকায় কথায় বিশেষ কোন টান লক্ষ্য করা যায় না। সে বলিল, আমার এক ভাগে এসেচে হঠাৎ এখন এই তিন-টার গাড়িতে। আজ হাটবার, হাট্টরে খন্দেরদের দল সব খেয়ে গিয়েচে, আমাদের খাওয়াও চুকেচে, তাই বলে দেখে আসি যদি—

হাজারি বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ পাঠিয়ে দ্যাও গিয়ে, ভাত যা আছে খুব হয়ে যাবে।

বংশীধরের ভাগিনের আসিল। চমৎকার চেহারা, আঠারো-উনিশের বেশী বয়স নয়। তাহাকে আসন করিয়া ভাত দিতে গিয়া হাজারি দৌখিল ডেকাচিতে যা ভাত আছে, তাহাতে দুজনের কুলায় না। বংশীধরের ভাগিনেরাটি পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যবান ছেলে, নিশ্চয়ই দুটি বেশী ভাত খায়—তাহারই পেট ভরবে কিনা সন্দেহ।

হাজারি উহাকেই সব ভাতগুলি বাড়িয়া দিল—ডাল তরকারি যাহা ছিল তাহাও দিল, সে খাইতে খাইতে বলিল—মাছ নেই?

—না বাবা, মাছ সব ফুরিয়ে গিয়েচে। আজ এখানকার হাটবার, বড় খন্দেরের ভিড়। মাছের টান, ডাল তরকারির টান, সবেরই টান। তোমার খাওয়ার বড় কষ্ট হোল বাবা, তা যোসো দু-পয়সার দই আনিয়া দিই।

—না না থাক, আপনার দই আনাতে হবে না।

—না বাবা কসো! বংশীধরের ভাগ্নে যা, আমার ভাগ্নেও তাই। পাশাপাশি হোটেল—এতদিন কাজ করিচ।

হাজারি নিজে গিয়া দই আনিয়া দিল। ছেলোটো জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা মামা, এখানে কোন চাকরি খালি আছে?

—কি চাকরি বাবা?

—এই ধরুন হোটেলের রাঁধুনীগিরি কি এমনি। কাজের চেষ্টায় ঘুরিচ। এখানে

কিছু হবে মামা ?

মামা বলিয়া ডাকিতে ছেলের উপর হাজারির কেমন স্নেহ হইল। সে একটু ভাবিয়া বলিল—না বাবা, আমার সম্বন্ধে তো নেই, কিন্তু একটা কথা বলি। হোটেলের রাধুনীগিরি করতে যাবে কেন তুমি ? দাঁড়া সোনারচাঁদ ছেলে। এ লাইনে বড় কষ্ট, এ তোমাদের লাইন নয়। পড়াশুনা কন্দুর করেচ ?

ছেলেটি অপ্রতিভের সুরে বলিল—না মামা, বেশী করি নি। আমাদের গাঁয়ের ছাত্র-বৃত্তি ইন্সকুলের ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম, তারপর বাবা মারা গেলেন, আর লেখাপড়া হোল না।

—তোমার নামটি কি ?

—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মধুখোপাধ্যায়।

হঠাৎ একটা চিন্তা বিদ্যুতের মত হাজারির মনের মধ্যে খেলিয়া গেল, চমৎকার ছেলেটি, ইহার সঙ্গে টেপির বিবাহ দিলে বড় সুন্দর মানায় !...

কিন্তু তাহা কি ঘটিবে ? ভগবান কি এমন পাত্র টেপির ভাগ্যে জুটাইয়া দিবেন !

ছেলেটি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল—আপনার খাওয়া হয়েছে মামা ?

—এইবার খেতে বসবো বাবা। আমাদের খাওয়া এইরকম। বেলা তিনটের এদিকে বড় একটা মেটে না, সেইজন্যই তো বলছি বাবা, এসব ছ্যাঁচড়া লাইন, তোমাদের জন্যে নয় এসব। রান্না কাজ বড় বজ্ঞাটের কাজ।

ছেলেটি একটু হতাশ সুরে বলিল—তবে কোন্ লাইন ধরবো বলুন মামা ? কত জায়গায় ঘুরে বেঁটেরে দেখলাম। আজ ছ'মাস ধরে ঘুরছি। কোথাও কিছু জোটাতে পারিনি। আপনি বলচেন রাধুনীর কাজ—কলকাতায় একটা হোটেলের বাইরে লেখা ছিল—দুজন চাকর চাই। আমি গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলাম, বল্লে—কি ? আমি বল্লাম—চাকরের কাজ খালি আছে দেখে এসেছি। বল্লে—তুমি ভদ্রলোকের ছেলে, এ কাজ তোমার জন্যে নয়। কত করে বল্লাম, কিছুতেই নিলে না।

হাজারি অবাক হইয়া শুনিতোছিল। বলিল—বলো কি ?

—তারপর শুনুন। কোথাও চাকুরি জোটে না। কলকাতায় শেষকালে খেতে পাইনে এমন হোল। দু-একদিন তো না খেয়েই কাটলো। তারপর ভাবলাম, আমার এক মামা রাণাঘাটে হোটলে কাজ করেন সেখানেই যাই। তাই আজ এলাম—উনি আমার আপন মামা নয়। মায়ের জ্যাকি ভাই। তা এখানেও আপনি বলচেন এ লাইন আমার জন্যে নয়—তবে কোথায় যাবো আর কি-ই বা করবো ?

ছেলেটির হতাশার সুর এবং তাহার দুঃখ-কষ্টের কাহিনী হাজারির মনে বড় লাগিল। সে তখনও ভাবিতোছিল—আহা, ছেলেমানুষ ! আমার বড় ছেলে, সন্ত বটে থাকলে এতদিন এত বড়টা হোত। টেপির সঙ্গে ভারি মানায়। সোনারচাঁদ হেন ছেলে ! টেপি কি আর সে অদেহ্য করেছে ! নাই বা হোল চাকুরি ! ও গিয়ে টেপিকে বিয়ে করে আমার বড় ছেলে হয়ে আমার গাঁয়ের ভিটেতে গিয়ে বসুক—ওকে কোনো কষ্ট করতে হবে না, আমি নিজে রোজগার করে ওদের খাওয়াবো। জমিজমাও তো আছে কিছু।

খাওয়া শেষ করিয়া বংশীধরের ভাগিনেরা চালায়া গেল বটে কিন্তু হাজারির প্রাণে যেন কি এক অনিন্দ্যশ্য নুতন সুরের রেশ লাগাইয়া দিয়া গেল। তরুণ মধুর ভাগি, তরুণ চোখের চাহনি হইতে এত প্রেরণা পাওয়া যায় ?.....জীবনে এ সব নবীন অভিজ্ঞতা হাজারির।

বেকালে চুর্ণীর ধারের পাছতলায় নিরুজ্জ্বল বসিয়া সে কত স্বপ্ন দেখিল। নতুন সব

স্বপ্ন। টেঁপির সহিত বংশীবাদের ভাগিনেয়টির বিবাহ হইতেছে। বামা কিছুই নাই, তাহাদেরই পাল্টি ঘর।

টেঁপির ক্ষুদ্র, কোমল হাতখানি নরনের বলিষ্ঠ হাতে তুলিয়া দিয়াছে...দুই হাত একত্র মিলাইয়া হাজারি মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করিতেছে।...টেঁপির মার চোখ দিয়া আনন্দে জল পড়িতেছে—কি সুন্দর সোনার চাঁদ জামাই!

কেন সে হোটেলের রাধুনীগিরি করিতে যাইবে ছেলেবয়সে? হাজারির নিজের হোটেলে জামাই থাকিবে ম্যানেজার, চক্ৰবর্তী মহাশয়ের মত গদিতে বসিয়া খরিদ্দারকে টিকিট বিক্রয় করিবে—হিসাবপত্র রাখিবে।

দ্বিগুণ খাটিবার উৎসাহ আসিবে হাজারির—জামাইও যা ছেলেও তাই। অত বড় অত সুন্দর, উপবৃত্ত ছেলে। টেঁপির সারাজীবনের আনন্দ ও সাধের জিনিস। ওদের দুজনের মূখের দিকে চাহিয়া সে প্রাণপণে খাটিবে। তিন মাসের মধ্যে হোটেল দাঁড় করাইয়া দিবে।

বেলা পাড়ল। চুর্ণীর খেয়াল লোক পারাপার হইতেছে—যাহারা শহরে কেনা-বেচা করিতে আসিতোছিল—এই সময় তাহারা বাড়ী ফেরে।

একবার কুসুমের সঙ্গে দেখা করিয়া হোটেল ফিরিতে হইবে—গাছতলায় বসিয়া আর বেশীক্ষণ আকাশ-কুসুম ভাবিলে চলিবে না। রতন ঠাকুর সম্ভব একেলাও দেখা দিতেছে না, তাহাকে একাই সব কাজ করিতে হইবে।

কিন্তু সত্যি কি আকাশ-কুসুম? হোটেল তাহার হইবে না? টেঁপির সঙ্গে ওই ছেলোটর—

যাক! যাজ্ঞে ভাবনায় দরকার নাই। দৌর হইয়া যাইতেছে।

পশ্চিম কি বৈকালের দিকে হাজারিকে বলিল—বলি, হ্যাঁগো ঠাকুর, আজ মাছের মূড়েটা কি হ'ল গা? আজ ত কর্তাবাবুর জ্বর। তিনি বেলা এগারোটোর মধ্যেই চলে গিয়েছেন—অত বড় মূড়েটার কি একটা টুকরোও চোখে দেখতে পেলাম না—

হাজারি মাছের মূড়েটা লুকাইয়া কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল। বড় মাছের মূড়ে সমধারণতঃ কর্তার বাসায় যায়, কিন্তু আজ কর্তার অসুখ—তিনি বেশীক্ষণ হোটেলে ছিলেন না—মূড়েটা পশ্চিম কি নিজের বাড়ী লইয়া যাইত—হাজারি কখনও মূড়ে নিজে খায় নাই—রতনঠাকুর খাইয়াছে, পশ্চিম কি ত প্রায়ই লইয়া যান—হাজারির দাবি কি থাকিবে? পারে না মূড়োর উপর? তাই সে সেটা কুসুমকে দিয়া আসিয়াছিল বখন ছুটি করিয়া চুর্ণীর ঘাটে বেড়াইতে যার তখন।

পশ্চিম বিয়ের প্রশ্নের উত্তরে হাজারি বলিল—কেন গা পশ্চিমদিদি, এতক্ষণ পরে মূড়োর খোজ হ'ল?

—এতক্ষণ পরেই হোক আর যতক্ষণ পরেই হোক—কি হ'ল মূড়েটা?

—আমায় কি একদিন খেতে নেই? তোমরা ত সবাই খাও। আমি আজ খেয়েছি।

—কই মূড়োর কাটাচোকড়া ত কিছু দেখলাম না? কোথায় বসে খেলে?

হাজারির বিরত ভাব পশ্চিম বিয়ের চোখ এড়াইল না। সে চড়াগলায় বলিল—খাও নি ভূমি। খেলে কিছু বলতাম না। ভূমি সেটা নুকিয়ে বিক্রী করছে—কেমন ঠিক কথা কি না? চোর, জুয়াচোর কোথাকার—হোটেলের জিনিস নুকিয়ে নুকিয়ে বিক্রী? আচ্ছ, তোমার চুরির মজা টের পাওয়াচ্ছ—আসুক কর্তা—

হাজারি বলিল—না পশ্চিমদিদি, বিক্রী করব কাকে? রাধা মূড়ে ফে নেবে? সান্তা আমি খেয়েছি।

—আবার মিথো কথা? আমি এতকাল হোটেল কাজ করে হাতে ঘাটা পড়িয়ে ফেললাম, মাছের মূড়োর কাটাচোকড়া আমি চিনি—না? অত বড় মূড়েটা চার আনার

কম বিক্রী কর নি। জমা দাও সে পরস্যা গদিত, ওবেলা নইলে দেখো কি হাল করি কর্তার সামনে।

—আচ্ছা নিও চার আনা পরস্যা—আমি দেব। একটু মূড়ে খেয়ে যদি দাম দিতে হয়—তাই নিও।

পশ্ম কি একটুখানি নরম হইয়া বলিল—তা হ'লে বেচোঁছিলে ঠিক ?

—না পশ্ম দিদি।

—তবে কি করলে ঠিক করে বল—

—তোমার ত পরস্যা পেলেই হ'ল, সে খোঁজে তোমার কি দরকার ?

—দরকার আছে তাই বলছি—কোথায় গেল মূড়েটা ? বলো—নইলে কর্তার সামনে তোমার অপমান করব। বল এখনো—

—আমি খেয়েছি।

—আবার ? আমার সঙ্গে চালাকি করে তুমি পারবে ঠাকুর ? আমি এবার বুঝতে পেরেছি মূড়ে কোথায় গেল—তোমার সেই—

হাজারি জানে পশ্ম কি বলিতে বাইতেছে—সে পশ্ম ঝিরের মূখের কথা চাপা দিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল—পশ্ম দিদি, তোমাদের ত খেয়ে পরে মানুষ হ'লি গরীব বামুন। কেন আর ও সামান্য জিনিস নিয়ে বকাঝকা কর ?

এ কথায় পশ্ম কি নরম না হইয়া বরং আরও উগ্ধ হইয়া উঠিল। বলিল—নিজে খেলে কিছু বলতাম না ঠাকুর—কিন্তু হোটেলের জিনিস পব দিয়ে খাওয়ান সহ্য হয় না। এর একটা বিহিত না করে আমি যদি ছাড়ি তবে আমার নামে কুকুর পুষো, এই বলে দিচ্ছি সোজা কথা।

হাজারি ভয়ে ও উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল—নিজের জন্য নয়, কুসুমের জন্য। পশ্ম ঝিরের অসাধ্য কাজ নাই—সে না জানি কি করিয়া বসিবে—কুসুমের শাস্ত্রভীর কানে হয়ত কত রকমের কথা উঠাইবে, তাহার উপরে যদি কুসুমের বাপের বাড়ী অর্থাৎ তাহার স্বগ্রামে সে কথা গিয়া পৌঁছায়—তবে উভয়েরই লজ্জায় মূখ দেখানো ভার হইয়া উঠিবে সেখানে। অথচ কুসুম নিরপরাধিনী। পশ্ম কি চলিয়া গেল।

হাজারি ভাবিয়া চিন্তিয়া রতনঠাকুরের শরণাপন্ন হইল। তাহার আত্মীয়কে বিনা পরসায় খাওয়ানার যত্নবস্তুর মধ্যে হাজারি ছিল—সুতরাং রতন হাজারির দিকে টানিত। সে বলিল—তুমি কিছু ভেব না হাজারি দা, পশ্ম দিদিকে আমি ঠাণ্ডা করে দেব। মূড়ে বাইরে নিয়ে যাবে, তা, আমার একবারখানি জানালে হ'ত নি ? তোমায় কত বুঝিয়ে পারব আমি ?

কিছু পরে সম্ভার দিকে বেচু চক্ৰান্ত আসিলেন। চাকর হুকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া আনিয়া। হুকো হাতে লইয়া বেচু চক্ৰান্ত বলিলেন—ধুনো গন্ধাজল দে আগে—আর পশ্মকে বাজারের ফন্দ দিতে বলে দে—

করলাওয়াল মহাবীরপ্রসাদ বসিয়াছিল পাণ্ডনার প্রত্যাশায়—তাহাকে বলিলেন—সন্ধ্যার সন্ধ্যা এখন কি ? ওবেলা ত মূড়ে বার আনা নিয়ে গিয়েছ, আবার ওবেলা দেওয়া যায় ? কাল এসো। তোমার কি ?

একটি স্লোগা কালো-হাত লোক হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বাবু, সেদিন কুমড়া দিয়েলাম—তার পরস্যা।

—কুমড়া ? কে কুমড়া নিয়েছে ?

—আজ্ঞে, বাবু, আপনাদের হোটলে দিয়ে গিয়েলাম—ছ'আনা দাম বলেলাম, ত

তিনি বললেন—পাঁচগুণ্ডা পয়সা হবে। তা বালি, ভন্দর নোকের কথা—তাই দ্যান। তিনি বললেন—আজ নয়, বৃধবারে এসে নিয়ে যেওয়ানে—তাই এ্যালাম—

—ছ'আনা পয়সার কুমড়ো ধারে নিয়েছে কে—খাতায় কি বাজারের ফন্দীর মধ্যে ত ধরা নেই, এ ত বাপু আশ্চর্য্য কথা—আমরা ধারে জিনিসপত্রের খরিদ করি নে। যা কিনি তা নগদ। কে তোমার কাছে কুমড়ো নিলে? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি।

বেচু রতন ও হাজারি ঠাকুরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহারা কুমড়ো কেনা ত দুয়ের কথা—গত পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে কুমড়োর তরকারিই রাখে নাই, বলিল—কোন কুমড়া চক্ষেও দেখে নাই এই করাদনে।

কথাবার্তার মধ্যে পশ্ম বি বাজারের ফন্দী লইয়া ঘরে ঢুকিতেই কুমড়াওয়ানা বলিয়া উঠিল—এই যে! ইনিই তো নিয়েলেন! সেই কুমড়ো মা ঠাকুরণ—বলিলেন বৃধবারে আসতি—তাই আজ এলাম। বাবু জিজ্ঞেস করছিলেন কুমড়ো কে নিয়েলেন—

পশ্ম বি হঠাৎ যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলিল—হ্যাঁ, কুমড়ো নিয়ে—ছিলাম তা কি হবে? পাঁচ আনা পয়সা নিয়ে কি পাণিয়ে যাব? দিয়ে দাও ত কস্তাবাবু, ওর পয়সা মিটিয়ে—আমি এর পরে—

বেচু চক্ৰান্তি দ্বিরাঙ্কি না করিয়া কুমড়োওয়ানাকে পয়সা মিটাইয়া দিলেন, সে চলিয়া গেল।

রতনঠাকুর আড়ালে গিয়া হাজারিকে বলিল—হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল পশ্মদিদি—কিন্তু কস্তাবাবুর দরদটা একবার দেখেছ ত হাজারি-না?

—ও আর দেখাদেখি কি, দেখেই আসছি। আমি যদি কুমড়ো নিতাম তবে পশ্মদিদি আজ রসাতল বাধাত—কস্তাবাবুও তাতেই সায় দিত। এ ত আর তুমি আমি নই? এ হোটেল পশ্মদিদিই মালিক। তুমি এইবার একবার বল পশ্মদিদিকে মূড়োর কথাটা! নইলে ও এখুনি লাগাবে কস্তাকে—

রতন পশ্ম বিকে আড়ালে বলিল—ও পশ্মদিদি, গরীব বাবুদন তোমাদের দোরে করে খাচ্ছে—কেন আর ওকে নিয়ে অমন করো? একটা মূড়ো যদি সে খেয়েই থাকে—এতদিন খাটছে এখানে, তা নিয়ে তাকে অপমান করো না। সবাই ত মেনে—কেউ ত নিতে ছাড়ে না—আমি নিইনে, না তুমি নাও না? বেচারীকে কেন বিপদে ফেলবে?

পশ্ম বি বলিল—ও খায়নি—ও এখান থেকে বের করে ওর সেই পেয়ারের কুসুমকে দিয়ে এসেছে—আমি কাঁচ খুকী? কিছ, বুঝি নে? নছার বদমাইশ লোক কৌথাকার—

রতন হাসিয়া বলিল—যা বোঝে সে করুক গিরে পশ্মদিদি—তোমার জাম্মার কি? সে মূড়ো নিজে খায়,—পরকে দেয়—তোমার তা দেখবার দরকার কি? তুমি কিছ বোল না আজ আর ওকে।

পশ্ম বি কুমড়োর ব্যাপার লইয়া কিছ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিল—নতুবা সে রতনের কথা এত সহজে রাখিত না। বলিল—তা'হলে বারং কষ্টে দিও শুকে—বারদিগর যেন এমন আর না করে। তা'হলে আমি অনর্থ বাধাবো—কারোর কথা শুনবো না।

সে রাতে হোটেলের কাজকর্ম চুকাইয়া হাজারি চুপের ধারে বেড়াইতে গেল। দিব্য জ্যোৎস্না-রাত—প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে।

আজ কি সর্বনাশই আর একটু হইলে হইয়াছিল! তাহার নিজের জন্য সে ভাবে না ভাবে কুসুমের জন্য। কুসুম পাড়ারগায়ের মেয়ে—সেখানে তার বদনাম রটিলে উত্তরেরই সেখানে মুখ দেখানো চলিবে না। আর তাহার এই বয়সে এই বদনাম রটিলে লোকেই যা বলিবে কি?

কুসুমকে সে মেয়ের মত দেখে—ভগবান জানেন। ওসব খেয়াল তাহার থাকিলে এই

রাণাঘাট শহরে সে কত মেয়ে জটাইতে পারিত। এই রাখাবল্লভতলার মাটি ছুঁইয়া সে বলিতে পারে জীবনে কোনদিন ওসব খেয়াল তার নাই। বিশেষতঃ কুসুম। ছিঃ ছিঃ—চৌপার সঙ্গে যাহাকে সে অভিন্ন দেখে না—তাহার সম্বন্ধে রতন ঠাকুরের কাছে পশ্মা যি যে সব বিস্তীর্ণ কথা বলিয়াছে শুনিলে কানে আঙুল দিতে হয়।

রাত প্রায় দেড়টা বাজিয়া গেল। শহর নিষ্প্রাণ হইয়া গিয়াছে, কেবল কুণ্ডুদের চুণীর ধারের কাঠের আড়তে হিন্দুস্থানী কুলীরা ঢোলক বাজাইয়া বিকট চিংকার শব্দ করিয়াছে—ওই উহাদের নাক গান! যখন নর্থবেগল এক্সপ্রেস আসিয়া দাঁড়ায় স্টেশনে তখন সে হোটেল হইতে বাহির হইয়াছে—আর এখন স্টেশন পর্যন্ত নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কারণ এত রাতে কোনো ট্রেন আসে না। রাত চারটা হইতে আবার ট্রেন চলাচল শব্দ হইবে।

হোটেলের দরজা বন্ধ। ডাকাডাকি করিয়া মতি চাকরের ঘুম ভাঙাইতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বড় গরম—স্টেশনের প্রাটফর্ম না হয় বাকী রাতটুকু কাটাইয়া দেওয়া যাক্। আজ রাতে ঘুম আসিতেছে না চোখে।

ভোরে উঠিয়া হোটেলের সামনে আসিয়া হাজারি দেখিল হোটেলের দরজা এখনও বন্ধ। সে একটু আশ্চর্য হইল। মতি চাকর তো অনেকক্ষণ উঠিয়া অন্যদিন দরজা খোলে। ডাকাডাকি করিয়াও কাহারো সাড়া পাওয়া গেল না—তারপর গদির ঘরের জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখিতে গিয়া হাজারি লক্ষ্য করিল—বাসনের ঘরের মধ্যে অত আলো কেন?

ঘুরিয়া আসিয়া দেখিল বাসনের ঘরের দরজা খোলা। ঘরের মধ্যে কেহই নাই।

মতি চাকরেরও সাড়াশব্দ নাই কোনদিকে। এরকম তো কখনো হয় না।

এমন সময় বদু বাঁড়ুয্যের হোটেলের চাকর নিমাই গয়লাপাড়া হইতে চায়ের দুধ লইয়া ফিরিতেছে দেখা গেল—বদু বাঁড়ুয্যের হোটেল একটা চায়ের স্টলও আছে—খুব সকাল হইতেই সেখানে চা বিক্রী শুরুর হয়।

হাজারির ডাকে নিমাই আসিল। দুজনে ঘরের মধ্যে খুঁকিয়া দেখিল মতি চাকর খাবার ঘরে শুইয়া দিবা নাক ডকাইয়া ঘুমাইতেছে। উভয়ের ডাকে মতি খড়মড় করিয়া উঠিল।

হাজারি বলিল—মতি দোর খোলা কেন?

মতি বলিল—তা তো আমি জানি নে! তুমি রাতিরে ছিলে কোথায়? দোর খুলে কে?

তিনজনে ঘরের মধ্যে আসিয়া এদিক ওদিক দেখিল। হঠাৎ মতি বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা, সর্বনাশ। থালা বাসন কোথায় গেল? একখানাও তো দেখছি নে!

—সে কি!

তিনজনে মিলিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোনো ঘরেই বাসনের সম্মান পাওয়া গেল না। নিমাই বলিল—চায়ের দুধটা দিয়ে আসি হাজারি-দা, বাসন সব চক্কদান দিয়েচে কে। তোমাদের কর্তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

ইতিমধ্যে রতন ঠাকুর আসিল। সেই গিয়া বেচু চক্রান্তকে ডাকিয়া আনিল। পশ্মা ঝিও আসিল। চুরি হইয়া গিয়াছে শুনিয়া পাশের হোটেল হইতে বদু বাঁড়ুয্য আসিলেন। বাজারের লোকজন জড় হইল—খানার খবর দিতে তখনি, এ. এস. আই নেপালবাবু ও দুজন কনস্টেবল আসিল। ইহা হৈ বাধিয়া গেল। বেচু চক্রান্ত মাথায় হাত দিয়া ততক্ষণ বাসিয়া পড়িয়াছেন, প্রায় ঘাট-সন্তর টাকার থালা বাসন চুরি গিয়াছে!

বেচু চক্ৰান্ত বলিলেন—হাজারি রাতিরে কোথায় ছিলে ?

—ইন্টিশানের প্র্যাটফর্মে বাবু! বস্তু গরম হ'চ্ছিল—তাই ঘাটের ধার থেকে ফিরে ওখানেই রাত কাটলাম।

নেপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কত রাতে প্র্যাটফর্ম শূন্যেছিলে ? কোন্ প্র্যাটফর্ম ?

—আজ্ঞে, বনগাঁ লাইনের প্র্যাটফর্মের বেষ্ট্রর ওপর।

—তোমায় সেখানে কেউ দেখেছিল ?

—না বাবু, তখন অনেক রাত।

—কত ?

—দেড়টার বেশী।

—এতক্ষণ পর্যন্ত কোথায় ছিলে ?

—রোজ খাওয়া-দাওয়ার পরে আমি দুবেলাই চুর্ণীর খেরাঘাটে গিয়ে বসি। কালও সেখানে ছিলাম।

—আর কোনো দিন হোটেল ছেড়ে প্র্যাটফর্ম শূন্যেছিলে ?

—মাঝে মাঝে শূন্যে, তবে খুব কম।

এই সময় বেচু চক্ৰান্তকে পশ্চিম ঝি চুপি চুপি কি বলিল। বেচু চক্ৰান্ত নেপালবাবুকে বলিলেন—দারোগাবাবু, একবার ঘরের মধ্যে একটা কথা শুনেন যান দয়া করে—

ঘরের ভিতর হইতে কথা শুনিয়া আসিয়া নেপালবাবু বলিলেন—হাজারি ঠাকুর, তুমি কুসুমকে কেন ?

হাজারি মূখ শুকাইয়া গেল। ইহার মধ্যে ইহারা কুসুমের কথা আনিয়া ফেলিল কেন ? কুসুমের সঙ্গে ইহার কি সম্পর্ক ?

হাজারি মূখের ভাব নেপালবাবু লক্ষ্য করিলেন।

হাজারি উত্তর দিতে একটু দেরি হইতেছিল, নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—কথার জবাব দাও।

হাজারি থতমত খাইয়া বলিল—আজ্ঞে চিনি।

পশ্চিম ঝি দোরের কাছে মূখে আঁচল ঢাপা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হাজারি বুঝিল—কুসুমের কথা সে-ই কৰ্ত্তাকে বলিয়াছে নতুবা তিনি অতশত খোঁজখবর রাখেন না। কৰ্ত্তামশায় দারোগাকে বলিয়াছেন কথাটা—সে ওই পশ্চিম ঝয়ের উস্কানিতে।

—কুসুম থাকে কোথায় ?

—গোয়ালপাড়ায়, বড় বাজারের ওদিকে।

—সে কি করে ?

—দুধ-দই বেচে। গরীব লোক—

—কয়েক কত ?

—এই চমিশ-পঁচিশ—

পশ্চিম ঝি একটু মূঢ়াচাঁ হাসিল এই উত্তর শুনিয়া, হাজারি তাহা চোখ এড়াইল না। দারোগাবাবুর প্রশ্নের গতি তখনও সে বুঝিতে পারে নাই—কিন্তু পশ্চিম ঝয়ের মূখের মূঢ়াচাঁ হাসি দেখিয়া সে বুঝিল কেন ইহারা কুসুমের কথা এত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে।

—তোমার সঙ্গে কুসুমের কত দিনের আলাপ ?

—সে আমার গাঁরের মেয়ে। সে যখন ছেলেমানুষ তখন থেকে তাকে জানি। তার বাবা আমার বন্ধুলোক—আমাদের পাড়ার পাশেই—

—কুসুমের সঙ্গে তুমি প্রায়ই লেখাশোনা কর—না ?

—মাঝে মাঝে দেখা করি বৈকি—গাঁয়ের মেয়ে, তার তত্ত্বাবধান করা তো দরকার—
নেপালবাবু হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন—নিশ্চয় দরকার। এখানে তার শব্দব্যাধী ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—স্বামী আছে ?

—না, আজ বছর চার-পাঁচ মারা গিয়েছে—শাশুড়ী আছে বাড়ীতে। এক দেওর-পো আছে।

—তুমি মাঝে মাঝে হোটেলের রান্না জিনিস তাকে দিয়ে আস ?

লজ্জার ও সঙ্কোচে হাজারি যেন কেমন হইয়া গেল। এসব কথা এখানে কেন ?

পদ্ম ঝি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়াই মূখে আঙ্গি চাপা দিল। নেপালবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—আঃ, হাসি কিসের ? এটা হাসির জায়গা নয়। চুপ্—

কিন্তু দারোগাবাবু ধমক দিলে কি হইবে—পদ্ম ঝির হাসি সংক্রামক হইয়া উঠিয়া উপস্থিত লোকজন সকলেরই মূখে একটা চাপা হাসির ঢেউ আনিয়া দিল। অন্য লোকের হাসি হাজারি তত লক্ষ্য করে নাই কিন্তু পদ্ম ঝির হাসিতে সে কিসের একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ঠাণ্ড করিয়া মরীয়া হইয়া বলিয়া উঠিল—দারোগাবাবু, সে গরীব লোক, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, সে আমাদের বাবা বলে ডাকে—আমার সে মেয়ের মত—তাই মাঝে মাঝে কোনদিন একটু-আধটু তরকারী কি রাঁধা মাংস তাকে দিয়ে আসি। কত তো ফেলা-বেলা যায়, তাই ভাবি যে একজন গরীব মেয়ে—

—বুঝেছি, থাক আর তোমার লোকচার দিতে হবে না। কাল রাতে তুমি সেখানে গিয়েছিলে ?

—আজ্ঞে না বাবু।

—আজ সকালে গিয়েছিলে ?

—না বাবু, সকালে প্ল্যাট্ কন্সর্ভ থেকেই হোটেল এসেছি।

—হুঁ।

দারোগাবাবু অন্য সকলের জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল মতি চাকর ও হাজারিকে বলিলেন—আমার সঙ্গে তোমাদের থানায় যেতে হবে। কনস্টেবলদের বলিলেন—এদের ধরে নিয়ে চল।

মতি কান্নাকাটি করিতে লাগিল—একবার যেচু চক্রান্ত, একবার দারোগাবাবুর হাতে পায়ে পড়িতে লাগিল। সে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট—ঘরের মধ্যে ঘুমাইয়া ছিল, তাহাকে থানায় লইয়া গিয়া কি ফল ?—ইত্যাদি।

হাজারির প্রশ্ন উড়িয়া গেল থানায় ধরিয়া লইয়া যাইবে শুনিয়া।

এ কি বিপদে ভগবান তাহাকে ফেলিলেন ?

থানা-পুলিস বড় ভয়ানক ব্যাপার, মোকদ্দমা হইলে উকীল দিবার ক্ষমতা হইবে না তাহার, বিনা কৌশল্যেতে জেল খাটিতে হইবে—কত বছর তাই বা কে জানে ? না থাইয়া স্ত্রীপুত্র মারা পড়িবে। জেলখাটা আসামীকে ইহার পর চাকুরি বা দিবে কে ?

কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক ব্যাপার, যদি ইহারা কুসুমকে ইহার মধ্যে জড়ায় ? জড়াবেই বোধ হয়। হয়তো কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস করিতে চাইবে।

নিরপরাধিনী কুসুম ! লজ্জার ঘণায় তাহা হইলে সে হয়তো গলায় দাড়ি দিবে। আরও কত কি কথা লোকের রটাইবে এই সূত্র ধরিয়া। তাহাদের গ্রামে একথা তো গেলে তাহার নিজেরও আর ঐশ্বর্য দেখাইবার উপায় থাকিবে না।

কখনও সে একটা বিড়ি-দেশলাই কাহারও চুরি করে নাই জীবনে—সে করিবে

হোটেলের বাসন চুরি ! নিজের মূখের জিনিস নিজেকে বণ্ডিত করিয়া সে কুসুমকে মাঝে মাঝে দিয়া আসে বটে—চুরির জিনিস নয় সে সব। সে খাইত, না হয় কুসুম খায়।

থানায় গিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই হাজারি ও মতি বসিয়া রহিল। হাজারি শুনিল বেচু চক্রান্ত ও পদ্ম ঐ দৃ-জনেই বলিয়াছে উহাদের উপরই তাহাদের সন্দেহ হয়। সুতরাং পদলিস তো তাহাদের ধরিবেই।

থানার বড় দারোগা থানায় ছিলেন না—বেলা একটার সময় তিনি আসিয়া চুরির সব বিবরণ শুনিয়া হাজারি ও মতিকে তাহার সামনে হাজির করিতে বলিলেন। হাজারি হাত জোড় করিয়া দারোগাবাবুর সামনে দাঁড়াইল। দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—হোটলে কতদিন কাজ করচ ?

—আজ্ঞে বাবু, ছ' বছর।

—বাসন চুরি করে কোথায় রেখে দিয়েচ ?

—দোহাই বাবু—আমার বয়েস ছ'চল্লিশ-সাতচল্লিশ হোল—কখনো জীবনে একটা বিড়ি কারো চুরি করিনি—

দারোগাবাবু ধমক দিয়া বলিলেন—ওসব বাজে কথা রাখো। তুমি আর ওই চাকর বেটা দুজনে মিলে যোগসাজসে চুরি করচ। স্বীকার করো—

—বাবু, আমি এর কোনো বাস্তা জানি নে! আমি সে রাস্তিরে হোটলেই ছিলাম না।

—কোথায় ছিলে ?

—ইষ্টিশানের প্ল্যাটফর্মে শূয়ে ছিলাম সারারাত।

—কেন ?

—বাবু, আমি খাওয়া দাওয়া করে চুর্ণীর ঘাটে বেড়াতে যাই রোজ। বন্ধ গরম ছিল বলে সেখানে একটু বেশী রাত পর্যন্ত ছিলাম—ফিরে এসে দেখি দরজা বন্ধ, তাই ইষ্টিশানে—

এই সময় নেপালবাবু ইংরাজিতে বড় দারোগাকে কি বলিলেন। বড় দারোগা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—ও। আচ্ছা—তুমি কুসুম বলে কোনো মেয়েমানুষের বাড়ী যাতায়াত করো ?

—বাবু, কুসুম আমার গায়ের মেয়ে। গরীব বিধবা, তাকে আমি মেয়ের মতো দেখি—সেও আমাকে বাবা বলে ডাকে, বাবার মত ভক্তিছেন্দা করে। যদি সেখানে গিয়ে থাকি, তাহলে তাতে দোষের কথা কি আছে বাবু আপনিই বিবেচনা করে দেখুন। একথা লাগিয়েচে আমাদের হোটেলের পদ্ম ঐ—সে আমাকে দু'চোখ পেড়ে দেখতে পারে না—কুসুমকেও দেখতে পারে না। আমাদের নামে নানারকম বিচ্ছারি কথা সেই রটিয়েচে। আপনি হাকিম—দেবতা। আর মাধার ওপর চন্দ্র সূর্য্য রয়ছেন—আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হোতে গেল—আমার সৈদিকে কখনো মতি-বন্দি যাকনি বাবু। আমি তাকে মেয়ের মত দেখি—তাকে এর মধ্যে জড়াবেন না—সে গেরস্তর বোঁ—মরে যাবে খেলায়।

বড় দারোগা অত্যন্ত বৃদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ লোক। হাজারির চোখমুখের ভাব দেখিয়া তাহার মনে হইল লোকটা মিথ্যা বলিতেছে না।

বড় দারোগা মতি চাকরকে অনেকক্ষণ ধীরে ধীরে করিলেন। তাহার কাছেও বিশেষ কোনো সদুত্তর পাওয়া গেল না—তাহার সেই এক কথা, ঘরের মধ্যে অঘোরে ঘুমাইতে-ছিল, সে কিছুই জানে না।

বড় দারোগা বলিলেন—দৃ-জনকে হাজতে পুরে রেখে দাও—এমনি এদের কাছে কথা বেরুবে না—কড়া না হলে চলবে না এদের কাছে।

হাজারি জানে এই কড়া হওয়ার অর্থ কি। অনেক দম্পত্য হয়তো সহ্য করিতে হইবে আজ। সব সহ্য করিতে সে প্রস্তুত আছে যদি কুসুমের নাম ইহার আর না তোলে।

বেলা দুইটার সময় একজন কনস্টেবল আসিয়া কিছু ঘাঁড়ি ও ছোলা-ভাজা দিয়া গেল। সকাল হইতে হাজারি কিছুই খায় নাই—সেগুলি সে গোপ্তাসে খাইয়া ফেলিল।

বেলা চারটার সময় রতন ঠাকুর হোটেল হইতে হাজারির জন্য ভাত আনিল।

বলিল—আলাদা করে বেড়ে রেখেছিলাম, লুকিয়ে নিয়ে এলাম হাজারি-দা। কেউ জানে না যে তোমার জন্যে ভাত আনিচি।

বড়দারোগার নিকট হইতে অনুমতি লইয়া রতন ঠাকুর হাজতের মধ্যে ভাত লইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মতিবর ভাত আনিবার কথা তাহার মনে ছিল না—হাজারি বলিল—ওই ভাত দু'জনে ভাগ করে খাবো এখন।

রতন বলিল—হোটেলের মহাকাণ্ড বেধে গিয়েচে। একটা ঠিকে ঠাকুর আনি হয়েছিল, সে কাজের বহর দেখে এবেলাই পালিয়েচে। খন্দের অনেক ফিরে গিয়েচে। পদ্ম বলচে তুমি আর মতি দু'জনে নিলে এ চুরি করচ। কুসুমের বাড়ী খানাতল্লাস না করিয়ে পদ্ম ছাড়বে না বলচে। সেখানে বাসন চুরি করে তুমি রেখে এসেচ। কতবারও তাই মত। তুমি ভেবে না হাজারি-দা—মোকদ্দমা বাধে যদি, আমি উকীল দেবো তোমার হয়ে। টাকা যা লাগে আমি দেবো। তুমি এ কাজ করনি আমি তা জানি আর কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি কি ধরণের লোক।

হাজারি রতনের হাত ধরিয়া বলিল—ভাই আর যা হয় হোক—কুসুমের বাড়ী যেন খানাতল্লাস না হয় এটা তোমাকে করতে হবে। কোনো উকীলের সঙ্গে না হয় কথা বলো, আমার দুমাসের মাইনে পাওনা আছে—আমি না হয় তোমাকে দেবো।

রতন হাসিয়া বলিল—তোমার সেই মাইনে আবার দেবে ভেবেচ কতবার? তা নয়—সে তুমি দ্যাও আর নাই দ্যাও—আমি উকীল দেবো তুমি ভেবে না। কত পরস্যা রোগ-গার করলাম জীবনে হাজারি-দা—এক পরস্যা তো দাঁড়াল না। সংকাজে দু'পরস্যা খরচ হোক।

হাজারি বলিল—মতিকে তাহলে ভাত দিয়ে এস—সে অন্য ঘরে কোথায় আছে।

রতন বলিল—মতিকে আমার সন্দেহ হয়।

—না বোধ হয়। ও যদি চুরি করবে তো অমন নিশ্চিন্দ হয়ে ঘুমোতে পারে নাক ডাকিয়ে? আর ও সেরকম লোক নয়।

রতন ভাতের থালা লইয়া চলিয়া গেল।

আরও পাঁচ-ছ'দিন হাজারি ও মতি হাজতে আটক থাকিল। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিল না—সুতরাং চুরির চার্জ-শীট দেওয়া সম্ভব হইল না।

ছ'দিনের দিন দু'জনে খালাস পাইল।

মতি বলিল—হাজারি-দা, এখন কোথায় যাওয়া যায়? হোটেলের কি আমাদের আর নেবে?

হাজারিও জানে হোটেলের ইহাদের চাকুরি গিয়াছে। কিন্তু সেখানে দু'মাসের মাহিনা বাকি—বেচু চক্রান্তর কাছে গিয়া মাহিনা চাহিয়া লইতে হইবে।

বেলা তিনটা। এখন হোটেলের গেলে কতটা মশাই থাকিবেন না—সুতরাং হাজারি সন্ধ্যার পরে হোটেলের বাইরে ঠিক করিল। কতদিন চুপুঁরি ধারে যায় নাই—রাধাকল্পভতল্যায় গিয়া ঠাকুরকে প্রশ্ন করিয়া সে আপন মনে চুপুঁরি ধারে গিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ নদীর ধারে বসিয়া হাজারির মনে পড়িল, সে এত বেলা পর্যন্ত কিছু যায় নাই। রতন হাজতে রোজ ভাত দিয়া বাইত, আজ দুদিন সে আর আসে নাই—কেন আসে নাই কে জানে, হয়তো পশ্ম জানিতে পারিয়া বারণ করিয়া দিয়াছে—কিংবা হয়তো তাহাদের ভাত আনিয়া দেওয়ার অপরাধে তাহারও চাকুরি গিয়াছে।

একটা পয়সা নাই হাতে যে কিছু কিনিয়া খায়। হাজতের ভাত হাজারি এক দিনও খায় নাই—আজও একজন কনস্টেবল ভাত আনিয়াছিল, সে বলিয়াছিল—তেওয়ারাজি, আমার দুটি মুড়ি বরং এনে দিতে পারো, আমার জ্বর হয়েছে ভাত খাবো না।

বেলা বারোটার সময় সামান্য দুটি মুড়ি খাইয়াছিল—আর কিছু পেটে যায় নাই সারাদিন। সন্ধ্যার পরে হোটেল গিয়া দুটি ভাত খাইবে এখন, সেই ভালো।

হাজারির সন্দেহ হয় বাসন আর কেহ চুরি করে নাই, পশ্ম বিয় নিজেই কাজ। কদিন হাজতে বসিয়া বসিয়া ভাবিয়া তাহার মনে হইয়াছে, পশ্ম অন্য কোনো লোকের যোগসাজসে এই কাজ করিয়াছে। ও অতি ভয়ানক চরিত্রের মেয়েমানুষ, সব পারে। গত বৎসর খন্দেরদের কাপড়ের ব্যাগ যে চুরি হইয়াছিল—সেও পশ্ম বিয়ের কাজ—এখন হাজারির ধারণা জন্মিয়াছে।

এরকম ধারণা সে বিদ্রোহবশত করিতেছে না, গত ছ বৎসর হাজারি পশ্ম বিয়ের এমন অনেক কাণ্ড দেখিয়াছে বাহা সে প্রথম প্রথম ভত বুঝিত না—কিন্তু এখন দূরে দূরে যোগ দিয়া সে অনেকটাই বুঝিয়াছে।

বৃদ্ধ বেচু চক্রান্ত পশ্ম বিয়ের একেবারে হাতের মুঠার মধ্যে—দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বোঝেন না, হোটেলটির যে কি সর্বনাশ করিতেছে পশ্ম দিদি, তাহা তিনি এখন না বুঝিলেও পরে বুঝিবেন।

রতন ঠাকুরও সোদিন ভাত দিতে আসিয়া অনেক কথা বলিয়া গিয়াছে।

—হাজারিদা, হোটেলের অশ্লৈষিক জিনিস পশ্মদিদের ঘরে—আজকাল বাজারের জিনিস পর্যন্ত যেতে আরম্ভ করেছে। সোদিন দেখলে তো কুমড়োর কাণ্ড ? চুবে খাবে এমন সাজানো হোটেলটা বলে দিচ্ছি। পশ্ম দিদির কেন অত টান বাড়ীর ওপরে—তাও আমি জানি। তবে বলিলে, যাহোক, আট টাকা মাইনের চাকুরিটা করি—এ বাজারে হঠাৎ চাকুরিটা অনশ্বক খোঁষাবো ?

সন্ধ্যার পরে হাজারি হোটেলের গদিঘর দিয়া ঢুকিতে সাহস না করিয়া রাস্তাঘরের দিকের দরজা দিয়া হোটেল ঢুকিল। ভাবিয়াছিল রাস্তাঘরে রতন ঠাকুরকে দেখিতে পাইবে—কিন্তু একজন অপরিচিত উড়িয়া ঠাকুরকে ভাত রাঁধিতে দেখিয়া সে যে-পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই বাহির হইয়া মাইবার জন্য পিছন ফিরিয়াছে—এমন সময় খন্দেরদের খাবার ঘর হইতে পশ্ম বি বলিয়া উঠিল—কে ওখানে ? কে যায় ?

হাজারি ফিরিয়া বলিল—আমি পশ্মদিদি—

পশ্ম তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—আমি ?—কে আমি ?—ও। হাজারি ঠাকুর...তুমি কি মনে করে ? চলে যাক কোথায় অত তাড়াতাড়ি ? ঢুকলেই বা কেন আর বেরুচ্ছই বা কেন ?

—আজ হাজত থেকে খালাস পেয়েছি পশ্মদিদি। কোথায় আর যাবো, যাবার তো জায়গা নেই কোথাও—হোটলেই এলাম, খিদে পেয়েছে—দুটো ভাত খাবো বলে। রাস্তা-ঘরে এসে দেখি রতন ঠাকুর নেই, তাই সামনে দিয়ে গদিঘরে যাই—

—তা যাও গদিঘরে। এই খন্দেরের খাবার ঘর দিয়েই যাও—

হাজারি সংকুচিত অবস্থায় হোটেলের খাবার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকিয়া গদির ঘরে গেল। পশ্ম বি গেল পিছদ পিছদ।

বেচু চক্ৰান্তি বলিলেন—এই যে, হাজারি যে! কি মনে করে?

হাজারি বলিল—আজ্ঞে কর্তৃমশায়, পুন্ডলিসে ছেড়ে দিলে আজ—তাই এলাম। যাবো আর কোথায়? আপনার দরজায় দুলটো করে খাই। তা ছেড়ে আর কোথায় যাবো বলুন?

বেচু চক্ৰান্তি কোনো উত্তর দিবার আগেই পশ্ম ঝি আগাইয়া আসিয়া বেচু চক্ৰান্তিকে বলিল—ওকে আর একদণ্ড এখানে থাকতে দিও না কর্তৃবাবু—এখনি বিদেয় করো। বাসন ও আর মতি যোগসাজসে নিয়েচে। পাকা চোর, পুন্ডলিসে কি করবে ওদের?

হাজারি এবার রাগিল। পশ্ম ঝিকে কখনও সে এ সূত্রে কথা বলে নাই। বলিল—তুমি দেখেছিলে বাসন নিতে পশ্ম দিদি?

পশ্ম ঝি বলিল—তোমার ও চোখ-রাঙানির ধারে ধারে না পশ্ম, তা বলে দিচ্ছি হাজারি ঠাকুর। অমন ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো না—বাসন তোমাকে নিতে দেখলে হাতের দড়ি তোমার খুলতো না তা জেনে রেখো।

হাজারি নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে ততক্ষণ। নীচু হওয়াই তাহার অভ্যাস—যাহারা বড়, তাহাদের কাছে আজীবন সে ছোট হইয়াই আসিতেছে—আজ চড়া গলায় তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবার সাহস তাহার আসিবে কোথা হইতে?

সেরকম সূত্রে বলিল—না না রাগ করচো কেন পশ্ম দিদি—আমি এমনিই বলচি, বাসন নিতে যখন তুমি দ্যাখোনি—তখন আমি গরীব বামুন, তোমাদের দোরে দুলটো করে খাই—কেন আর আমাকে—

এইবার বেচু চক্ৰান্তি কথা বলিলেন।

একটু নরম সূত্রে বলিলেন—থাক্, থাক্, কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই। আমার বাসন তাতে ফিরবে না। দুজনেই থামো। তারপর তুমি বলচ কি এখন হাজারি?

—বলচি, কর্তৃ। আমার যেমন পারে রেখেছিলেন, তেমনি পারে রাখুন। নইলে না খেয়ে মারা যাবো। বাবু, চোর আমি নই, চোর যদি হতাম, আপনার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম না আর।

পশ্ম ঝি বলিল—চোর কিনা সে কথায় দরকার নেই—কিন্তু তোমার এখানে জায়গা আর হবে না। তা হোলে খন্দের চলে যাবে।

বেচু বলিলেন—তা ঠিক।—খন্দের চলে গেলে হোটেল চালাবো কি করে আমি? হাজারি এ যুক্তির অর্থ বুঝিতে পারিল না। হোটেলের ঠাকুর চোর হইলে সে না হয় হোটেলের জিনিস চুরি করিতে পারে, কিন্তু খরন্দারদের গায়ের শাল খুলিয়া বা তাহাদের পকেট মারিয়া লইতেছে না তো—তবে খরন্দারের আসিতে আপত্তি কি?

কিন্তু হাজারি এ প্রশ্ন উঠাইতে পারিল না। তাহার জবাব হইয়া গেল। সে কিছু খাইয়াছে কি না এ কথাও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

অবশেষে সে বলিল—তা হোলে আমার মাইনেটা দিলে দিন বাবু, দুমাসের তো বাকী পড়ে রয়েছে, হাওলাত নেই কিছু। খাতা দেখুন।

বেচু চক্ৰান্তি বলিলেন—সে এখন হবে না, এর পরে এসো।

পশ্ম একটু বেশী স্পষ্ট কথা বলিল। সে বলিল—ওর আশা ছেড়ে দাও, মাইনে পাবে না।

—কেন পাব না?

পশ্ম ঝির সঙ্গে বলিল—সে তক্কো তোমার সঙ্গে করবার সময় নেই এখন। পাবে না মিটে গেল। নালিশ করো গিয়ে—আদালত তো খোলা রয়েছে।

হাজারি চক্ষে অন্ধকার দেখিল।

বেচু চক্রান্তির দিকে চাহিয়া বিনীত সুরে বলিল—কর্ত্তামশায়, আজ আপনার দোরে ছ'বছর খাটচি। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই—বাড়ীতে দুমাস খরচ পাঠাতে পারিনি, বাড়ী যাবার রেলভাড়া পর্যন্ত আমার হাতে নেই—আমায় কিছ্ না দিলে না খেয়ে মরতে হবে।

বেচু চক্রান্তি বিরুদ্ধি না করিয়া কাশবাক্স খুলিয়া একটি অধূলি ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—ওই নিয়ে যাও। এখানে ঘ্যান্ ঘ্যান্ কোরো না—খন্দের আসতে আরম্ভ করচে, বাইরে যাও গিয়ে—

হাজারি অধূলিটা কুড়াইয়া লইয়া চাদরের খুঁটে বাঁধিল। তারপর হাত জোড় করিয়া মাজা হইতে শরীরটা খানিকটা নোয়াইয়া বেচু চক্রান্তিকে প্রণাম করিয়া আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কাঁচুর্মাচু হইয়া বলিল, তাহলে বাবু, মাইনের জন্যে কবে আসবো? —এসো—এসো—এর পরে যখন হয়। সে এখন দেখা যাবে—

ইহা যে অত্যন্ত ছেঁদো কথা হাজারির তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বরং পশ্ম কি বাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক। মাহিনা ইহারা তাহাকে দিবে না। তাহার মাথায় আসিল একবার শেষ চেষ্টা করিবে। মরীয়ার শেষ চেষ্টা। বেচু চক্রান্তির নিকট হইতে বিদায় লইয়া সে পিছন দিয়া হোটেলের রাস্তাঘরে আসিল। সেখানে পশ্ম কি একটু পরে, আসিতেই সে হাত জোড় করিয়া বলিল—পশ্মাদদি, গরীব বান্দু—চাকরি করচি এত-কাল, একখানা রেকাবী কোন দিন ছুরি করিনি। আমি বড় গরীব। তুমি একটু বলে কর্ত্তামশাইকে আমার মাইনের ব্যবস্থা করে দেও—নইলে বাড়ীতে ছেলেপুলে না খেয়ে মরবে। এই অধূলিটা সম্বল, দোহাই বলাছি রাখাবল্লভের—এতে আমি কি খাবো, আর রেলভাড়া কি দেবো, বাড়ীর জনেই বা কি নিয়ে যাবো।

—আমি হোটেলের মালিক নই যে তোমায় টাকা দেবো। কর্ত্তামশায় যা বলেচেন তার ওপর আমার কি কথা আছে?

—দয়া করে পশ্মাদদি তুমি একবার বলে ওকে। না খেয়ে মারা যাবে ছেলেপিলে।

—কেন ভোমার পেয়ারের কুসুমের কাছে যাও না, পশ্মাদদিকে কি দরকার এর বেলা?

হাজারির ইচ্ছা হইল আর একদণ্ডও সে এখানে দাঁড়াইবে না। সে চায় না যে এই সব জায়গায় ঘর-তার মধ্যে কুসুমের নাম উচ্চারিত হয়, বিশেষতঃ পশ্ম কিয়ের মধ্যে। সে চুপ করিয়া রহিল। পশ্ম রাস্তাঘর হইতে চলিয়া গেল।

একটুখানি দাঁড়াইয়া সে চলিয়াই যাইতেছিল, পশ্ম কি আসিয়া বলিল—যাচ্ছ যে? খাওয়া হয়েছে তোমার?

হাজারি অবাক হইয়া পশ্ম কিয়ের দিকে চাহিল। কখনো সে এমন কথা তাহার মধ্যে শোনে নাই। আমতা আমতা করিয়া বলিল—না—খাওয়া—ইয়ে—না হয় নি খরো।

—তা হোলে বোসো। এখনও গাছটাও নামে নি। গাছ নামলে ভাত খেয়ে তবে যাও। দাঁড়িয়ে কেন? বসো পিপিড়ি একখানা পেতে।

হাজারি কলের পুতুলের মত বাসিল। পশ্মাদদি তাহাকে অবাক করিয়া দিয়াছে! পশ্মাদদির দরদ!.....সাত বছরের মধ্যে একদিনও যা দেখে নাই!.....অশ্চর্য কাণ্ডই বটে!

মাছ নামিলে নতুন ঠাকুর হাজারিকে ভাত বাড়িয়া দিল! পশ্ম কিকে আর এদিকে দেখা গেল না—সে এখন খরিন্দারদের খাওয়ার ঘরে বস্তু আছে। নতুন ঠাকুর যদিও হাজারিকে চেনে না তবুও ইহাদের কথাবাত্তা শুনিয়া সে বুঝিয়াছিল, হাজারি হোটেলের পুরানো ঠাকুর—চাকরিতে জবাব হইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে হাজারিকে খুব যত্ন করিয়া

বাওয়াইল।

মাইবার সময় হাজারি পশ্মকে ডাকিয়া বলিল—পশ্মাদিদ, চললাম তবে। কিছু মনে কোরো না।

পশ্ম ঝি দোরের কাছে আসিয়া বলিল—হ্যাঁ দাঁড়াও ঠাকুর। এই দুটো টাকা রদখো, কর্ত্তামশায় দিলেচেন মাইনের দরুন। এই শেষ কিন্তু—আর কিছু পাবে না বলে দিলেন তিনি।

হাজারি টাকা দুইটি লইয়া আগের আধুলিটির সঙ্গে চাদরের খুঁটে রাখিল কিন্তু সে অবাক হইয়া গিয়াছে—সত্যি অবাক হইয়া গিয়াছে।

—আজ্ঞা, তবে আসি।

—এসো। খাওয়া হয়েছে তো? আজ্ঞা।

রাত সাড়ে নটার কম নয়।

এত রাত্রে সে কোথায় যায়।

চাকুরি গেল। তবুও হাতে আড়াইটা টাকা আছে।

বাড়ী মাইয়া কি হইবে? চাকুরি খুঁজিতে হইবেই তাহাকে। বাড়ী গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। চাকুরি চলিয়া মাইবে—একথা হাজারি ভাবে নাই। সত্য সত্যই চাকুরি গেল শেষকালে!

সে জানে রাণাঘাটে কোনো হোটেলে তাহার চাকুরি আর হইবে না। বদু বাড়ুঘো একবার তাহাকে হোটেলে লইতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এখন সে চুরির অপবাদে হাজত বাস করিয়া আসিয়াছে, কেহই তাহাকে চাকুরি দিবে না।

হাজারি দেখিল সে নিজের অজ্ঞাতসারে চূর্ণী নদীর ধারে চলিয়াছে—তাহার সেই প্রিয় গাছতলাটিতে গিয়া বসিবে—বসিয়া ভাবিবে। ভাবিবার অনেক কিছু আছে।

কিন্তু প্রায় দুই ঘণ্টা নদীর ধারে বসিয়া থাকিয়াও ভাবনার কোনো মীমাংসা হইল না। আজ রাত্রে অবশ্য স্টেশনের প্র্যাটফর্ম শ্রুইয়া থাকিবে—কিন্তু কাল যায় কোথায়?

আড়াই টাকার মধ্যে দুইটি টাকা বাড়ী পাঠাইতে হইবে। টেপ—টেপির মধ্যে হয়তো তাহার মা দুটি ভাত দিতে পারিতেছে না।

এ চিন্তা তাহার পক্ষে অসহ্য।

না—কালই টাকা দুটি পাঠাইবে ডাকে। মনি অর্ডার কি দিবে আধুলিটা হইতে। পুরো দুটো টাকা বাড়ী যাওয়া চাই।

স্টেশনের প্র্যাটফর্ম শেষ রাত্রে দিকে সামান্য ঘুম হইল। ফরিদপুর লোকলের শব্দে খুব ভোরে ঘুম গেল ডাঙিয়া। তবুও সে শ্রুইয়া রহিল। আজ তাড়াতাড়ি বড় উনুনে ডেকা চাপাইতে হইবে না—উঠিয়া কি হইবে?

অনেকক্ষণ পরিশ্রম সে শ্রুইয়া রহিল। ডাউন দার্জিলিং মেল আসিল, চলিয়া গেল। বনগাঁ লাইনের ট্রেন ছাড়িল। রোদ উঠিয়াছে, প্র্যাটফর্ম বাট দিতে আসিয়াছে বাড়ুদার। আর একথানা গাড়ীর ডাউন দিলছে আড়ংঘাটের দিকে। মর্শিদাবাদ-লালগোলা প্যাসেঞ্জার।

—এই কোন নিদ্রা বাতা রে এই উঠো—হঠাৎ যাও—বাড়ুদার হাঁকিল। হাজারি উঠিয়া হাই তুলিয়া কলে গিয়া হাত-মুখ ধুইল।

সে কোথায় যায়—কি করে? গত হুসাত বছরের মধ্যে এমন নিষ্করজীবন সে কখনো যাপন করে নাই—কাজ, কাজ, উনুনে ডেকা চাপাও কর্ত্তামশায়ের চায়ের জল গরম কর আগে, বাজারে আজ কার পালা? হৈ চৈ—ঝাড়া বকুনি—পশ্ম ঝিয়ের চেঁচামেচি...

বেশ ছিল। পশ্চিম ঝিয়ের বকুনিও যেন এখন সুশ্রুতি বলিয়া মনে হইতেছে। পশ্চিম খ্যাপ লোক নয়—কাল রাতে খাইতে বলিয়াছিল, টাকা দিয়াছে। রতন ঠাকুরও বড় ভাল লোক। বংশীর সেই ভাগিনেরটিও বড় ভাল। সবাই ভাল লোক। বংশীর সেই ভাগিনের তাহার টেপির উপযুক্ত বর। দুজনে সুন্দর মানাইত। ছেলোটিকে বড় পছন্দ হইয়াছিল। আকাশকুসুম। মিথ্যা আশা, টেপিকে খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলে তবে তার বিয়ে।

গত হ'বছরে হাজারির একটা বড় কুঅভ্যাস হইয়া গিয়াছে—সকাল বিকেল চা খাওয়া। এখন চা খাইতে হইবে পরসে খরচ করিয়া—সেজন্য হাজারি চা খাওয়ার ইচ্ছাকে দমন করিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করা একান্ত আবশ্যিক। আজ সাত আট দিন কুসুমের সঙ্গে তার দেখা হয় নাই। চুরির জন্য হাজতে যাওয়ার সংবাদ বোধ হয় কুসুম শোনে নাই—কে তাহাকে সে খবর দিয়াছে? চা ওখানেই খাওয়া চলিতে পারে। কুসুমের সঙ্গে একটা পরামর্শও করা দরকার। তাহার নিজের মাথায় কিছুই আসিতেছে না।

কুসুম কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলিয়া হাজারিকে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—আপনি জ্যাঠামশায়! এমন অসময় যে! এতদিন আসেন নি কেন?

—চলো, ভেতরে বসি। অনেক কথা আছে।

কুসুম ঘরের মেরুতে শতরঞ্জি পাতিয়া দিল। হাজারি বসিয়া বলিল—মা কুসুম, একটু চা খাওয়াবে।

—এখনি করে দিচ্ছি জ্যাঠামশায় একটু বসুন আপনি।

চা শব্দ নয়—চায়ের সঙ্গে আসিল একখানা রেকাবিতে খানিকটা হালদুয়া। হাজারি চা খাইতে খাইতে বলিল—কুসুম মা, আমার চাকরি গিয়েছে।

কুসুম বিস্ময়ের সুরে বলিল—কেন?

—চুরি করেছিলাম বলে।

—চুরি করেছিলেন!

—ওরা তাই বলে। পাঁচ-ছাঁদন হাজতে ছিলাম।

—হাজতে ছিলেন! হ্যাঁ! মিথো কথা।

কুসুম দাঁড়াইয়া ছিল—হাজারির সামনে মাটির উপর ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িয়া কোতুহল ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাইয়া রহিল।

—না কুসুম, মিথো নয়, সত্যিই হাজতে ছিলাম চুরির আসামী হিসেবে।

—হাজতে থাকতে পারেন জ্যাঠামশায়—কিন্তু চুরি আপনি করেন নি—করতে পারেন না। সেইটেই মিথো কথা, তাই বলছি।

—আমি চুরি করতে পারি নে?

—কঙ্কনো না জ্যাঠামশায়। আপনাকে আমি জানি নে? চিনি নে?

—তোমার মা এত বিশ্বাস আছে আমার ওপর!

কুসুম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে কালো চাপিবার চেষ্টা করিতেছে।

হাজারি বাঁচিল। কুসুম সত্যিই তার মেয়ে বটে। তাহার বড় ভয় ছিল কুসুম জিনিসটা কি ভাবে লইবে। যদি বিশ্বাস করিয়া বসে যে সত্যিই সে চোর! জগতে তাহা হইলে হাজারির একটা অবলম্বন চলিয়া গেল।

—আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন জ্যাঠামশায়?

—কাল রাতে স্টেশনে শূয়ে ছিলাম—বাবো আর কোথায়? সেখান থেকে উঠে আসিচি। ভাবলাম তোমার সঙ্গে একবার দেখা করাটা দরকার না, হয়তো আবার কতদিন—

—কেন, আপনি যাবেন কোথায়?

—একটা কিছু হিল্লো লাগাতে তো হবে—বসে থাকলে চলবে না বুদ্ধতেই পারো। দেখি কি করা যায়।

—এখানে আর কোনো হোটেল—

—চুরির অপবাদ রটেচে যখন, তখন এখানকার কোনো হোটেল নেবে না। দেখি, একবার ভাবিচি গোয়াড়ি যাই না হয়—সেখানে অনেক হোটেল আছে, খুঁজে দেখি সেখানে।

কুসুম খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আচ্ছ, সে যা হয় হবে এখন। আপাতক্ আপনি নেরে আসুন, তেল এনে দিই। তারপর রান্নার যোগাড় করে দিচ্ছি, এখানে দুটি ভাতভাত চড়িয়ে খান।

—না মা, ওসব হাস্যম্যে আর দরকার নেই—থাক, খাওয়ার জন্যে কি হয়েছে—আমি তোমার সঙ্গে দুটো কথা কই বসে। ভাবলাম কুসুমের সঙ্গে একবার পরামর্শ করি গিয়ে, তাই এলাম। একটা বুদ্ধি দাও তো মা খুঁজে—একর বুদ্ধিতে কুলোয় না—তারপর বড়োও হয়ে পড়িচি তো!

কুসুম হাসিয়া বলিল—পরামর্শ হবে এখন। না যদি খান, তবে আমিও আজ সারা-দিন দাঁতে কুটো কাটবো না বলে দিচ্ছি কিন্তু জ্যাঠামশায়। ওসব শুনবো না—আগে নেরে আসুন—তারপর ভাত চাপান, আমিও আপনার প্রসাদ দুটি পাই। মেয়ের বাড়ী এসে-চেন, যতই গরীব হই, আপনাকে না খাইয়ে ছেড়ে দেবো ভেবেচেন বুদ্ধি—ভারি টান তো মেয়ের ওপর?

অগত্যা হাজারি চুপ করিয়া ঘাটে স্নান করিতে গেল। ফিরিয়া দেখিল গোয়ালঘরের এক কোণ ইতিমধ্যে কুসুম কখন লোপিয়া পড়িয়া পরিস্কার করিয়া ইট দিয়া উনুন পাতিয়া ফেলিয়াছে।

একটা পেতলের মাজা বোগনো দেখাইয়া বলিল,—এতেই হবে জ্যাঠামশায়, না নতুন হাঁড়ি কাড়বেন?

না নতুন হাঁড়ির দরকার নেই। ওতেই বেশ হবে এখন।

ভাত নামিবার কিছু পূর্বে একটি ছেলে গোয়ালঘরের দোরে আসিয়া উর্কি মারিয়া ইঙ্গিতে কুসুমকে বাহিরে ডাকিল। হাজারি দেখিল, তাহার হাতে একখানা গমছায় বাঁধা হাটবাজার—অন্য হাতে একটা বড় ইলিশ মাছ ঝোলানো।

—একটুখানি দাঁড়ান জ্যাঠামশায়, মাছ কুটে আনি।

হাজারি অত্যন্ত লজ্জিত ও বিপন্ন হইয়া উঠিল কুসুমের কাণ্ড দেখিয়া। পাশের বাড়ীর ছেলোটিকে ডাকিয়া কুসুম কখন বাজার করিতে দিয়াছে—থাক দিয়াছে দিয়াছে—কুসুম গরীব মানুষ, এত বড় মাছ কিনিতে দেওয়ার কারণ কি ছিল? না, বড় ছেলেমানুষ এখনও। এদের জ্ঞানকাণ্ড আর হবে কবে?

কুসুম হাজারির তিরস্কারের কোনো জবাব দিল না। মদ, মদ হাসিয়া বলিল—আপনার রান্না ইলিশ মাছ একদিন খেতে যদি সাধ হয়ে থাকে তবে মেয়েকে অমন করে বকতে নেই জ্যাঠামশায়!

হাজারি অপ্রসন্নমুখে বলিল—না, যতো সব ছেলেমানুষের ব্যাপার!

আহারাদির পর হাজারির বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া কুসুম খাইতে গেল। গত রাতে ভাল ঘুম হয় নাই—ইতিমধ্যে হাজারি কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, যখন ঘুম ভাঙিল তখন প্রায় বিকাল হইয়া গিয়াছে।

কুসুম ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল—কাল ঘুম হয় নি মোটেই ইন্টিশানের বোধিতে শূয়ে—তা বন্ধতে পেরেচি। ঘুমিয়েছেন ভাল তো? চা করে আনি। উঠে মধু ধুয়ে নিন।

চায়ের সঙ্গে কোথা হইতে কুসুম গরম জিলিপি আনাইয়া দিল। বলিলেও শোনে না, বলিল—এই তো ওই মোড়ে হরান ময়রার দোকানে এ সময় বেশ গরম জিলিপি ভাজে, চায়ের সঙ্গে বেশ লাগবে—শুধু চা খাবেন?

ইহার উপর আর কত অত্যাচার করা চলিতে পারে। আজই এখান হইতে সরিয়া না পড়িলে উপায় নাই। হাজার ঠিক করিল চা খাইয়া আর একটু বেলা গেলেই এখান হইতে রওনা হইবে।

কুসুম পান সাজিয়া আনিয়া হাজারির সামনে মেঝেতে বসিল।—তারপর এখন কি করবেন ভেবেচেন?

—ওই তো বল্লম গোয়াড়ি গিয়ে চাকুরির চেষ্টা করি।

—যদি সেখানে না পান?

—তবে কলকাতা যাবো। তবে পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কলকাতায় বাতায়াত অভ্যাস নেই—অত বড় শহরে থাকাও অভ্যাস নেই—ভয় করে।

—আমার একটা কথা শুনবেন জ্যাঠামশায়?

—কি?

—শোনেন তো বলি।

—বল না মা কি বলবে?

—আমার সেই গহনা বাঁধা দিয়ে কি বিক্রি করে আপনাকে দুশো টাকা এসে দিই। আপনি তাই নিয়ে হোটেল খুলুন। আপনার রায়ার সুখ্যাতি দেশ জুড়ে। হোটেল খুললে দেখবেন কেমন পসার জমে—এই রাণাঘাটেই খুলুন, ওই চক্কির হোটেলের পাশেই খুলুন। পশ্চিম চোখ টাটিয়ে মরুক। মেয়ের পরামর্শ শুনুন জ্যাঠামশায়—আপনার উন্নতি হবে—কোথায় যাবেন এ বয়সে চাকুরি করতে!

হাজারির চোখে প্রায় জল আসিল! কি চমৎকার এই অশ্রুত মেয়ে কুসুম। মেয়েই বটে তাহার। কিন্তু তাহা হইবার নয়—নানা কারণে। কুসুমের টাকায় হোটেল খুলিলে পাঁচজন পাঁচরকম বদনাম রটাইবে উভয়ের নামে। তাহার উপকার করিয়া নিরপরাধিনী কুসুম কলঙ্ক কুড়াইতে গেল কেন? ওই পশ্চিম কি-ই সাতরকম রটাইয়া বেড়াইবে গাঠ-দাহের জ্বালায়।

তা ছাড়া যদি লোকসানই হয়, ধরো—(যদিও হাজারির দৃঢ় বিশ্বাস সে হোটেল খুলিলে লোকসান হইবে না) তাহা হইলে কুসুমের টাকাগর্ভে মারা পড়িবে। না, তার দরকার নাই।

—মা কুসুম, একবার তো তোমাকে বলেছিলাম তোমার ও টাকা নেওয়া হবে না। আবার কেন সে কথা?...আমাকে এই গাড়ীতে গোয়াড়ি যেতে হবে। উঠি।

কুসুম গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আচ্ছা কথা দিয়ে যান যদি গোয়াড়িতে চাকুরি না জোটেতে পারেন তবে আবার আমার কাছে ফিরে আসবেন?

—তোমার কাছে মা? কেন বলো তো?

—এসে ওই টাকা নিতে হবে। হোটেল খুলতে হবে। ও টাকা আপনার হোটেলের জন্যে তোলা আছে। শুধু আপনার ভালের জন্যেই বলিচি তা ভাববেন না জ্যাঠামশায়। আমার স্বার্থ আছে। আমার টাকাগুলো আপনার হাতে খাটলে তা থেকে দু'পয়সা আমিও পাবো তো। গরীব মেয়ের একটা উপকার করলেনই বা?

হাজারি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা কথা দিয়ে গেলোম। তবে আসি মা আজ। এসো, কল্যাণ হোক।

—মনে রাখবেন স্নেহের কথা।

—তুমিও মনে রেখো তোমার বৃদ্ধো জ্যাঠামশায়ের কথা—

—ইস্! আমার জ্যাঠামশায় বৃদ্ধো বৈকি?

—না, ছ'চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে—বৃদ্ধো নয় তো কি?

—দেখার না তো বৃদ্ধোর মত। বয়স হলেই হোলো? আসবেন আবার কিন্তু তা হোলো।

—আচ্ছা মা।

হাজারি পট্টলি লইয়া বাটির বাহির হইল। কুসুম তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া আগাইয়া দিয়া গেল।

রানাসাট হইতে বাহুর হইয়া হাজারি হাঁটপথে চাকদার দিকে রওনা হইল। প্রথমে ডাকঘর হইতে বাড়ীতে দু'টি টাকা মনিঅর্ডার পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল—কিন্তু ডাকঘরে গিয়া দেখিল মনিঅর্ডার নেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

ডাকঘর খোলা না থাকার জন্য পরে হাজারি ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছিল। চাকদা ঘাইবার মাঝপথে সেগুন-বাগানের মধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিল। একটা সেগুন গাছের তলায় দু'খানি গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। লোকজন নামিয়া গাছতলায় রান্না চড়াইয়াছে। হাজারি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, সম্মুখের পূর্ণিমায়া কালীগঞ্জে গঙ্গামান্নের মেলা উপলক্ষে উহার মেলায় দোকান করিতে যাইতেছে। হাজারি তাহাদের সঙ্গে লইল।

রাতে আহাঙ্গারদের পরে সবাই গাছতলায় শইয়া রাশি কাটাইল—দোকানের মালিকের নাম প্রিয়নাথ ধর, জাতিতে সুবর্ণ বণিক, মনোহারি দোকান লইয়া ইহারা মেলায় যাইতেছে। হাজারির পরিচয় পাইয়া ধর মহাশয় প্রস্তাব করিল—মেলায় কয়দিন তাহারা কেনাবেচা লইয়া ব্যস্ত থাকিবে, এই কয়দিন হাজারি যদি রান্না করিয়া সকলকে খাওয়ায়—তবে সে দৈনিক খোরাক ও মেলা অন্তে কয়দিনের মজুরি স্বরূপ দুই টাকা পাইবে।

প্রিয়নাথ ধরের দোকান তিনখানি—একখানি তার নিজের, অপর দুইখানি তাহার জামাই ও ভ্রাতুষ্পুত্রের। কম মাহিনায় যে ওস্তাদ রাঁধুনী পাইয়াছে, হাজারির প্রথম দিনের রন্ধনেই তাহা সপ্রমাণ হইয়া গেল। সকলেই খুব খুশি।

মেলায় পৌঁছিয়া কিন্তু হাজারি দেখিল, রান্নার চেয়েও অধিকতর লাভের একটা ব্যবসা এই মেলাতেই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সে জিনিসপত্র কিনিয়া আনিয়া তেলে-ভাজা কচুরি সিঙ্গাড়ার দোকান খুলিয়া বসিল ধর মহাশয়দের বাসার একপাশে। বিনামূল্যে কচুরি খাইবার লোভে ধর মহাশয় কোন আপত্তি করিলেন না।

কয়দিন দোকানে অসম্ভব রকমের বিক্রী হইল। মূলধন ছিল আগের সেই দুই টাকা—শেষে খরিস্কারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে হাজারি ধর মহাশয়ের তহবিল হইতে কয়েকটি টাকা ধার লইল।

চতুর্থ দিনের সন্ধ্যাবেলা দোকানপাট উঠানো হইল। মেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। ধর মহাশয়ের তহবিলের দেনা শোধ করিয়া ও সকল প্রকার খরচ বাদ দিয়া হাজারি দেখিল সাড়ে তেরো টাকা লাভ দাঁড়াইয়াছে। ইহার উপর ধর মহাশয়দের রান্নার মজুরি দুই টাকা লইয়া মোট হইল সাড়ে পনেরো টাকা।

প্রিয়নাথ ধর বলিলেন—ঠাকুর মশায়, আপনার রান্না যে এত চমৎকার, তা যখন আপনাকে সেগুন বাগানে প্রথম কাজে লাগালুম, তখন ডাবি নি। আমি বড়লোক নই,

বাড়ীতে মেয়েবাই রাঁধে, না হোলে আপনাকে আমি ছাড়তুম না কিছতেই।

বাড়ীতে দশটি টাকা পাঠাইয়া দিয়া হাজারির মন খানিকটা সুস্থ হইল। এখন সংসারের ভাবনা সম্বন্ধে মাসখানেকের মত নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সে। এই এক মাসের মধ্যে নতুন কিছু অবশ্যই জুটিয়া যাইবে।

কালীগঞ্জ হইতে যশোর বাইবার পাকা রাস্তা বাহিয়া হাজারি আবার পথ চলিল। এই পথের দুধারে বনজঙ্গল বড় বেশী—পূর্বে গ্রাম ছিল, ম্যালেরিয়ার অত্যাচারে বহু গ্রাম জনশূন্য হইয়া যাওয়াতে অন্যবাদী মাঠ ও বিধবস্ত পুরাতন গ্রামগুলি বনে-জঙ্গলে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলা কালীগঞ্জ হইতে রওনা হইয়াছে, যখন দুপুর উত্তীর্ণ হয়-হয়, তখন একটা প্রাচীন তেঁতুলগাছের ছায়ায় সে আশ্রয় লইল। অল্প দূরে একখানা ক্ষুদ্র চাষীদের গ্রাম। একটি ছোট ছেলে গরু তড়াইয়া লইয়া বাইতেছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল গ্রামখানার নাম নতুন পাড়া। বেশীর ভাগ গোয়ালাদের বাস।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমেই যে খড়ের বড় আটচালা ঘরখানা দেখিল তাহার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ীর মালিক কাহাকেও দেখিল না। একদিকে বড় গোয়াল, অনেকগুলি বলদ গরু বিচালির জাব খাইতেছে।

একটি ছোট মেয়ে বাহির হইয়া উঠানে দাঁড়াইল। হাজারি তাহাকে ডাকিয়া বলিল—খুকী শোনো—বাড়ীতে কে আছে? মেয়েটি ভয় পাইয়া কোনো উত্তর না দিয়াই বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করিবার পরে বাড়ীর মালিক আসিল। তাহার নাম শ্রীচরণ ঘোষ। হাজারিকে সে খুব খাতির করিয়া বসাইল, দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে—সুতরাং রান্না-খাওয়া করিতে বলিল। বাড়ীর ভিতর হইতে একখানা জলঢৌকি ও এক বালতি জল আনিয়া সামনে রাখিয়া দিল।

ইহারাও গোয়ালঘরের একপাশে রান্নার যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। সেখানে বসিয়া রাখিতে রাখিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল কুসুমের কথা। কুসুমও তাহাকে সেদিন গোয়ালঘরেই রাখিবার আয়োজন করিয়া দিয়াছিল—কুসুমও গোয়ালার মেয়ে।

বোধ হয় সেই জনাই—ইহারা গোয়াল শুনিয়াই—হাজারি ইহাদের বাড়ী আসিয়াছিল—মনের মধ্যে কোন গোপন আকর্ষণ তাহাকে এখানে টানিয়া আনিয়াছিল। হঠাৎ সে আশ্চর্য হইয়া গোয়ালঘরের দরজার দিকে চাহিল।

একটি অপবয়সী বৌ অগেঘোমটা দিয়া গোয়ালঘরে ঢুকিয়া একচুবুড়ি শাক লইয়া লাজুক ভাবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে। শাকগুলি সদ্য জল হইতে ধুইয়া আনা—চুবুড়ি দিয়া জল ঝরিয়া গোয়ালঘরের মাটির মেঝে ভিজাইয়া দিতেছে। হাজারি বাস্তব হইয়া বলিল—এস মা এস—কি ওতে?

বউটি লাজুক মুখে একটু হাসিয়া বলিল—চাঁপানটে শাক। এখানে রাখি?

বউটি কুসুমের অপেক্ষাও বয়সে ছোট। হঠাৎ একটা অকারণ স্নেহে হাজারির মন ভারিরা উঠিল। সে বলিল—রাখো না রাখো—

খানিকটা পরে বউটি আবার ঘরের মধ্যে গোটােকতক কাঁঠাল-বাঁচ লইয়া ঢুকিল। এবার সে যেন অনেকটা নিঃশঙ্কচিত, পিতার বয়সী এই শান্ত প্রৌঢ় ব্রাহ্মণের নিকট সঙ্কোচ করিতে তাহার বাগিতেছিল ইচ্ছা।

হাজারিকে বলিল—কাঁঠাল-বাঁচ খান?

—খাই মা, কিন্তু ওগুলো কুটে দেবে? আমি ডাল চাড়িয়েচি, আবার কুটি কখন?

কউটি একটা পাথরের বাটিতে কঁঠাল-বাঁচ আনিয়াছিল। বাটিটা নামাইয়া ছুটিয়া গিয়া একখানা বাঁচ লইয়া আসিল এবং বাঁচগুলি কুটিতে আরম্ভ করিল। হাজারির মন তৃপ্ত ছিল, ইহারা সবাই মেয়ের মত, সবাই ভালবাসে, সেবা করে, মনের দুঃখ বেঝে।

হাজারি কোন কথা বলিবার আগেই কউটি বলিল—আপনার গায়ে আমি কত গিঁচিচি।

হাজারি অবাক হইয়া বলিল—আমার গাঁ কোথায় তুমি কি করে জানলে? তুমি সেখানে কি করে গেলে?

—গঙ্গাধর ঘোষ আমার পিসেমশাই—

—ওহো—তুমি জীবনের ভাইঝি! তা হলে কুসুমকে তো চেনে—

—কুসুমদিদিকে তার বিয়ের আগে অনেকবার দেখিঁচি, বিয়ের পরে আর কখনও দেখি নি। সে আজকাল কোথায় থাকে জানেন নাকি?

—সে থাকে রাণাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। তবে তোমাকে মা বলে খুব ভাল করেচি, কুসুম আমার মেয়ে!

কউটি বাঁচ কোটা বন্ধ রাখিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া দূর হইতেই প্রণাম করিল।

—এসো মা চিরজীবী হও, সার্বভৌম হও।

কউটি হাসিয়া বলিল—আপনি যখন উঠানে দাঁড়িয়ে, তখনই আপনাকে দেখে আমি চিনেচি। আমি শশুড়ীকে গিয়ে বললাম আমার পিসিমার গায়ের মানদু উনি—তখন শশুড়ী গিয়ে শ্বশুরকে জানালেন।

—বেশ মা বেশ। আসবো যাবো, আমার আর একটি মেয়ে হোল, তার সঙ্গে দেখা-শুনা করে যাবো। ভালই হোল।

কউটি সলজভাবে বলিল—আজ কিন্তু আপনাকে যেতে দেবো না—থাকতে হবে এখন এখানে—

—না মা, আমার থাকা হবে না।

—না তা হবে না। যান দিকি কেমন করে যাবেন? আমি জোর করতে পারিনে বুদ্ধি?

—অবিশ্যি পারো মা, কিন্তু আমার মনের শান্তি নেই, আবার সন্দিগ্ধ পৈলে এসে দু'দিন থেকে যাবো—

কউটি হাজারির মনের দিকে চাহিয়া বলিল—কেন, কি হয়েছে আপনার?

হাজারির স্বভাবদুর্বল মন, সহনশীলতার গম্ভ পাইয়া গলিয়া গেল! সে তাহার চাকুরি যাওয়ার আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া গেল—ডাল নামাইয়া চচ্চড়ি রাঁধিবার ফাঁকে ফাঁকে। একটু গম্ভ করিবার লোভও সম্বরণ করিতে পারিল না।

—রান্না যা করতে পারি মা, তোমার কাছে গোমর করে বলিঁচি নে, অল্প রান্না রাণা-ঘাটের কোনো হোটেলে কোনো বামনঠাকুর রাঁধতে পারবে না। হয় না হয় মা এই তোমাদের এখানে এই যে চচ্চড়ি রাঁধিঁচি, তোমাদের সকলকে খাইয়ে দেখায়ে; আমি জোর করে বলতে পারি এরকম চচ্চড়ি কখনও খাও নি, আর কখনও খাবে না।

কউটি বিস্ময়ে, সম্মানে, দুঃখ দৃষ্টিতে হাজারির দিকে চাহিয়া কথা শুনিতোছিল। বলিল—তা হোলে আমার শিখিয়ে দিতে হবে খড়োমশাই—

—একদিনের কর্ম নয় সে। শেখালেও শিখতে পারা কঠিন হবে—তোমার ফাঁক দেওয়া আমার ইচ্ছে নয় মা। এ শেখা এক আধ দিনে হয় কখনো?

—তা আপনি যদি অমল রাঁধেন, আপনার আবার চাকুরির ভাবনা কি? কত বড়লোকের বাড়ী ভাল মাইনে দিয়ে রাখবে—

—অদৃষ্ট যখন খারাপ হয় মা, কিছুতেই হয় না। হাতে টাকা থাকে দু'দিন চেষ্টা-

চরিত্র করে বেড়াতে পারি। বেড়াবো কি, রেস্ট ফুরিয়ে এসেচে কি না!

—ক'টাকা লাগবে বলুন।

—কেন, তুমি দেবে নাকি?

—যদি দিই?

—সে আমি নিতে পারি নে। কুসুম দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তা আমি নেবো কেন? তোমরা মেয়েমানুষ, ব্যাঙের আধুন পর্জি করে রেখেচ, তা থেকে নিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে চাই নে।

—আচ্ছা, আপনাকে যদি টাকা ধার দিই? আপনাকে বলি শুনুন খুড়োমশায়। আমার মার কাছে থেকে কিছু টাকা এনেছিলাম। এখানে রাখবার জো নেই। একটা কথা বলবো?

এদিক ওদিক চাহিয়া নীচু করিয়া বলিল—নন্দ আর জা ভাল লোক নয়। এখনি যদি টের পায় নিয়ে নেবে! আমি আপনাকে টাকা ধার দিচ্ছি, আপনি সুদ দেবেন কত করে বলুন?

এই কুসুম-লোভী সরলা মেয়েটির প্রতি হাজারির প্রোট মন করুণায় ও মমতায় গলিয়া গেল। সে আরও খানিক মজা দৌঁধতে চাইল।

—এমনি টাকা দেবে মা? আমার বিশ্বাস কি?

—তা বিশ্বাস না করলে কি এ কারবার চলে? আর আপনি তো চেনা লোক। আপনার গাঁ চিনি, বাড়ী চিনি।

—চিনলেই হোল? একটা লেখাপড়া করে নেবে না? কত টাকা দিতে চাও?

—আমার কাছে আছে আশি টাকা। সবই দিতে পারি আপনি যদি নেন। সুদ কত দেবেন?

—কত করে চাও?

—আপনি যা দেবেন। টাকায় দু'পয়সা করে রেট, আপনি এক পয়সা দেবেন, কেমন তো? আপনার পায়ে পড়ি খুড়োমশায়, টাকাগুলো আলাদা আমার তোরগতে তোলা আছে। কেউ জানে না। আপনাকে এনে দিই, টাকাগুলো খাটিয়ে দিন আমায়। কাকে বিশ্বাস করে দেবো কে নিয়ে আরা দেবে না।

—কই, লেখাপড়ার কথা বলো না তো?

—আমি লেখাপড়া জানি নে—কি লেখাপড়া করে নেবো। আপনি চান একটা কিছু লিখে দিয়ে যান। কিন্তু তাতে লোক-জানাজানি হবে। সে কাজের দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান। আমি দাঁচি মিটে গেল। এর আর লেখাপড়া কি?

ইতিমধ্যে রান্নাঘর শেষ হইয়া গেল। বউটি একঘাট দুধ আনিয়া বলিল—এই উনুনটা পেড়ে দুধটুকু জ্বাল দিয়ে খেতে বসুন—বেলা কি কম হয়েছে?

খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গেল। হাজারির কথা মিথ্যা নয়—গোয়ালাবাড়ীর সকলে একবাক্যে বলিল, এরকম রান্না খাওয়া তো দু'রের কথা। সামান্য জিনিস যে খাইতে এমন-ধারা হয় তাহা শোনেও নাই।

বিকালে বিশ্রাম করিয়া উঠিয়া হাজারির শাইবার জন্য তৈরী হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল আর একবার বউটির সঙ্গে দেখা করে। পরীগ্রামে মেয়েদের মধ্যে কড়াকড়ি পদা নাই সে জানে, বিশেষতঃ রান্না-কাজের ভিন্ন অন্য জাতির মেয়েদের মধ্যে। মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল উহার সরলতার জন্য এবং বোধ হয় টাকাকড়ি সম্বন্ধে কথটা আর একবার বলিতে তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, সে ইতিমধ্যে একটা মতলব মাথায় আনিয়া ফেলিয়াছে। কুসুম এবং এই মেয়েটি যদি তাহাকে টাকা দেয় তবে সে তাহার চিরদিনের

স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। ইহাদের টাকা সে নষ্ট করিবে না—বরং অনেক গুলি বাড়িয়া ইহাদের হাতে তুলিয়া দিতে পারিবে। খাইতে বসিয়া হাজারি এসব কথা ভাবিয়া দেখিয়াছে।

ইহাদের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বড় রাস্তায় পড়িতে হইলে একটা পুকুরের ধার দিয়া যাইতে হয়—একটা বড় তেঁতুল গাছ এবং তাহার চারিপাশে অন্যান্য বন্য গাছের ঝোপ জায়গাটাকে এমন ভাবে ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছে যে বাহির হইতে হঠাৎ সেখানে কেহ থাকিলে তাহাকে দেখা যায় না।

পুকুরের পাড় ছাড়িয়া হাজারি হঠাৎ দেখিল মেয়েটি তেঁতুলতলার ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছে যেন তাহারই অপেক্ষায়।

—চলেন খুড়োমশায় ?

—হ্যাঁ বাই, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ?

—আপনি এই পথ দিয়ে যাবেন জানি, তাই দাঁড়িয়ে আছি। দুটো কথা আপনাকে বলবো। আপনার হাতের রান্না চর্চাড়ি খেয়ে ভাল লেগেছে খুড়োমশায়। আমরাও তো রাঁধি, রান্নার ভাল মন্দ বুঝি। এমন রান্না কখনো খাইনি। আর একটা কথা হচ্ছে আমার টাকাটার কথা মনে আছে তো ? কি করলেন তার ? জানেন তো মেয়েরা শব্দর-বাড়ীর লোকদের চেয়ে বাপের বাড়ীর লোকদের বেশী বিশ্বাস করে ? এদের হাতে ও টাকা পড়লে দুদিনে উড়ে যাবে।

—টাকা তোমার এখন নিতে পারবো না মা। কিন্তু আবার আমি এই পথে আসবো, তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তখন হয়তো টাকার দরকার হবে, টাকা তখন হয়তো নিতে হবে।

—কত দিনের মধ্যে আসবেন ?

—তা বলতে পারিনে, ধর মাস দুই। পূজোর পরে কার্তিক-অশ্বিন মাসের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

—কথা রইলো তা হোলো ?

—ঠিক রইল। এসো এসো, লক্ষ্মী ছোট্ট মা আমার—সাবিত্রীসমান হও, আশীর্বাদ করি তোমার বাড়-বাড়ন্ত হোক।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। হাজারি আবার পথ চলিতে লাগিল। গোয়ালবাড়ীর সবাই এবেলা থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, বউটি তো বিশেষ করিয়া। কিন্তু থাকিবার উপায় নাই, একটা কিছু যোগাড় না করা পর্যন্ত তাহার মনে সুখ নাই।

মেয়েটি খুব আশ্চর্য ধরণের বটে। নিষেধ হয় তো—কুসুমের মত বৃন্দামতী নয় ঠিকই, তবুও বড় ভাল মেয়ে।

পথের দ্বাধারে বনজঙ্গল ক্রমশঃ ঘন হইয়া উঠিতেছে—পথ নদীয়া জেলা হইতে যত বেশীর জেলার কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিতেছে, এই বন ক্রমশঃ বাড়িতেছে। স্থানে স্থানে বনজঙ্গল এত ঘন যে হাজারির ভয় করিতে লাগিল দিনরাত্রিই বুঝি বাঘের হাতে পড়িতে হয়। লোকের বসতি এসব স্থানে বেশী নাই, ভয় করিবারই কথা।

সন্ধ্যার পূর্বে বেলের বাজারে আসিয়া পৌঁছিল। আগে যখন রেল হয় নাই, তখন বেলের বাজার খুব বড় ছিল, হাজারি শুনিয়াছে তাহার গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের মুখে। এখনও পূর্বে অংশল হইতে চাকসহেঙ্গ-গঙ্গায় শব্দাহ করিতে আসে বহুলোক—তাহাদের জন্যই বেলের বাজার এখনও টিকিয়া আছে।

হাজারি বেলের বাজার দেখিয়া খুশী হইল ও আগ্রহের সঙ্গে দেখিতে লাগিল। ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছে, কখনও দেখে নাই। চমৎকার জায়গা বটে। এই

তাহা হইলে বেলে! তাহার এক মামাতো ভাই যশোর অঞ্চলে বিবাহ করিয়াছিল, তাহার বৃন্দা শামুড়ীর মৃত্যুর পরে শব লইয়া চাকদহে এই পথ বাহিয়া আসিতে বেলের বাজারের কাছে ভৌতিক ব্যাপারের সম্মুখীন হয়—এ গল্প উক্ত মামাতো ভাইয়ের মূর্খই দৃ-তিনবার সে শুনিয়াছে।

হাজারি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজারের দোকানগুলি দেখিতে লাগিল। সর্বসম্মুখ ন'খানা দোকান, ইহারই মধ্যে চাল ডাল মুদিখানার দোকান, কাপড়ের দোকান—সব। একজন দোকানদারকে বলিল—একটু তামাক খাওয়াতে পারেন মশায়?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—পেরগাম হই ঠাকুর মশায়। আসুন, কোথায় যাওয়া হবে?—বসুন, ওরে বামুনের হুকোতে জল ফিরিরে নিয়ে আর।

দোকানখানি কিসের তাহা হাজারি বুঝিতে পারিল না। এক পাশে চিটা গুড়ের ক্যানিস্টা চাল পর্যন্ত একটার গয় একটা উঁচু করিয়া সাজানো আছে—আর এক পাশে বড় বড় বস্তা। দোকানদার বৃন্দা বয়স পঁয়ষাট হইতে সত্তর হইবে, রোগা একহারা চেহারা, গলায় মালা।

—নির্ন ঠাকুর মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন। কোথায় যাওয়া হবে?

—খাছি কাজের চেষ্টায়, রাণাঘাট হোটেল সাত বছর রেখেছি, বেচু চক্ৰবর্তী হোটেল। নাম শুনেছেন বোধ হয়। ভাল রাধুনী বলে নাম আছে—কিন্তু চাকুরিটুকু গিয়েছে—এখন বাই তো একবার এই দিক পানে—যদি কোথায়ও কিছু জেটে।

দোকানদার পূর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভ্রমের চোখে হাজারিকে দেখিল। নিতান্ত গ্রাম্য ঠাকুর পুজারী বামুন নয়—রাণাঘাটের মত শহর বাজারে বড় হোটেল সাত-আট বছর সুখ্যাতির সঙ্গে রান্নার কাজ করিয়াছে, কত দেখিয়াছে, শুনিয়াছে, কত বড় লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে—না, লোকটা সে বাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়।

হাজারি বলিল—রাত হয়ে আসচে, একটু থাকার জায়গার কি হয় বলতে পারেন?

দোকানদার অত্যন্ত খুশী হইয়া বলিল—এইখানেই থাকুন, এর আর কি! আমার ওই পেছন দিকে দাঁবা চালা রয়েছে, একখানা তক্তপোশ রয়েছে। চালায় রান্না করুন, তক্তপোশে শুয়ে থাকুন।

কথায় কথায় হাজারি বলিল—আচ্ছা এখানে গঙ্গাঘাটী দিন কত যাতায়াত করে?

—সে দিন আর নেই বেলের বাজারের। আগে আট দশ দল, এক এক দলে দশ-বারো জন করে মানুষ, এ নিভা যেতো। এখন কোনোদিন মোটেই না, কোনোদিন তিনটে, বড় জোর চারটে। আগে লোকের হাতে পরসা ছিল, মড়া গঙ্গায় দিত—অজকাল হাতে নেই পরসা—মলে নদীর ধারে, খালের ধারে, বিলের ধারে পুড়িয়ে।

হাজারি ভাবিতেছিল বেলের বাজারে একখানা ছোটখাটো হোটেল চলিতে পারে কিনা। তিন দল গঙ্গাঘাটীতে ত্রিশটি লোক থাকিলে যদি সকলে খায়, তবে ত্রিশজন খরিশদার। ত্রিশজন খরিশদার রোজ খাইলে মাসে পঞ্চাশ-ষাট টাকা লাভ থাকে খরচ-খরচা বাদে। সেই জায়গায় কুড়ি জন হোক রোজ—তবুও পরের চাকুরির চেয়ে ভাল। পরের চাকুরি করিয়া পাইতেছে সাত টাকা আর অল্প অপমান বকুন। সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকা—দশ জন খরিশদার যে হোটেলের রোজ খায়, সেখানে অন্ততঃ বারো-তেরো টাকা মাসে লাভ থাকে।

পরদিন সকালে উঠিয়া সে গোপালনগরের দিকে রওনা হইল। হাতের পরসা এখনও যথেষ্ট—পাঁচ টাকা আছে, কোনো ভাবনা নাই। কাল রাতে দোকানদার চাল ডাল হাঁড়ি

কিনিয়া আনিতে চাইয়াছিল, হাজারি তাহাতে রাজী হয় নাই। নিজের পয়সা খরচ করিয়াছে।

দুপুরের রৌদ্র বড় চড়িল। নিম্জান রাস্তা, দুধারে কোথাও ঘন বনজঙ্গল, কোথাও ফাঁকা মাঠ, লোকালয় চোখে পড়ে না। এক-আধখানা চাষাদের গ্রাম ছাড়া। ঘন্টা দুই হাঁটবার পরে হাজারির তৃষ্ণা পাইল। কিছুদূরে একটা ছোট পুকুর দেখিয়া তাহার ধারে বাসিতে যাইবে এমন সময় একখানা খালি গরুর গাড়ী পুকুরের পাশের ঘেটে রাস্তা দিয়া নামিতে দেখিল। গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিল—কাছে কোনো গ্রাম আছে বাপু? একটু জল খাবো। রান্নাও।

গাড়োয়ান বলিল—আমার সঙ্গে আসুন ঠাকুর মশায়, কাছেই ছিনগর-সিম্লে, আমি বাসুন বাড়ী যাবো। তেনাদের গাড়ী—গাড়ীতে আসুন!

হাজারি শ্রীনগর-সিম্লে গ্রামের নাম শুনিয়াছিল, গ্রামের মধ্যে গাড়ী ঢুকিতে দেখিল, এ তো গ্রাম নয়—বিজন বন। এতখানি বেলা চড়িয়াছে এখনও গ্রামের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করে নাই; শুধু আম-কাঁটালের প্রাচীন বাগান, বাঁশবন, আগাছার জঙ্গল।

একটা গৃহস্থ-বাহির উঠানে গরুর গাড়ী গিয়া থামিল। গাড়োয়ানের ডাকে বাড়ীর ভিতর হইতে গৃহস্বামী আসিলেন, ম্যালেরিয়া-শীর্ণ চেহারা। মাথার চুল প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, বয়স বিশও হইতে পারে পঞ্চাশও হইতে পারে! তিনি বাহিরে আসিয়াই হাজারিকে দেখিতে পাইয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন—কে রে সঙ্গে?

গাড়োয়ান বলিল—এজ্ঞে উনি পাকা রাস্তায় মূদির পুকুরের ধারে বসে ছিলেন, বঙ্গের একটু জল খাবো—তা বল্লম চলুন আমার সঙ্গে—আমার মানিবেরা রান্নাও—সেখানে জল খাবেন, তাই সঙ্গে করে আনলাম।

গৃহস্বামী আগাইয়া আসিয়া হাজারিকে নমস্কার করিয়া বলিলেন—আসুন, আসুন। বসুন, বিশ্রাম করুন। ওরে চণ্ডীমন্ডপের তক্তপোশে মাদুরটা পেতে দে—আসুন।

এসব পল্লী-অঞ্চলে আতিথ্যের কোন রীতি হয় না। আবধটা পরে হাজারি হাত পা ধুইয়া বসিয়া গাছ হইতে সদ্য পড়া কাঁচ ডাবের জল পান করিয়া সুস্থ হইল ও খোশমেজাজে হুঁকা টানিতে লাগিল।

গৃহস্বামীর নাম বিহারীলাল বাড়ুয়ে। চাকুরি জীবনে কখনো করেন নাই, যথেষ্ট ধানের আবাদ আছে, গরু আছে, পুকুরে মাছ আছে, আম-কাঁটালের বাগান আছে। এসব কথা গৃহস্বামীর নিকট হইতেই হাজারি গল্পছলে শুনিল।

বিহারী বাড়ুয়ে বলিতেছিলেন, শ্রীনগর-সিম্লে মস্ত গ্রাম ছিল, রাজধানী ছিল কের্টনগরের রাজাদের পুত্রপুরুষের। জঙ্গলের মধ্যে রাজার গড়বাঁই আছে, পুরোনো ইটের গাঁধুনি আছে, দেখাবো এখন ওকে। না না, আজ যাবেন কি? ওসব হবে না। মূদির থাকুন, আমাদের সবই আছে আপনার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে, তবে মানুষজনের মুখ দেখতে পাইনে এই যা কষ্ট। ছেলেকেসেতেও দেখেছি গাঁয়ে বিশ-বিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল, এখন দাঁড়িয়েচে সাত ঘর মোট—তার মধ্যেও দু'ঘর আছে বারোমাস বিদেশে। আপনার নিবাস কোথায় বঙ্গের?

—আজ্ঞে, এঁড়েশোলা—গানোপুর থেকে নেমে যেতে হয়।

—তবে তো আপনি আমাদের এদেশেরই লোক। আসুন না আমাদের গাঁয়ে? জায়গা দিচ্ছি, জমি দিচ্ছি, ধান করুন, পাট করুন, বাস করুন এখানে। তবুও এক ঘর লোক বাড়ুক গ্রামে। আসুন না?

হাজারি শিহরিয়া উঠিল। সম্বনাশ! এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সে বাস করিতে

আসিবে—সেইটুকু অদৃষ্টে বাকী আছে বটে! শহর বাজারে থাকিয়া সে শহরের কল-কোলাহল কর্মবাস্ততাকে পছন্দ করিয়া ফেলিয়াছে—এই বনের মধ্যে সমাধিপ্ৰাপ্ত হইতে হয় যে, বৃন্দ বয়সে। ছ'চল্লিশ বৎসর বয়স তার—দিন এখনও যায় নাই। এখনও যথেষ্ট উৎসাহ শক্তি তার মনে ও শরীরে। তা ছাড়া সে বোঝে হোটেলের কাজ, একটা হোটেল খুলিতে পারিলে তাহার বয়স দশ বছর কমিয়া যাইবে—নব যৌবন লাভ করিবে সে। চাষবাসের সে কি জানে?

হোটেলের কথা হাজারি এখানে বলিল না। সে জানে হোটেলওয়ালা বামুন বলিলে অনেকে ঘণার চক্রে দেখে—বিশেষতঃ এই সব পাড়াগারে।

শ্রীনগরে হাজারির মেটেই মন টিকিতেছিল না—এত বনজঙ্গলের অন্ধকার ও নিশ্চিন্ততার মধ্যে তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। সুতরাং বৈকালের দিকেই সে গ্রামের বাহিরে আসিয়া পথে উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। জাবিল—বাপরে! কুড়ি বিঘে ধানের জমি দিলেও এ গায়ে নয় রে বাবা! মানুষ থাকে এখানে? মানুষজনের মুখ দেখার জো নেই, কাজ নেই, কর্ম নেই—কুড়ের মত বসে থাকে আর গোলাব ধানের ভাত খাও—সম্বৎসর!... আর কি জঙ্গল রে বাবা!...

রাস্তার ধারে একটা লোক কাঠ ভাঙিতেছিল। হাজারি তাহাকে বলিল—সামনে কি বাজার আছে বাপু?

লোকটা একবার হাজারির দিকে নীরব চাহিয়া দেখিল। পরে বলিল—আপনি কি আসেনে সিম্লে থে?

—হ্যাঁ

—ওখানে আপনাদের এত-কুটুম্ব আছেন বুঝি? আপনারা?

—স্বাক্ষণ।

—পেরণাম হই। কোথায় যাবেন আপুনি?

হাজারি জানে পল্লীগাম-অঞ্চলে এই সব শ্রেণীর লোক তাহাকে অকারণে হাজার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিয়া মারিবে। ইহাই ইহাদের স্বভাব। হাজারিও পূর্বে এই রকম ছিল—কিন্তু রাণাঘাট শহরে এতকাল থাকিয়া বুঝিয়াছে অপরিচিত লোককে এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নাই বা করিলে লোকে চটে। হাজারি বর্তমান প্রশ্নকর্তার হাত এড়াইবার জন্য সংক্ষেপে দু-একটি কথা উত্তর দিয়া তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—সামনে কি বাজার পড়বে বাপু?

—এস্তে যান, গোপালনগরের বড় বাজার পড়বে—কোশ দুই আর আছেন।

গোপালনগরের নাম হাজারির কাছে অত্যন্ত পরিচিত। এমিকের বড় গঞ্জ গোপালনগর, সকলেই নাম জানে।

মধ্যাহ্নভোজনটা একটু বেশী হইয়া গিয়াছিল, রাত্রে খাইবার আবশ্যক নাই। একটু আশ্রয় পাইলেই হইল। সুতরাং হাজারির মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল। এ কয়দিন সে যেন নতুন জীবনযাপন করিতেছে—সকালে উঠিবার তাড়া নাই, পশ্চিমায়ের মুনখাড়া নাই—বোচু চক্রান্তর কাছে বাজারের হিসাব দিতে যাওয়া নাই—দশ সের কয়লাজ্বরা অর্ধকুণ্ডের তাতে বসিয়া সকল হইতে বেলা একটা এবং তৃতিকে সন্ধ্যা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত হাতাখান্দি নাড়া নাই, বাঁচিয়াছে সে।

পথের ধারে একটা গাছতলায় পাকা বেল পড়িয়া রহিয়াছে দেখিয়া হাজারি সেটা সংগ্রহ করিয়া লইল। কাল সকালে খাওয়া চলিবে।

সব ভাল—কিন্তু তবুও হাজারির মনে হয়, এ ধরনের ভবঘুরে জীবন তাহার পছন্দসই নয়। বুঝা যায় না যেহেতু কি হইবে? চাকুরি জেটে তো ভাল। নতুন

এ ধরণের জীবন সে কতকাল কাটাইতে পারে?...একমাসও নয়। সে চার কাজ, পরিশ্রম করিতে সে ভয় পায় না। সে চার কর্মব্যস্ততা, দু-পয়সা উপার্জন, নাম, উন্নতি। ইহার উহার বাড়ী খাইয়া বেড়াইয়া, পথে পথে সময় নষ্ট করিয়া লাভ নাই।

গোপালনগর বাজারে পৌঁছিতে বেলা গেল। বেশ বড় বাজার, অনেকগুলি ছোট-বড় দোকান, ভাল ব্যবসার জায়গা বটে। হাজারি একটা বড় কাপড়ের দোকানের সামনের টিউবওয়েলে হাতামুখ খুঁইয়া লইল। নিকটে একটা কালীমন্দির—মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া সম্ভবতঃ মন্দিরের পূজারী ব্রাহ্মণ হুঁকা টানিতেছে দেখিয়া হাজারি তামাক খাইবার জন্য কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—একবার তামাক খাওয়াবেন?

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—বসুন, এই নিন।

—আপনি কি মন্দিরে মায়ের পূজা করেন?

—আজ্ঞে হাঁ। আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

—আমার বাড়ী গাংনাপুরের সন্নিকট এঁড়োশোলা। রাধুনীর কাজ করি—চাকুরির চেষ্টায় বেরিয়াছি। এখানে কেউ রাধুনী রাখবে বলতে পারেন?

—একবার এই বড় কাপড়ের দোকানে গিয়ে খোঁজ করুন। গুঁরা বড়লোক, রাধুনী গুঁদের বাড়ীতে থাকেই—বাবুর ছোট ভাইয়ের বিয়ে আছে, যদি এ সময় নতুন লোকের দরকার-চরকার পড়ে—গুঁরা জাতে তিলি, বাজারের সেরা ব্যবসাদার, ধনী লোক।

হাজারি কাপড়ের দোকানে ঢুকিয়া দেখিল একজন শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারার লোক গদির উপর বসিয়া আছে। সেই লোকটিই যে দোকানের মালিক, ইহা কেহ বলিয়া না দিলেও বোঝা যায়। হাজারিকে ঢুকিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—আসুন, কি চাই? ওদিকে যান—ওহে, দেখ ইনি কি নেবেন—

বলিয়া লোকটি দোকানের অন্য যে অংশে অনেকগুলি কর্মচারী কাজ-কর্ম ও কেনাবেচা করিতেছে সে দিকটা দেখাইয়া দিল।

হাজারি বলিল—বাবু, দরকার আপনার কাছে। আমি রান্না করি, ব্রাহ্মণ—শুনলাম আপনার বাড়ীতে রাধুনী রাখবেন—তাই—

—ও! আপনি রান্না করবেন? রাধিতে জানেন ভাল? কোথায় ছিলেন এর আগে?

—আজ্ঞে রাণাঘাট হোটেলে ছিলাম সাত বছর।

—হোটেলে? হোটেলের কাজ আর বাড়ীর কাজ এক নয়। এ খুব ভাল রান্না চাই। আপনি কি তা পারবেন? কলকাতা থেকে কুটুম্ব আসে প্রায়ই—

হাজারি হাসিয়া ভাবিল—তুমি আর কি রান্না খেয়েছ জীবনে, কাপড়ের দোকান করেই ময়েছ বই তো নয়। তেমন রান্না কখনো চেখেও দেখনি।

মুখে বলিল—বাবু, একদিনের জন্যে রেখে-পেখুন না হয়। রান্না ভাল না হয়, এমনি চলে যাব। কিছু দিতে হবে না।

দোকানের মালিক পাকা ব্যবসাদার, লোক চেনে। হাজারির কথার ধরণ দেখিয়া বুঝিল এ কাজে কথা বলিতেছে না। বলিল—আচ্ছা আপনি আমাদের বাড়ী যান। এই সামনের রাস্তা দিয়ে বরাবর গিয়ে বাঁদিকে দেখবেন বড় বাড়ী—ওরে নিতাই, তুই বাপু, একবার যা তো ঠাকুর মশায়কে শশধরের হাতে তুলে দিয়ে আয়। বলগে, ইনি আজ থেকে রাধবেন। বুঝলি? নিয়ে যা—মাইনে-টাইনে কিন্তু, ঠাকুর মশায়, পরে কাজ দেখে ধার্য হবে। হ্যাঁ—সে দু-চারদিন পরে তবে—নিয়ে যা।

প্রথম দিনের কাজেই হাজারি নাম কিনিয়া ফেলিল। বাড়ীর কর্তা দশ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। তাহার গৃহিণী অসুস্থ প্রায় বারোমাস, উঠিতে বসিতে পারিলেও সংসারের কাজকর্ম বড় একটা দেখেন না—দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহার থাকে শ্বশুরবাড়ী। একটি বোল-সভেরো বছরের ছেলে স্কুলে পড়ে আর একটি আট বছরের ছোট মেয়ে।

বাড়ীর সকলেই ভাল লোক—এতদিন চাকুরি করিয়া হাজারির যে খারাপ ধারণা হইয়াছিল পরের চাকুরি সম্বন্ধে, এখানে আসিয়া তাহা চলিয়া গেল। ইহারা জ্ঞাতিতে ভাল, বাড়ীর সকলেই স্বাক্ষরকে খাতির করিয়া চলে—হাজারির মৃদু স্বভাবের জন্যও সে অল্পদিনের মধ্যে বাড়ীর সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল।

মাসখানেক কাজ করিবার পর হাজারি প্রথম মাসের বেতন পাইয়াই বাড়ী যাইবার ছুটি চাহিল।

অনেকদিন বাড়ী যাওয়া হয় নাই—টোঁপকে কত কাল দেখে নাই। দোকানের মালিক ছুটিও দিলেন।

গোপালনগর স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া বাড়ী আসিতে প্রায় তিন আনা ট্রেন ভাড়া লাগে। মিছামিছি তিন আনা পরস্যা খরচ করিয়া লাভ নাই। হাটপথে মাত্র মাত-আট ক্রোশ হাজারিদের গ্রাম—হাঁটিয়া যাওয়াই ভাল।

বাড়ী পৌঁছিতে সম্প্রা হইয়া গেল।

টোঁপ ছুটিয়া আসিয়া বলিল—বাবা, এসো, এসো। কোথেকে এলে এখন?

তারপর সে ঘরের ভিতর হইতে পাখা আনিয়া বাতাস করিতে বসিয়া গেল। হাজারির মনে হইল তার সারা দেহ-মন জুড়াইয়া গেল টোঁপের হাতের পাখার বাতাসে। টোঁপের জন্য খাটিয়া সুখ—যত কষ্ট যত দুঃখ রাগাঘাট হোটেলের—সব সে সহ্য করিয়াছে টোঁপের জন্য। ভবিষ্যতে আরও করিবে।

যদি বংশীধর ঠাকুরের ভাগিনের সেই ছেলোটর সঙ্গে—

যাক্ সে সব কথা।

টোঁপ বলিল—বাবা, অতসীদিদি একদিন তোমার কথা বলছিল—

—আমার কথা? হরিচরণবাবুর মেয়ে?

—হ্যাঁ বাবা, বলছিল তুমি অনেকদিন আসো নি। চল না আজ, যাবে? ওখানে গিয়ে চা খাবে এখন। কলের গান শুনবে।

এই সময় টোঁপের মা ঘাট হইতে গা ধুইয়া বাড়ী ফিরিল। হাসিমুখে বলিল—কখন এলে?

হাজারি—এই তো খানিকক্ষণ। ভাল তো সব? টাকা পেরেছিল?

—হ্যাঁ। ভাল কথা, ওদের বাড়ীর সতীশ বলছিল রাগাঘাট থেকে পাঠানো নয় টাকা। তুমি এর মধ্যে কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

—রাগাঘাটের চাকরি করিনে তো। এখন আছি গোপালনগরে। বেশ ভাল জায়গায় আছি, বুঝলে? তিলিদের বাড়ী, স্বাক্ষর বুলে, ভিজিহেন্দা খুব। খাওয়া-দাওয়া ভাল। কাপড়ের মস্ত দোকান, দরিদ্র জলখাবার দেয় সকালে বিকেলে।

টোঁপ বলিল—কি জলখাবার দেয় বাবা!

—এই ধরো কোন দিন গুড়ি নারকেল, কোন দিন হালুয়া।

টোঁপের মা বলিল—বোসো, জিরোও; চা সেই, তা হোলে করে দিতাম। টোঁপ, যাবি না, সতীশের বাড়ী চা আছে—(এই কথা বলিবার সময় টোঁপের মা তুর দুটি উপরের

দিকে তুলিয়া এমন একটি ভাঙ্গি করিল, যাহা শূন্য নিম্বোধ মেয়েরা করিয়া থাকে)—দুটো চেয়ে নিয়ে আস।

টোঁপ বলিল—দরকার কি মা—আমি নিয়ে যাই না কেন বাবাকে অতসী দিদিদের বাড়ী? সেখানে চা হবে এখন—জলখাবার হবে এখন—

দু-দু'বার টোঁপ অতসীদের বাড়ী যাইবার কথা বলিয়াছে, সুতরাং হাজারি মেয়ের মতে মত না দিয়া থাকিতে পারিল না। টোঁপের ইচ্ছা তাহার নিকট অনেকের হুকুমের অপেক্ষা শক্তিশালী।

হরিচরণবাবু বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলেন—হাজারিকে যত্ন করিয়া চেয়ারে বসাইলেন।

—এসো এসো হাজারি, কবে এলে? ও টোঁপ, যা তো অতসীদিদিকে বলগে আমাদের চা দিয়ে যেতে। আমিও এখনো চা খাই নি—

—বাবু, ভাল আছেন?

—হ্যাঁ। তুমি ভাল ছিলে? তোমার সেই হোটেলের কি হোল? রাণাঘাটেই আছ তো?

হাজারি সংক্ষেপে রাণাঘাটের চাকুরি যাওয়া হইতে গোপালনগরে পুনরায় চাকুরি পাওয়া পর্যন্ত বর্ণনা করিল।

এক সময় অতসী ও টোঁপ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের সামনের ছোট গোল টেবিলটাতে চা ও খাবার রাখিল। খাবার এক ডিশ—শূন্য হাজারির জন্য, হরিচরণবাবু এখন কিছু খাইবেন না।

হাজারি বলিল—বাবু, আপনার খাবার?

—ও তুমি খাও, তুমি খাও। আমার এখন খেলি অম্বল হয়, আমি শূন্য চা খাবো।

হাজারি ভাবিল—এত বড়লোক, এত ভাল জিনিস ঘরে কিন্তু খাইলে অম্বল হয় বলিয়া খাইবার জো নাই এই বা কেমন দুর্ভাগ্য! বয়স ছ'চল্লিশ হইলে কি হয়, অম্বল কহাকে বলে সে কখনো জানে না। ভুতের মত খাটুনির কাছে অম্বল-টম্বল দাঁড়াইতে পারে না। তবে খাবার জোটে না এই যা দুঃখ।

অতসী কিন্তু বেশ বড় রেকারি সাজাইয়া খাবার আনিয়াছে—ঘি দিয়া চিড়া ভাজা, নারকেল-কোরা, দুধানা, গরম গরম বাড়ীর তৈরী কচুরী ও খানিকটা হালদা, বড় পেয়ালার এক পেয়ালো চা। অতসী এটুকু জানে যে টোঁপের বাবা তাহার বাবার মত অল্পভোজী প্রাণী নয়, খাইতে পারে এবং খাইতে ভালবাসে। অবস্থাও উহাদের যে খুব ভাল, তাহাও নয়। সুতরাং টোঁপের বাবাকে ভাল করিয়াই খাওয়াইতে হইবে।

হরিচরণবাবু বলিলেন—তোমার হাজারি কাকাকে প্রণাম করেছে অতসী!

হাজারি ব্যস্ত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অতসী তাহার পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিতে সে চিড়াভাজা চিবাইতে চিবাইতে কি বলিল ভালো বোঝা গেল না। অতসী কিন্তু চলিয়া গেল না, সে হাজারির সামনে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতেছিল। টোঁপ গল্প করিয়াছে তাহার বাবা একজন পাকা রাঁধুনী, অতসীর কোতাহলের ইহাই প্রধান কারণ।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এখন ক'দিন বাড়ীতে আছ?

—আজ্ঞে, পরশু যাবো। পনের চাকরি, থাকলে তো চলে না।

—তোমার সেই হোটেল খোলার কি হোল?

—এখনও কিছু করতে পারি নি বাবু। টাকা রোজগার না করতে পারলে তো—

—তা হলে ইচ্ছে আছে এখনও?

—ইচ্ছে আছে খুব। শীতকালের মধ্যে যা হয় করে ফেলবো।

অতসী বলিল—কাকা গান শুনবেন?

হরিচরণবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—হাঁ হাঁ—আমি ভুলে গিয়েছি একদম। শোন না হাজারি, অনেক নতুন রেকর্ড আনিয়েছি। নিয়ে এসো তো অতসী—শুনিয়ে দাও তোমার হাজারি কাকাকে।

হাজারি ভাবিল, বেশ আছে ইহার। তাহার মত খাটিয়া খাইতে হয় না, শুধু গান আর খাওয়া-দাওয়া। সন্ধ্যা হইয়াছে, এ সময় উনুনে আঁচ দিয়া ধোঁয়ার মধ্যে ছোট্ট রান্না-ঘরে বসিয়া মনিষ-গৃহিণীর ফর্দ মত তরকারি কুটিতেছে সে অন্য অন্য দিন। বারো মাসই তাহার এই কাজ। ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় বারো মাস বলিয়াই পথে বাহির হইলেই তাহার আনন্দ হয়। আর আনন্দ হইতেহে আজ, এমন চমৎকার সাজানো বৈঠকখানা, বড় আয়না, বেতমোড় কৈদারায় সে বসিয়া চা খাইতেছে, পাশে টেঁপ, টেঁপের বক্স কিশোরী মেয়েটি, কলের গান...যেন সব স্বপ্ন।

কতদিন কুসুমের সঙ্গে দেখা হয় নাই! আজ রাণাঘাট ছাড়িয়াছে প্রায় চারি মাসের উপর, এই চারি মাস কুসুমকে সে দেখে নাই। টেঁপও মেয়ে, কুসুমও মেয়ে।

আর নতুন পাড়ার সেই বউটি! সে-ও আর এক মেয়ে। আজ কলের গানের সুমধুর সুরের ভাবুকতায় তাহার মন সকলের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কলের গান বাজিল। হরিচরণবাবু মধ্যে একবার বাড়ীর ভিতর কি কাজে উঠিয়া গেলেন, তখন রহিল শুধু অতসী আর টেঁপ। বাবার সামনে বোধ হয় অতসী বলিতে সাহস করিতোছিল না, হরিচরণবাবু বাড়ীর মধ্যে ঢালিয়া গেলে হাজারিকে বলিল—কাকাবাবু, আমাকে রান্না শিখিয়ে দেবেন?

হাজারি ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা কেন দেব না মা? কিন্তু তুমি রান্না জানো নিশ্চয়! কি কি রাধিতে পারো?

অতসী বুদ্ধিমতী মেয়ে, সে বুঝিল যাহার সহিত কথা বলিতেছে, রান্নার সম্বন্ধে সে একজন গুস্তাদ শিল্পী। সঙ্গীতের তরুণী ছাত্রী যেমন সন্তোকেচের সহিত তাহার যশস্বী সঙ্গীত-শিক্ষকের সহিত রাগরাগিণী সম্বন্ধে কথা বলে—তেমনি সন্তোকেচে বলিল—তা পারি সব, শুদ্ধনি, চচ্চড়ি, ডাল, মাছের কোল—মা তো বড় একটা রান্নাঘরে যেতে পারেন না, তাঁর মন খারাপ, আমাকেই সব করতে হয়। টেঁপ বলিছিল আপনি নিরিমিষ রান্না বড় চমৎকার করেন, আমায় দেবেন শিখিয়ে কাকাবাবু?

—টেঁপ বুঝি এই সব বলে তোমার কাছে? পাগলী মেয়ে কোথাকার, ওর কথা বাদ দাও—

—না কাকাবাবু, আমি অন্য জায়গাতেও শুনেছি আপনার রান্নার শুদ্ধাতি। সবাই তো বলে।

পরে আবদারের সুরে বলিল—আমাকে শেখাতে হবে কাকাবাবু—আমি ছাড়িচি নে, আমি টেঁপকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, আপনি কবে আসবেন আমি খোঁজ নিই—ও বলে নি আপনাকে? না কাকাবাবু, আমার শেখান আপনি। আমার বড় শখ ভাল রান্না শিখি।

হাজারি বলিল—ভাল রান্না শেখা একদিনে হয় না মা। মুখে বলে দিলেও হয় না। তোমার পেছনে আমায় লেগে থাকতে হবে অন্ততঃ ষাড়া দু'মাস তিন মাস। হাত ধরে বলে দিতে হবে—তুমি রাধবে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে তোমার ভুল ধরে দেবো, এ না হোলে শিক্ষা হয় না। তুমি আমার টেঁপের মত, তোমাকে ছেঁদো কথা বলে ফাঁকি দেবো না মা, ছেলেমানুষ শিখতে চাইচি শিখিয়ে দিতে আমার অসাধ নয়। কিন্তু কি করে সময় পাবো যে তোমায় শেখাবো মা!

অতসী সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাজারির মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতোছিল। বিশেষজ্ঞ ওস্তাদের মূখের কথা। গুরুত্বপূর্ণ কথা—যাজে ছেঁদো কথা নয়, অনভিজ্ঞ, আনাড়ির কথাও নয়। তাহার চোখে হাজারি দরিদ্র রাধুনী বামুন পিতা নয়—যে ব্যবসায় সে ধরিয়াকে, সেই ব্যবসায়ে একজন অভিজ্ঞ, ওস্তাদ, পাকা শিল্পী।

হাজারির প্রতি তাহার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

পরদিন হাজারি ঘুম হইতে উঠিয়া তামাক টানিতেছে, এমন সময় হঠাৎ অতসীকে তাহাদের বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া সে রীতিমত বিস্মিত হইল। বড়মানুষের মেয়ে অতসী, অসময়ে কি মনে করিয়া তাহার মত গরীব মানুষের বাড়ী আসিল?

টোঁপ বাড়ী ছিল না, টোঁপের মা-ও অতসীকে আসিতে দেখিয়া খুব অবাক হইয়াছিল, সে ছুটিয়া গিয়া তাহার বুদ্ধিতে যতটুকু আসে, সেইভাবে জমিদার-বাটীর মেয়ের অভ্যর্থনা করিল।

অতসী বলিল—কারাবাদ্ বাড়ী নেই খুড়ীমা?

টোঁপের মা বলিল—হ্যাঁ মা, এসো আমার সঙ্গে, ঐ কোণের দাওয়ার বসে তামাক খাচ্ছে।

—টোঁপ কোথায়?

—সে মূলের বীজ আনতে গিয়েছে সদগোপ বাড়ীতে। এল বলে, বসো মা, বসো। দাঁড়াও আসনখানা পেতে—

অতসী টোঁপের মার হাত হইতে আসনখানা ক্রিপ ও চমৎকার ভঙ্গিতে কাড়িয়া লইয়া কেমন একটা সুন্দর ভাবে হাসিয়া বলিল—রাখুন আসন খুড়ীমা, ভারি আমি একেবারে গুরুত্বাকুর এলুম কিনা—তা আবার বল করে আসন পেতে দিতে হবে—

এই হাসি ও এই ভঙ্গিতে সুন্দরী মেয়ে অতসীকে কি সুন্দরই দেখাইল!—টোঁপের মা মৃদু-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল অতসীর দিকে। ইতিমধ্যে হাজারি সে স্থানে আসিয়া বলিল—কি মনে করে সকালে লক্ষ্মী মা?

অতসী হাজারির কাছে গিয়া বলিল—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

—কি কথা মা?

—চলুন ওদিকে, একটু আড়ালে বলব।

হাজারি ভাবিয়াই পাইল না, এমন কি গোপনীয় কথা অতসী তাহাকে আড়ালে বলিতে আসিয়াছে এই সকালবেলায়। দাওয়ার ছাঁচতলার দিকে গিয়া বলিল—কি কথা মা?

অতসী বলিল—কারাবাদ্, আপনি যদি কাউকে না বলেন, তবে বলি—

হাজারি বিস্মিত মুখে বলিল—বলবো না মা, বলো তুমি।

—আপনি হোটেল খুলবেন বলে বাবার কাছে টাকা ধার চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে তো এবার নয়, সেবার। ভোমায় কৈ বললে এসব কথা?

—সে সব কিছু বলব না। আমি আপনাকে টাকা দেবো, আপনি হোটেল খুলুন—

—তুমি কোথায় পাবে?

অতসী হাসিয়া বলিল—আমার কাছে আছে। দশো টাকা দিতে পারি—আমি জমিয়ে জমিয়ে করেছি। লক্ষ্য করে দেবো কিন্তু, বাবা যেন জানতে না পারে। কেউ জানতে না পারে।

হাজারির চোখে জল আসিল।

এ পর্যন্ত তিনটি মেয়ে তাহার জীবনে আসিল, যাহারা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে

তাহাকে তাহার উচ্চাশার পথে ঠেলিয়া দিতে চাহিয়াছে—তিনজনেই সমান সরলা। তিন-জনেই অনায়াস—তবে অতসী জমিদারবাড়ীর সুন্দরী, শিক্ষিতা মেয়ে, সে যে এতখানি চান টানবে ইহা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ধরণের আশ্চর্য ঘটনা!

হাজারি বলিল—কিন্তু তুমি একথা শুনলে কোথায় বলতে হবে না।

অতসী হাসিয়া বলিল—সে কথা বলবো না বলেছি তো।

—তা হলে টাকাও নেবো না। আগে বলো কে বলেছে?

—আচ্ছা, নাম করলে তাকে কিছু বলবেন না বলুন—

—কাকে কি বলবো বুঝতে পারছি নে তো? বলাবিলর কথা কি আছে এর মধ্যে? আচ্ছা, বলবো না। বলো তুমি।

—টের্পি বলেছিল, বাবার ইচ্ছে একটা হোটেল খোলেন, আমার বাবার কাছে নাকি টাকা চেয়েছিলেন ধার—তা বাবা দিতে পারেন নি। দেখুন কাকাবাবু, দাদা মারা যাওয়ার পরে বাবার মন খুব খারাপ। ঠুকে বলা না বলা দুই সমান। আমি ভাবলাম আমার হাতে তো টাকা আছে—কাকাবাবুকে দিই গে—ওঁদের উপকার হবে। আমার কাছে তো এমনি পড়েই আছে। আপনার হোটেল নিশ্চয়ই খুব ভাল চলবে, আপনারা বড়লোক হয়ে যাবেন। টের্পিকে আমি বড় ভালবাসি, ওর মনে যদি আহ্বাদ হয় আমার তাতে তৃপ্তি। টাকা বাস্তব তুলে রেখে কি হবে?

—না, তোমার টাকা তোমার বাবাকে না জানিয়ে আমি নিতে পারি নে।

অতসী যেন বড় দমিয়া গেল। হাজারির সঙ্গে সে অনেকক্ষণ ছেলেমানুষী তর্ক করিল বাবাকে না জানাইয়া টাকা লইলে দোষ কি!

শেষে বলিল—আমি টের্পিকে এ টাকা দিচ্ছি।

—তা তুমি দিতে পারো না। তুমি ছেলেমানুষ, টাকা দেওয়ার অধিকার তোমার নেই না। তুমি তো লেখাপড়া জানো, ভেবে দেখ।

—আচ্ছা, আমার লাভের অংশ দেবেন তা হলে?

হাজারির হাসি পাইল। কুসুম, গোয়লা-বাড়ীর সেই বউটি, অতসী—সবাই এক কথা বলে। ইহারা সকলেই মহাজন হইয়া টাকা ব্যবসায়ে খাটাইতে চায়। মজার ব্যাপার বটে!

—না মা, সে হয় না। তুমি বড় হও, শ্বশুরবাড়ী যাও, আশীর্বাদ করি রাজরাণী হও, তখন তোমার এই বড়ো কাকাবাবুকে যা খুশি দিও, এখন না।

অতসী দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল।

হাজারির ইচ্ছা হইল টের্পিকে ডাকিয়া বকিয়া দেয়। এসব কথা অতসীর কাছে বলিবার তাহার কোনো দরকার ছিল না, কিন্তু অতসীর নিকট প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ আছে, টের্পিকে ইহা লইয়া কিছু বলিলেই অতসীর কাণে গিয়া পৌঁছাইবে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেল।

সৌদীন বিকালে গোয়লাপাড়ায় বেড়াইতে গিয়া কুসুমের বাপের বাড়ীতে শুনিল রাণাঘাটে কুসুমের অভ্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। কোনোরপে এখান সামলাইয়া গিয়াছে। সে কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই, কথায় কথায় কুসুমের কাকা ঘনশ্যাম ঘোষ বলিল—মাঝে রাণাঘাটে পনেরো দিন ছেলোম দাদাঠাকুর, ছানার কাজ এ মাসটা বড় মন্দ।

হাজারি বলিল—পনেরো দিন ছিলে? কেন হঠাৎ এ সময়—

তারপরেই ঘনশ্যাম কুসুমের কথাটা বলিল।

হাজারির কেবল মনে হইতে লাগিল কুসুমের সঙ্গে কতদিন দেখা হয় নাই—একবার

তাহার সহিত দেখা করিতে গেলে কেমন হয়? মনটা আন্দুর হইয়া উঠিয়াছে তাহার অসুখের খবর শুনিয়া। জীবনে ওই একটি মোয়ের উপর তাহার অসীম রোহ ও শ্রদ্ধা।

ইচ্ছা হইল কুসুমের সম্বন্ধে ঘনশ্যামকে সে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু তাহা করা চলিবে না। সে মনের আকুল আগ্রহ মনেই চাপিয়া শূন্য কেবল উদাসীন ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—এখন সে আছে কেমন?

—তা এখন আপনার বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে সেরে উঠেছে—তবে বড় কষ্ট যাচ্ছে সংসারের, দুখ-দই বেচে তো চালাতো, আজ মাসখানেকের ওপর শয্যাগত অবস্থা। ইদিকি আমার সংসারের কাণ্ড তো দেখতেই পাচেন—কোথেকে কি করি দাদাঠাকুর—

হাজারি এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিল না। যেন কুসুমের সম্বন্ধে তাহার সকল আগ্রহ ফুরাইয়া গেল।

বাড়ী ফিরিবার পথে হাজারি ভাবিল রাণাঘাটে তাহাকে যাইতেই হইবে। কুসুমের অসুখ শুনিয়া সে চূপ করিয়া থাকিতে পারিবে না। কালই একবার সে রাণাঘাট যাইবে।

পথে অতসীর পিতা হরিবাবুর সঙ্গে দেখা।

তিনি মোটা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। হাজারিকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে হাজারি, কোথা থেকে ফিরচো? তা এসো আমার ওখানে, চলো চা খাবে।

বৈঠকখানায় হাজারিকে বসাইয়া হরিবাবু বলিলেন—বসো, আমি বাড়ীর ভেতর থেকে আসছি। তারপর দুজনে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে যতদিন বাড়ী আছ, আসা-যাওয়া একটু করো হে, কেউ আসে না, একলাটি সারাদিন বসে আর সময় কাটে না। দাঁড়াও আসছি—

হরিবাবু বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে অতসী একখানা রেকার্ডিতে খানকতক লুচি, বেগুনভাজা এবং একটু আখের গড় লইয়া আসিল। হাজারির সামনের টেবিলে রেকার্ডি রাখিয়া বলিল—আপনি ততক্ষণ খান কাকাবাবু, চা দিয়ে যাচ্ছি।

হাজারি বলিল—বাবু আসুন আগে—

—বাবা তো খাবার খাবেন না, তিনি খাবেন শূন্য চা। আপনি খাবারটা ততক্ষণ খেয়ে নিন। চা একসঙ্গে দেবো—

অতসী চলিয়া গেল না, কাছেই দাঁড়াইয়া রহিল। হাজারি একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল, বলিবার কিছু খজিয়া না পাইয়া বলিল—টোপ আজ আসে নি মা?

—না, এ বেলা তো আসে নি।

হাজারি আর কিছু কথা না পাইয়া নীরবে খাইতে লাগিল। খাইতে খাইতে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল অতসী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। অতসী সুন্দরী মেয়ে, টোপের বন্ধু হইলেও বয়সে টোপের অপেক্ষা চার-পাঁচ বছরের বড়—এ বয়সের সুন্দরী মেয়ের সহিত নিজের ঘরে অল্পক্ষণ কাটাইবার অভিজ্ঞতাও হাজারির নাই—সে রীতিমত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

অতসী হঠাৎ বলিল—কাকাবাবু, আপনি আমার ওপর রাগ করেন নি?

হাজারি ধতমত খাইয়া বলিল—রাগ? রাগ কিসের মা—

—ও-বেলার ব্যাপার নিয়ে?

—না না, এতে আমার রাগে হবার কিছু নেই, বরং ভোমারই—

—না শুনুন কাকাবাবু, আমি তারপর ভেবে দেখলাম আপনি আমার টাকা নিলে খুব ভাল করতেন। জানেন, আমার দাদা মারা যাওয়ার পর আমি কেবলই ভাবি দাদা বেঁচে থাকলে বাবার বিষয় আমি পেতাম না, এখন কিন্তু আমি পাবো। কিন্তু ভগবান

জানেন কাকাবাবু, আমি এক পরস্যা চাইনে বিষয়ের। দাদা বিষয় ভোগ করতে তো করতে—নয় তো বাবা বিষয় যা খুঁশি করে যান, উড়িয়ে যান, পুড়িয়ে যান, দান করেন—আমার যেন এ না মনে হয় আজ দাদা থাকলে এ বিষয় আমি পেতাম না দাদাই পেতো। বিষয়ের জন্যে যেন দাদার ওপর কোনোদিন—আমার নিজের হাতে যা আছে তাও উড়িয়ে দেবো।

অতসীর চোখ জলে টলটল করিয়া আসিল, সে চুপ করিল।

হাজারি বলিল—না মা, ও সব কথা কিছ্ ভেবো না। তোমার বাবা মাকে তুমিই বুঝিয়ে রাখবে, তুমিই ঠুঁদের একমাত্র বাঁধন—তুমি ওরকম হলে কি চলে? ছি—মা—

হাজারি সত্যি অর্থাৎ হইয়া গেল, ভাবিল—এইটুকু মেয়ে, কি উচ্চ মন দ্যাখো একবার! বড় বংশ নইলে আর বলেছে কাকে? এঁকি আর বেচুঁবাবুর হোটেলের পক্ষাধি?

হাজারি বলিল—আচ্ছা মা আমাকে টাকা দেবার তোমার সোঁক কেন হোল বল তো? তোমরা মেয়েরা যদি ভাল হও তো খুবই ভাল, আর মন্দ হও তো খুবই মন্দ।—আমায় তুমি কিম্বাস কর মা?

—আগনি বুঝে দেখেন। না হোলে আপনাকে টাকা দিতে চাইব কেন?

—তোমার বাবাকে না জানিয়ে দেবে?

—বাবাকে জানালে দিতে দেবেন না। অথচ আমার টাকা পড়ে রয়েছে, আপনার উপকার হবে, আমি জানি আপনাদের সংসারের কণ্ট। টেঁপির বিয়ে দিতে হবে। কোথায় পাবেন টাকা, কোথায় পাবেন কি! আপনার রামার যেমন সুখ্যাতি, আপনার হোটেল খুব ভাল চলে। ছ-বছরের মধ্যে আমার টাকা আপনি আমার ফেরত দিয়ে দেবেন।

হাজারি মৃগ্ম হইয়া গেল অতসীর হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া। বলিল—আচ্ছা তুমি দিও টাকা, আমি নেবো। হোটেল এই মাসেই আমি খুলিবো—তোমার মুখ দিয়ে ভগবান এ কথা বলেছেন মা, তোমরা নিষ্পাপ ছেলমানুষ, তোমাদের মুখেই ভগবান কথা কন।

অতসী হাসিয়া বলিল—তা হলে নেবেন ঠিক?

—ঠিক বলিচি। এবার ঘুরে জায়গা দেখে আসি। রাগাঘাট যাচ্ছি কাল সকালেই, হয় সেখানে, নয় তো গোয়াড়ির বাজারে জায়গা দেখবো। খবর পাবে তুমি, আবার ঘুরে আসিচি তিন-চার দিনের মধ্যেই।

অতসী বলিল—বাবার আঁহিক করা হয়ে গিয়েছে, বাবা আসবেন, আপনি বসুন, আমি আপনাদের চা নিয়ে আসি। শুনুন কাকাবাবু, আপনি যেদিন বারার কাছে হোটেলের জন্যে টাকা চান, আমি সেদিন বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলাম। সেই থেকে আমি ঠিক করে রেখেছি আমার যা টাকা জমানো আছে আপনাকে তা দেবো।

—আচ্ছা বল তো মা একটা সত্যি কথা—আমার ওপর তোমার এত দয়া হোল কেন?

—বলবো কাকাবাবু? আপনার দিকে চোখে দেখে আমার মনে হোত আপনি খুব সরল লোক আর ভালো লোক। আমার মনে বড় কণ্ট হয় আপনাকে দেখলে সত্যি বলিচি—তবে দয়া বলছেন কেন? আমি আপনার মেয়ের মত না?

বলিয়াই অতসী এক প্রকার কুণ্ঠা ও লজ্জামিশ্রিত হাসি হাসিল।

হাজারি বলিল—তুমি আর জন্মে আমার মা ছিলে তাই দয়ার কথা বলিচি। নইলে কি সন্তানের ওপর এত মমতা হয়? তুমি স্বেচ্ছা থাকো, রাজরাণী হও—এই আশীর্বাদ করিচি। আমি তোমার গরীব কাকা, এর বেশী আর কি করতে পারি।

অতসী আগাইয়া আসিয়া হঠাৎ নীচ হইয়া হাজারির পায়ের ধূলা নইয়া প্রণাম করিল এবং আর একটুও না দাঁড়াইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

রাত্রি সারারাত্রি হাজারি ঘুমাইতে পারিল না। অতসীর মত বড়ঘরের সুন্দরী মেয়ের স্নেহ আদায় করার মধ্যে একটা নেশা আছে, হাজারিকে সে নেশায় পাইয়া বসিল। তাহার জীবনের এক অশ্রুত ঘটনা!

সকালে উঠিয়া সে রাণাঘাটে রওনা হইল। বেশী নয় পাঁচ ছ'মাইল রাস্তা হাঁটিয়া বেলা সাড়ে আটটার সময় স্টেশনের নিকটে সেগুন-বনে গিয়ে পৌঁছিল।

রেল-বাজারের মধ্যে ঢুকিতেই তাহার ইচ্ছা হইল একবার তাহার পুরাতন কর্মস্থানে উঁকি মারিয়া দেখিয়া যায়। আজ প্রায় পাঁচ মাস সে রাণাঘাট ছাড়া। দূর হইতে বেচু চক্রবর্তীর হোটেলের সাইনবোর্ড দেখিয়া তাহার মন উত্তেজনা ও কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। গত ছয় বৎসরের কত স্মৃতি জড়ানো আছে ওই টিনের চালওয়াল ঘরখানার সঙ্গে।

হোটেলের গদিঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে বেচু চক্রবর্তীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। বেলা-প্রায় সাড়ে দশটা, খরিসদার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বেচু চক্রবর্তী পুরানো দিনের মত গদিঘরে তক্তপোদের উপর হাতবাক্সের সামনে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।

হাজারি প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন—আরে এই যে হাজারিঠাকুর! কি মনে করে? কোথায় আছ আজকাল? ভাল আছ বেশ?

হাজারি এক মৃদুস্বরে আবার যেন বেচু চক্রবর্তীর বেতনডুক রাধুনী বামুনে পরিণত হইল, তেমনি ভয়, সত্কাচ ও মনিবের প্রতি সম্মানের ভাব তার সারা দেহমানে হঠাৎ কোথা হইতে যেন উড়িয়া আসিয়া ভর করিল।

সে পুরোনো দিনের মত কাঁচুমাচু ভাবে বলিল—আজ্ঞে তা আপনার কৃপায় এক রকম—আজ্ঞে, তা বাবু বেশ ভাল আছেন?

—আজকাল আছ কোথায়?

—আজ্ঞে গোপালনগরে কুন্ডুবাবুদের বাড়ীতে আছি।

—বাড়ীর কাজ? কর্মদিন আছ?

—এই চার মাস আছি বাবু।

—তা বেশ, তবে সেখানে মাইনে আর কত পাও? হোটেলের মত মাইনে কি করে দেবে গেরস্ত ঘরে?

বেচু চক্রবর্তীর এই কথার মধ্যে হাজারি এক ধরনের সূরের আঁচ পাইল। ব্যাপার কি? বেচু চক্রবর্তী কি আবার তাহাকে হোটেলে রাখিতে চান? তাহার কৌতূহল হইল শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কি দাঁড়ায়।

সে বিনীত ভাবে বলিল—ঠিক বলেছেন বাবু, তা ভো বেশী নয়। গেরস্তবাড়ী কোথা থেকে বেশী মাইনে দেবে?

—তারপর কি এখন আমাদের এখানে এসেছ ঠাকুর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু।

—কি মনে ক'রে বলো ভো? থাকবে এখানে?

হাজারি কিছুমাত্র না জাব্বাই বলিল—সে বাবুর দয়া।

—তা বেশ বেশ, থাকো না কেন, পুরোনো লোক বেশ ভো। যাও কাজে লেগে যাও তোমার কাপড়-চোপড় এনেছ? কই?

—না বাবু, আগে থেকে কি করে আনি। সে সব গোপালনগরে রয়েছে। চাকুরিতে

দয়া করে রাখবেন কি না রাখবেন না জেনে কি করে সে-সব—

—আচ্ছা, আচ্ছা, যাও ভেতরে যাও রতন ঠাকুরের অসুখ করেছে, বংশী একা আছে, তুমি কাজে লাগো এবেলা থেকে। ভাঙা ভাঙটো এ মাসের কটা দিনের মাইনে তুমি আগাম নিও।

হাজারি কৃতজ্ঞতার সহিত বেচু চক্রান্তকে আর একবার ঘাড় খুঁবে নীচু করিয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া কলের পুতুলের মত রাস্মাঘরের দিকে চলিল।

সামনেই বংশীঠাকুর।

তাহাকে দেখিয়া বংশী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—বাবু ডেকে বহাল করলেন যে ফের! ভাল আছ বংশী? তোমার সেই ভাগেটি ভাল আছে?

বংশী বলিল—আরে এস এস হাজারি—না! তোমার কথা প্রায়ই হয়। তুমি বেশ ভাল আছ? এতদিন ছিলে কোথায়?

—ডেকে কি চাপিয়েছে? সরো, হাতাটা দাও। এখনও মাছ হয়নি বুঝি? বাও, তুমি গিয়ে মাছটা চড়িয়ে দাও! তেলের বরাদ্দ সেই রকমই আছে না বেড়েছে?

বংশী বলিল—একবার টেনে নিও একটু। অনেক দিন পরে যখন এলে। দাঁড়াও, ভালটায় নুন দেওয়া হয়নি এখনও—দিয়ে দাও।

বলিয়া সে দরমার আড়ালে গাঁজা মাজিতে গেল।

চুপি চুপি বলিল—তোমায় বহাল করেছে কি আর সাথে? এদিকে তুমি চলে যাওয়াতে হোটেলের ভয়ানক দুর্নাম। সেই কলকাতার বাবুরা দুর্দান্তন দল এসেছিল, যেই শুনলে তুমি এখানে নেই—তারা বলে, সেই ঠাকুরের রাস্মা খেতেই এখানে আস। সে যখন নেই, আমরা রেলের হোটেলে খাবো। হাটুরে খন্দেরও অনেক ভোগে গিয়েছে—যদু বাড়ুঝের হোটেলে। তোমায় বাবু বহাল করলেন কেন জান? যদু বাড়ুঝের হোটেলে তোমাকে পেলে লুফে নেয় একটুনি। তোমার অনেক খেঁজ করেছে ওরা।

বংশীর হাত হইতে গাঁজার কলিকা লইয়া দম মারিয়া হাজারি কিছুক্ষণ চকু বুজিয়া চুপ করিয়া রহিল। কি হইতে কি হইয়া গেল। চাকুরি লইতে সে তো রাণাঘাট আসে নাই। কিন্তু পুরাতন জায়গায় পুরাতন আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া সে বুঝিয়াছে এতদিন তাহার মনে সুখ ছিল না। এই বেচু চক্রান্তের হোটেল, এই দরমার বেড়া দেওয়া রাস্মাঘর, এই পাথুরে কয়লার স্তূপ, এই হাতাবোড় এই তার অতি পরিচিত স্বর্গ। ইহাদের ছাড়িয়া কোথায় সে যাইবে? ভগবান এমন সুখের দিনও মানুষের জীবনে আনিয়া দেন?

বংশীর হাতে কলিকা ফিরাইয়া দিয়া সে খুশীর সহিত বলিল—নাও, আর একবার টান দিয়ে নাও। ডালে সম্বর দিই গে—এবেলা এখনও বাজার আসে নি নাকি?

বংশী বলিল—মাছটা কেবল এসেছে। তরকারীসমিতি এল বলে, গোবরা গিয়েছে। গোবরা নতুন চাকর—বেশ লোক, আমার ওপর ভরসা ভক্তি। এলে দেখো এখন।

এই সময় তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইয়া জন দুই খরিদদার খাইবার ঘরে ঢুকিতেই হাজারি অভ্যাস মত পুরাতন দিনের নায়ক হাঁকিয়া বলিল—বসুন বাবু, জায়গা করাই আছে—নিয়ে যাচ্ছি। বসে পড়ুন। মাছ এখনও হয়নি এত সকালে কিন্তু—শুধু ডাল আর ভাজা—বংশী ভাত নিয়ে এসেছে—ডালটায় সম্বর দিয়ে নিই—বেলাও এদিকে প্রায় দশটা বাজে। কেফ্টনগরের গাড়ী আসবার সময় হোল। অজকাল ঈন্টিশনের খন্দের আনে কে?

হাজারি যেন দেহে-মনে নতুন বল ও উৎসাহ পাইয়াছে। হাজার হোক, শহর বাজার

জায়গা রাখাঘাটে, কত লোকজন, গাড়ী, হৈ হৈ, ব্যস্ততা, রেলগাড়ী গাড়ী-মোড়া—এখানে এক বার কাটাইয়া গেলে কি অন্য জায়গা কারো ভালো লাগে? একটা জায়গার মত জায়গা।

এমন সময় একজন কালোমত ছোকরা চাকর তরকারি বোঝাই খুড়ি মাথায় রান্নাঘরে নীচু হইয়া ঢুকিল—পিছনে পিছনে পশ্মিষ।

পশ্মিষ বলিতে বলিতে আসিতেছিল—বাবা, বেগুন আর কেনবার জো নেই রাণাঘাটের বাজারে। আট পয়সা করে বেগুনের সের ভুড়ারতে কে শুনেছে কবে—যত ব্যাটা ফড়ে জুটে বাজার একেবারে আগুন করে রেখেচে—সব চম্ভো কলকোতা—তা গরীব-গরুবো লোক কেনেই বা কি আর খায়ই বা কি—ও বংশী, খুড়িটা ধরে নামাও ওর মাথা থেকে—দরজার চৌকাঠে পা দিয়াই সে সম্মুখে থালায় অন্নপরিবেশনরত হাজারিকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া একেবারে ঘেন কাঠ হইয়া গেল।

হাজারি পশ্মিষকে দেখিয়াই খতমত খাইয়া গেল। তাহার পুরাতন ভয় কোথা হইতে সেই মূহুর্ভুই আসিয়া জুটিল। সে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া হাসিয়া আমতা আমতা সুরে বলিল—এই যে পশ্মিদিদি ভাল আছ বেশ? হে—হে—আমি—

পশ্মিষ বিস্ময়ের ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বংশী ঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিল—খুড়িটা নামিয়ে নেও না ঠাকুর? ও সঙের মত দাঁড়িয়ে বইল খুড়ি মাথায়—মাছ হোল? তারপর হাজারির দিকে তাক্সিলের ভাবে চাহিয়া বলিল—কখন এলে?

—আজই এলাম পশ্মিদিদি।

—আজ এবেলা এখানে থাকবে?

বংশী ঠাকুর বলিল—হাজারিকে যে বাবু বহাল করেছেন আবার। ও এখানে কাজ করবে।

পশ্মিষ কঠিন মুখে বলিল—তা বেশ। রান্নাঘরে আর না দাঁড়াইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

বংশী ঠাকুর অনুচ্চস্বরে বলিল—পশ্মিদিদি চটেছে—বাবুর সঙ্গে এইবার একচোট বাধবে—

পশ্মিকে সারাদুপুর আর রান্নাঘরের দিকে দেখা গেল না। হাজারির মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল, কতক্ষণে কাজ সারিয়া কুসুমের সঙ্গে গিয়া দেখা করিবে। সে দেখিল সত্যিই হোটেলের খরিদ্দার কমিয়া গিয়াছে—পূর্বে যেখানে বেলা আড়াইটার কমে কাজ মিটিতো না, আজ সেখানে বেলা একটার পরে বাহিরের খরিদ্দার আসা বন্ধ হইয়া গেল।

হাজারি বলিল—হ্যাঁ বংশী, থার্ড ক্লাসের টিকিট মোটে ত্রিশখানা! আগে যে সন্তর-পঁচাত্তর খানা একবেলাতেই হোত? এত খন্দের গেল কোথায়?

বংশী বলিল—তবুও তো আজকাল একটু বেড়েচে। মধ্যে আরও পড়ে গিয়েছিল, খুড়িখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট হয়েছে এমন দিনও গিয়েছে। লোক সব-স্বায় খাদু বাঁড়ুবোর হোটেল। ওদের এবেলা একশো ওবেলা ষাট-সত্তর খন্দের। ইন্ডের দিন আরও বেশী। আর খন্দের থাকে কোথা থেকে বলা! মাছের মড়ো কোনোনদিন খন্দেররা চেয়েও পাবে না! বড় মাছ কাটা হোলেই মড়ো নিয়ে যাবেন পশ্মিদিদি। আমাদের কিছু বলবার জো নেই। তার ওপরে আজকাল যা চুরি শুরুর করেছে পশ্মিদিদি—সে সব কথা এরপর বলবো এখন। খেয়ে নাও আগে।

হোটেল হইতে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া হাজারি বাহির হইয়া মোড়ের দোকানে এক পয়সার বিড়ি কিনিয়া ধরাইল। চুর্ণীর ধারে তাহার সেই পরিচিত গাছতলাটায় কতদিন বসে হয় নাই।—সেখানে গিয়া আজ বসিতে হইবে। পাথে রাখাবল্লভ-তলার সে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। আজ তাহার মনে যথেষ্ট আনন্দ, রাখাবল্লভ ঠাকুর জাগ্রত দেবতা, এমন

দিনও তাহাকে জুটাইয়া দিয়াছেন! অজ্ঞ ভোরে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল, সে কি ইহা ভাবিয়াছিল? অস্বপনের স্বপন। চোর বলিয়া বদনাম রটাইয়া বাহারা তাড়াইয়াছিল, আজ তাহারাই কিনা যাঁচিয়া তাহাকে চাকুরিতে বহাল করিল।

চণ্ডী নদীর ধারে পরিচিত গাছতলাটায় বসিয়া সে বিড়ি টানিতে টানিতে এক পরসার বিড়ি শেষ করিয়া ফেলিল মনের আনন্দে। কুসুমের বাড়ী এখন সব ঘুমাইতেছে, গৃহস্থ বাড়ীতে দেখাশুনা করিবার এ সময় নয়—বেলা কখন পড়িবে? অন্ততঃ চারিটা না বাজিলে কুসুমের ওখানে যাওয়া চলে না। এখনও দেড় ঘণ্টা দৌরি।

গোপালনগরে কুসুমবাড়ী হইতে তাহার কাপড়ের পটুটলিটা একদিন গিয়া আনিতে হইবে। গত মাসের মাহিনা বাকি আছে, দেয় ভালো, না দিলে আর কি করা যাইবে?

আজ একটু রাত থাকিতে উঠিবার দরুন ভাল ঘুম হয় নাই—তাহার উপরে অনেকদিন পরে হোটেলের খাটুনি। পাঁচকোশ পায়ে হাঁটিয়া স্বগ্রাম হইতে রাণাঘাট আসা প্রভৃতির দরুন হাজারির শরীর ক্লান্ত ছিল—গাছতলার ছায়ায় কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। যখন ঘুম ভাঙিল তখন সূর্যের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল চারিটা বাজিয়া গিয়াছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে সে কুসুমের বাড়ীর দরজায় গিয়া কড়া নাড়িল।

কুসুম নিজে আসিয়াই খিল খলিল এবং হাজারিকে দেখিয়া অবাধ হইয়া বলিল—জ্যঠামশায়! কোথা থেকে? আসুন—আসুন—

তার পরেই সে নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—এস এস মা, কল্যাণ হোক। ছেলোঁপিলে সব ভাল তো? এত রোগা হয়ে গিয়েছ, ইস্। তোমার কাকার মুখে তোমার বড় অসুখের কথা শুনলাম।

কুসুম বাড়ীর মধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া ঘরের মেঝেতে শতরাজি পাতিয়া বসাইল। বলিল—ভয় নেই জ্যঠামশায়, মরিচ নে অত শীগগির। আপনি সেই যে গেলেন, আর কোনো খবর নেই। অসুখের সময় আপনার কথা কত ভেবেছি জানেন জ্যঠামশায়? মরেই যদি যেতাম, দেখা হোত আর? অথন্দে আপদ না হোলো মরেই তো—

—ছি ছি, মা, ও রকম কথা বলতে আছে?

—কোথায় ছিলেন এতদিন আপনি? আজ কোথা থেকে এলেন?

—এঁড়োশালা থেকে।

কুসুম ব্যস্ত হইয়া বলিল—হেঁটে এসেছেন বুঝি? খাওয়া হয়নি?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ব্যস্ত হয়ে না মা। বলছি সব। সকালে বেরিয়েছিলাম এঁড়োশালা থেকে, বালি যাই একবার রাণাঘাট, তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে খুব হোল। রেল বাজারে যেমন বাবুর হোটেল দেখা করতে যাওয়া অমনি বাবু বহাল করলেন কাজে। সেখানে কাজ সাঙ্গ করে চণ্ডীর ধারে বেড়িয়ে এই আসছি।

—ওমা আমার কি হবে? ওরা আবার আপনাকে ডেকে বহাল করেছে! তবে মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়েছিল কেন? পদ্ম আছে তো?

—পদ্ম নেই তো যাবে কোথায়? আছে বলে আছে! খুব আছে।

পরে গল্পের সুরে বলিল—আমায় না নিলে হোটেল যে ইন্দিকে চলে না। খন্দের-পন্ডর তো আদ্রেক ফর্সা। সব উঠেছে গিল্পে বাঁড়ুয়ো মশায়ের হোটেল।

হাজারি হোক, হোটেলের মালিক, সুভায়া তাহার মনিবের সমশ্রেণীর লোক। হাজারি বদু বাঁড়ুয়ের নামটা সমীহ করিয়াই মুখে উচ্চারণ করিল।

কুসুম যেন অবাধ হইয়া আনন্দিতা দাঁড়াইয়া রহিল। পরে হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—বসুন, জ্যঠামশায়, আসছি আমি—

—না, না, শোনো। এখন খাওয়া-দাওয়ার জন্যে যেন কিছু করো না—

—আপনি বসুন তো। আসছি আমি—

কোনো কথাই খাটিল না। কুসুম কিছুক্ষণ পরে এক বাটি গরম সরদুধ ও দু-খানি বরফ সম্বন্ধে রেক-বিত্তে করিয়া আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—একটু জল সেবা করুন।

—ওই তো তোমাদের দোষ, ব্যরণ করে দিলেও শোনো না—

কুসুম হাসিমুখে বলিল—কথা শুনবো এখন পরে—দুধটা সেবা করুন সবটা—ভালো দুধ—বাড়ীর গরুর। ঘন করে জ্বল দিয়েছি। দুধের থেকে আকার ওপর বসানো ছিল।

—তুমি বড় মূর্খকিমে ফেললে দেখাচি মা!...নাঃ—

হাজারিকে পান সাজিয়া দিয়া কুসুম বলিল—জ্যাঠামশায়, হোটেল ভাল লাগছে?

—তা মন্দ লগছে না। আজ বেশ ভালই লাগলো। তবে ভাবছি কি জানো মা, এই রেল বাজারে আর একটা হোটেল বেশ চলে।

—শুধু বেশ চলে না জ্যাঠামশাই, খুব ভাল চলে। আপনার নিজের নামে হোটেল দিলে সব হোটেল কানা পড়ে যাবে।

—তোমার তাই মনে হয় মা?

—হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়। খুশন আপনি হোটেল।

—আর একজনও একথা বলেছে কালই। তোমার মত সেও আর এক মেয়ে আমার। আমাদের গায়েরই—

—কে জ্যাঠামশায়?

—হরিবাবুর মেয়ে, অতসী ওর নাম, টেপির বন্ধু। খুব ভাব দুজনে। সে আমার কাল বলছিল—

—আমাদের বাবুর মেয়ে? আমি দেখিনি কখনো। বয়েস কত?

—ওর নতুন এসেছে গাঁয়ে, কোথা থেকে দেখবে। বয়েস ষোল-সতেরো হবে। বড় ভাল মেয়েটি।

—সবাই যখন বলেছে তাই করুন আপনি। টাকা আমি দেবো—

—অতসীও দোবে বলেছে। দু-তিনের কাছে টাকা নিলে জাঁকিয়ে হোটেল দেবো। কিন্তু ভয় হয় তোমার ব্যাঙের আখুনি নিয়ে শেষে যদি লোকসন যায়, তবে একূল ওকূল দুকূল গেল। বরং অতসী বড় মানুষের মেয়ে—তার দুশো টাকা গেলে কিছু তার আসে যাবে না—

—না, আমার টাকাও খাটিয়ে দিতে হবে। সে শুনছি নে।

—আমি দুজনের টাকাটু নেবো। কাল থেকে জায়গা দেখছি রও। তবে টাকা গেলে আমার দেশ দিও না।

—জ্যাঠামশায়, আপনি হোটেল খুললে টাকা জবাবে না—আমি বলছি। এর পরেও যদি ডেড, তবে আর কি হবে। আপনার দোষ দেখো না।

উঠবার সময় কুসুম বলিল, জ্যাঠামশায়, পরশ সন্ধ্যার দিন বাড়ীতে সত্য-নারায়ণের সন্নি দেবো ভাবছি, আপনি এখানে রাষ্ট্র সেবা করবেন।

—তা কি করে হবে মা? আমি রাতে বায়টার কম ছুটি পাবো না।

—তবে তার পর দিন দুপুরে? বেল একটার সময় আসবেন। আমি নীচ ভেজে রাখবো, আপনি এসে তরকারি করে নেবেন। কথা রইলো, আসতেই হবে কিন্তু জ্যাঠামশায়।

হোটেল ফিরিয়া সে বড় ডেকে রান্না চাপাইয়া দিল। বংশী ঠাকুর এবেলা এখনো বি. র. সন্ধ্যা ২য়—১৬

আসে নাই, হাজারি অত্যন্ত খুশির সহিত চারদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—সেই অত্যন্ত পরিচিত পরাতন রম্মাঘর, এমন কি একখানা পুরানো লোহার খুন্টি পাঁচ-মাস আগে টিনের চালের বাতর গায়ে সেই গুঁজিয়া রাখিয়া গিয়াছিল এখনও সেখানেই স্থানেই মরিচা-পড়া অবস্থায় গাঁজাই রহিয়াছে। সেই বংশী, সেই রতন, সেই পশ্চাদিদ।

বংশী আসিয়া ঢুকিল। হাজারি বলিল—আজ পেঁপে কুটিয়ে দাও তো বংশী, একবার পেঁপের তরকারী মন দিয়ে রাখি অনেক দিন পরে। একদিনে বাড়ীজো মশায়ের হোটেল কানা করে দেবো।

গদির ঘরে পশ্চাদিয়ার গলার অঁওরজ পাইয়া বংশী বলিল—ও পশ্চাদিদ, শোনো ইদিকে—ও পশ্চাদিদ—

পশ্চাদি খাভ্রনসের খাওয়ার ঘর পার হইয়া রম্মাঘরের মধ্যে আসিয়া ঢুকিয়া বলিল—কি হয়েছে?

বংশী বলিল—কি কি রম্মা হবে এবেলা? হাজারি বলেছে পেঁপের তরকারি রাখবে ভাল করে। দু-একটা ভালমন্দ আমাদের দেখাতে হবে আজ থেকে। পেঁপে তো রয়েছে—কি বল?

পশ্চাদি বলিল—না পেঁপে কাল হবে। আজ এবেলা বিলিতি কুমড়া হোক। আর কুচে মাহের ঝাল করো। সাত আনা সের চিংড়ি ওবেলা গিয়েছে—এবেলা দেখি কি মাছ পাওয়া যায়।

হাজারি বলিল—পশ্চাদিদ, আজ একটু মাংস হোক না?

পশ্চাদি এতক্ষণ পর্বান্ত হাজারির সঙ্গে সরাসরিভাবে বাক্যালাপ করে নাই। সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—মাংস বুধবার হরে গিয়েছে। আজ আর হবে না—বরং শনিবার দিনে হবে।

হাজারি অত্যন্ত পুনরীকিত হইয়া উঠিল পশ্চাদি তাহার সহিত কথা বলাতে এবং পলকের প্রথম মুহূর্ত কাটিতে না কাটিতে তাহাকে একেবারে বিস্মিত ও চকিত করিয়া দিয়া পশ্চাদি জিজ্ঞাসা করিল—এতদিন কোথায় ছিলে ঠাকুর?

হাজারি সাগরে বলিল—আমার কথা বলছ পশ্চাদিদ?

—হ্যাঁ।

—গোপালনগরে কুণ্ডুবাবুদের বাড়ী। আমি ছাটি নিয়ে বাড়ী এসেছিলাম—তারপর রাগাঘাটে আজ এসেছিলাম বেড়াতে। তা বাবু বলেন—

—হঁ, বেশ থাকো না। তবে বইরে জিনিসপত্তর নিয়ে যেতে পারবে না বলে দিচ্ছি।

ওসব একদম বন্ধ করে দিয়েছেন বাবু। যা পারো এখানে থেও—বুঝলে?

—না বইরে নিয়ে যাবো কেন পশ্চাদিদ? তা নিয়ে যাবু না।

—তোমার সেই কুসুম কেমন আছে? দেখা করতে যাও না? পশ্চাদিয়ার কন্ঠস্বরে বিদ্রূপ ও শ্রেয়ের আভাস।

হাজারি লজ্জিত ও অপ্রতিভভাবে উত্তর দিল—কুসুম? হ্যাঁ তা কুসুম—ভালই—

পশ্চাদি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসিল। অন্ততঃ হাজারির তাহাই মনে হইল। পশ্চাদি ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেই বংশী বলিল—যাক, চাকরি তোমার পাকা হয়ে গেল হাজারিদ—সপারের পর আমর' চলে গেলে বোধ হয় কতটা-গিম্মীতে পরামর্শ হয়েছে—চলো এক ছিলাম সাজা যাক।

হাজারি হাসিল। সব দিকেই ভালো কিন্তু পশ্চাদিদ কুসুমের কথাটা তুলিল কেন আবার ইহার মধ্যে? ভারি ছোট মন—হিঃ।

বংশী বাহির হইতে চাপা গলায় ডাকিল—ও হাজারিদা, এসো—টেনে নাও একটান—
গাঁজায় করিয়া দম মারিয়া হাজারি আসিয়া আবার রান্নাঘরে বসিতেই হঠাৎ অতসীর
মুখখানা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। দূর্গা-প্রতিমার মত মেয়ে অতসী। কি
মনটি চমৎকার। তাহার কাকাবাবু গাঁজা খায়, অতসী যদি দেখিত! ওই জন্যেই তো
গ্রামে সে কখনো গাঁজা খায় না। ছেলোপালের সামনে বড় লজ্জার কথা।

অতসী ঢাকা দিতে চাহিয়াছে, হোটেল তাহাকে থলিতে হইবেই। কথাটা একবার
বংশীকে বলিবে? বংশী ও রতন ভাল লোক দু-জনেই, তাহাদের বিশ্বাস করা যায়।
দু-জনেই তাহাকে ভালবাসে।

বংশীকে বলিল—আজকাল রাত্তিরে টক হয়?

—সব দিন হয় না। এখন নেব, সস্তা, নেব, দেওয়া হয়। পরসায় ছ'সাতটা
পাতিনেব্দ।

—একটা কিছু করে দেখাতে হবে তো? বড়ির টক করবো ভেবেছিলুম—

—তুমি ভাবলে কি হবে? পান্নাদিদি पास করলে তবে তো হাঁড়িতে উঠবে। ভুলে
গেলে নাকি আইনকানুন, হাজারিদা?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—বংশী, একটু চা করে খেয়ে নিলে
হাত না? আছে তোড়জোড়?

বংশী বলিল—খাবে? আমি দিচ্ছি সব ঠিক করে। ডাল চাড়িয়ে গরম জল এই
ঘটিতে কেটে রেখে হাতা দিয়ে। চিনি আছে, চা অনিয়ে নিচ্ছি—মনে আছে আর বছর
আমাদের চা খাওয়া? আদার রস করেও দেবো এখন—

আশ্চর্যের মধ্যে হাজারি ও বংশী মনের অনন্দে কলাইকরা বাটি করিয়া চা খাইতে-
ছিল। ভূতগত খাটুনির মধ্যেও ইহাতেই আনন্দ কি কম? হাজারি একদৃষ্টে আগুনের
দিকে চাহিয়া চিন্তিত মুখে বলিল—যেখানেই যার মন ঢেকে, বকলে বংশী। গোপাল-
নগরে সন্দেবেলা বেজ ওদের মন্দিরে ঠাকুরের শেতল হয়—তার সন্দেশ, ফল কাটা, মৃগের
ডাল ভিজ়ে খেতে দিত আমাকে। চা আমি করে নিতাম উনুনে। কিন্তু তাতে কি এমন
মজা ছিল? একা একা বসে রান্নাঘরে চা আর খাবার খেতাম, মন হু হু করতো। খেয়ে
সুখ ছিল না—আজ শুখ, চা খাচ্ছি, তাই যেন কত মিষ্টি!

রাত হইয়াছে, স্টেশনের প্রাটফর্ম একখানা গাড়ীর আওয়াজ পাইয়া হাজারি বলিল
—ও বংশী কেণ্টনগর এলো যে! ডালে কাটা দিয়ে নাও—

সঙ্গে সঙ্গে গোবরা খাবার ঘর হইতে হাঁকিল—খাড় কেলাস দু-খালা—উত্তেজনার
হাজারির সরাদেই কেমন করিয়া উঠিল। কি কাজের ভিড়, কি লোকজনের হৈ চৈ, কি
ব্যস্ততা—ইহার মাঝেই তো মজা। তা নয়, গোপালনগরের মত পাড়গাঁজায়গায় কুণ্ডদের
বহু নিস্তব্ধ অট্টালিকার মধ্যে নিস্তব্ধ রান্নাঘরের কোণে বসিয়া কড়িকাঠ গুণিতে গুণিতে
আর বাড়ীর পিছনের বাগানের তেঁতল গাছে বাদুড় ঝোল্লা ডালপালার দিকে চাহিয়া
চাহিয়া রান্না করা—সে কি তাহার পোষার! সে হইল শহরের মান্দা।

সংক্রান্তির পরের দিন কুসুমের ষষ্ঠী বেলা প্রায় বায়োটোর সময় সে নিমন্তণ রাখিতে
গেল। বংশী ঠাকুরকে বলিয়া একটা সকাল সকাল হোটেল হইতে বাতিন হইল।

কুসুম গোয়ালঘরের নতুন উনুনে আলাদা করিয়া কপির ডালনা রাখিতেছে—এক-
খানা কলার পাতায় খনকতক বেগুন ভজা ও একটা পাথরের খোঁরায় জোলার ডাল।
শুদ্ধাচারে সব করিতে হইতেছে বলিয়াই পাথরের খোঁরা ও কলাপাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা
—হাজারি দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—কুসুমের কাণ্ড দ্যাখো! থাকি হোটেল

—কত ছোঁয়ালেপা হয়ে যায় তার নেই ঠিক—ও আবার নেয়ে ধুয়ে ধোয়া কাপড় পরে গরুর-ঠাকুরের মত যত্ন করে রাখতে বসেচে।

কুসুম সলজ্জ হাসিয়া বলিল—জ্যাঠামশায়, এখনও হয়নি। একটু দেরি আছে—আমি কিন্তু তরকারি সব রেখেছি—আপনি শৃদ্ধ বসে যাবেন—

হাজারি বলিল—তুমি তরকারি রাখলে যে বড়! সে কথা তো ছিল না! আমি তোমার তরকারি খাবো কেন?

—ঠকাত্তে পারবেন না জ্যাঠামশাই! কোনো তরকারিতে নুন দিইনি। নুন না দিলে খেতে আপনার আপত্তি কি? ভাবলাম আপনি অত বেলায় এসে তরকারি রাখবেন সে বড় কষ্ট হবে—লুচি ভাজার আর কি হাঙ্গামা, দেরিই তো হবে তরকারি রাখতে! তাই নিয়ে এসে—

—নুন দাওনি! না মা তুমি হাসালে দেখছি। আলদা তরকারি খাওয়াবে তোমার বাড়ী?

—আর গোয়ালার মেয়ে হয়ে আমি নিজের হাতের রান্না তরকারি খাইয়ে আপনার জাত মেরে দেবো—নরকে পচতে হবে না আমাকে তার জন্যে?

হাজারি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, মাও গরদাটা। মেখে নিই ততক্ষণ—

—সব ঠিক আছে জ্যাঠামশাই। কিছু করতে হবে না আপনাকে। আপনি বয়ঃশৃদ্ধ নেচি কেটে লুচিগুলো বেলে দিন—কপিটা হয়ে গেলেই চট্টনি রাখিব—তারপর লুচি ভেজে গরম গরম—ওতে কি জ্যাঠামশায়?...ও কি?

হাজারি গায়ের চাদরের ভিতর হইতে একটা শালপাতার ঠোঙা বাহির করিতে করিতে আমতা আমতা করিয়া বলিল—এই কিছু নতুন গড়ের সন্দেশ—আজ পয়লা তারিখে ও মাসের কাদিনের মাইনেটা দিলে কি না—তাই ভাবলাম একটুখানি মিষ্টি—

কুসুম রাগ করিয়া বলিল—এ আপনার বড় অন্যায়! কিন্তু জ্যাঠামশায়। আপনার এই সবে চাকুরির মাইনে—আমার জন্যে খরচ করে সন্দেশ না কিনলে আর চলতো না? আপনার দণ্ড করতে আমার এখানে সেবা করতে বলছি?...না, এসব কি ছেলেমানুষী আপনার—

হাজারি শালপাতার ঠোঙাটি দাওয়ার প্রান্তে অপরাধীর মত সঙ্কোচের সহিত নামাইয়া রাখিয়া বলিল—আমার কি ইচ্ছে করে না মা, তোমার জন্যে কিছু আনতে? বাবা মেয়েকে খাওয়ার না বড়ী?

হাজারির রকম-সকম দেখিয়া কুসুমের হাসি পাইলেও সে হাসি চাপিয়া রাগের সুরেই বলিল—না ভারি চটে গিয়েছি—পরস হাতে এলেই অমনি খরচ করার জন্যে হাত সুড়সুড় করে বসি? ভারী বড়লোক হয়েছেন বড়ী? ও মাসের সাতটা দিন কাজ করে কত মাইনে পেয়েছেন যে এক টাকার সন্দেশ আনলেন অমনি? হাজারি চুপ করিয়া অপ্রতিভ মুখে বসিয়া রহিল।

—অসুন ইদিকে, এই আসনখানায় বসুন, মজদাটা নেচি করুন এবার—মা কাহাকে অত বিকতেছে দেখিতে কুসুমের ছেলে-মেয়ে কোথা হইতে আসিয়া সামনের উঠানে দাঁড়াইতেই হাজারি ঠোঙা হইতে সন্দেশ লইয়া তাহাদের হাতে কিছু কিছু দিয়া বলিল—যাক, নাতিন-তনী তো আগে খাক—মেয়ে না খায় বুঝবে পরে—

পরে কুসুমের দিকে ফিরিয়া বলিল—নাও হাত পাতো, আর রাগ করে না—

কুসুম এবার আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না। বলিল—আমি রাখতে রাখতে খাব?

—কেন আলগোছে ?

—না।

—কেন ?

—আমি বড়ো মাগী, ভোগের আগে পেরসাদ পেয়ে বসে থাকি আর কি !

হাজারি বুকিল তাহার খাওয়া না হইয়া গেলে কুসুম কিছই খাইবে না। সে বিনা বাকবায়ে লুচির ময়দা লইয়া বসিয়া গেল।...

কুসুম বলিল—হোটেল খুলবার কি করলেন ?

—গোপাল ঘোষের তানাকের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা ন'টাকা ভাড়া বলে। দেখে ঘরখানা ?

কুসুম উৎকল হইয়া বলিল—কবে খুলবেন ?

—সামনের মাসে। টাকা দেবে তো ?

কুসুম গলার সুর নীচু করিয়া বলিল—আস্তে আস্তে। কেউ শুনবে—

—তোমার শাশুড়ী কই ?

—আমি যেতে পারলাম না বাইরে। তাই দুখ নিয়ে বেরিয়েছে—এল বলে।

—বাত সেয়েছে ?

—মরচের মাদুলী নিয়ে এখন ভাল আছে। আগে মধ্যে দিনকতক পঙ্গু হয়ে পড়েছিল—তার চেয়ে চের ভাল। আপনার জয়গা করে দিই—ওগুলো ভেজে ফেলুন—গরম গরম দেবো—

হাজারি খাইতে বসিল। কুসুম কাছে বসিয়া কখনও লাচি, কখনও তরকারি দিতে দিতে বলিল—আপনি তরকারিতে বেশী করে নুন মেখে খান—

—রান্না চমৎকার হয়েছে মা—

—থাক আপনার আর—

—হোটেল যেদিন খুলবো, সেদিন তোমায় নিজের হাতে রেখে খাওয়াবো—

—না। ও সব করতে দেবো না। বুঝেসুঝে চলতে হবে না ? টাকা নিয়ে ভুতো-নন্দি কাণ্ড করবেন ?

—কিছু করবো না ! তুমি চেন না আমায়।

—আমার জন্যে এক পরসা খরচ করতে পাবেন না আপনি বলে দিচ্ছি ! তাহ'লে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ করে দেবো—ঠিক।

পনেরো দিন পরে হাজারি স্বগ্রামে সংসারের খরচপত্র দিতে গেল। বৈকালে হরি-বাবুর বাড়ী বেড়াইতে গিয়া দেখিল হরিবাবু বৈঠকখানায় আরও দুটি অপরিচিত ভদ্র-লোকের সহিত বসিয়া কথা বলিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে এস হাজারি, বসো বসো। এরা এসেছেন কলকাতা থেকে অতসীকে দেখতে—তুমি এসেছ ভালই হয়েছে। রাতে আমার এখানে থেও আজ—

অতসী তাহা হইলে বিবাহ ? যদি ইতিমধ্যে তার বিবাহ হইয়া যায়, সে শ্বশুর-বাড়ী চলিয়া গেলে টাকাকড়ির ব্যাপার চাপা পড়িয়া যাইবে। হাজারি একটু দমিয়া গেল।

আধঘণ্টা পরে হরিবাবু বলিলেন—আমি সম্বাদিকটা সেরে আসি—আপনাদের তত্ত্বক্ষণ চা দিয়ে যাক।

ভদ্রলোক দুইজন বলিলেন—তিনি ফিরিয়া আসিলে একত্রে চা খাওয়া যাইবে। তাহারো তত্ত্বক্ষণ একবার নদীর ধারে বেড়াইয়া আসিবেন।

অল্পক্ষণ পরেই অতসী আসিয়া বৈঠকখানায় বাড়ীর ভিতরের দিকের দরজা হইতে

একবার সন্তর্পণে উর্ণিক মারিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল।

—এসো এসো মা। ভাল আছ?

—আপনি ভাল আছেন কাকাবাবু? গোপালনগর থেকে আসছেন?

—না মা। আমি গোপালনগরে আর নেই তো? রাণাঘাটের সেই হোটেলের কাজে আবার নিয়োজিত। ওরা ডেকে বহাল করলে।

—করবে না? আপনার মত লোক পাবে কোথায়? আমায় এবার একটা কিছু শিখিয়ে দিলে খান, কাকাবাবু। আপনার নাম করবো চিরকাল।

—মা, এ হাতে কলমের জিনিস। বলে দিলে তো হবে না, দেখিয়ে দিতে হবে। তার সুবিধে হবে কি? আমি এর আগেও তোমাকে তো বলেছি একথা।

—কাল আপনার বাড়ী যাবো এখন। টেঁপকে বলবেন। তাকে নিয়ে এলেন না কেন? তাকে নিয়ে আসবেন, সেও আমাদের এখানে রাতে থাকবে।

অতসী একটু পরেই চলিয়া গেল, কারণ আগন্তুক ভদ্রলোক দুটির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল বাড়ীর বাহিরে রাস্তার দিকে।

পরদিন সকালে টেঁপের মা উঠান খাট দিতেছে এমন সময়ে অতসী বাড়ীর উঠানের মাচাতলা হইতে ডাকিল—টেঁপ, ও টেঁপ—

টেঁপের মা তাড়াতাড়ি হাতের কাটা ফেলিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের মেয়ে অতসী গ্রামের কাহারও বাড়ী বড় একটা ব্যয় না, তাহাদের মত গরীব লোকের বাড়ী যে যাতায়াত করিতেছে—ইহা ভাণ্ডার কথাও বটে, গম্ব করিয়া লোকের কাছে পরিচয় দিবার মত কথাও বটে।

হাসিয়া বলিল—টেঁপ বাসন নিয়ে পুকুরে গিয়েছে—এসো বসো মা।

—কাকাবাবু কোথায়?

হাজারি কাল রাতে অতসীদের বাড়ী গুরুতর আহার করিলেও আজ হাঁটয়া তিন ক্রোশ পথ রাণাঘাট যাইবে, এই ওজুহাতে বড় এক বাটি চালভাজা নুন লক্ষা সহযোগে ওদিকে দাওয়ায় বাসিয়া চক্ষণ করিতেছিল—অতসী পাছে এদিকে আসিয়া পড়ে এবং তাহার চালভাজা খাওয়া দেখিয়া ফেলে সেই ভয়ে বাটিটা সে তাড়াতাড়ি কোঁচায় কাপড় দিয়া চাপা দিল।

অতসী আসিয়া বলিল—কই কাকাবাবু কোন্ দিকে বসে?

ও, খুব সময়ে চালভাজার বাটি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে সে।... অতসী তাহাকে রান্সস ভাবিত—রাতের ওই ভীষণ খাওয়ার পরে সকাল হইতে না হইতেই—

—এই যে মা—কি মনে করে এত সকালে?

—আপনি আমাদের বাড়ী দুপুরে থাকেন তাই বলতে বলে দিলেন বাবা—

—না মা আমি এখনি বেরুছি রাণাঘাট—ছুটি তো নেই—আর কাল রাতে যে খাওয়া হয়েছে তাত—

—তবে টেঁপ আর খড়ীমা থাকেন—ওদের নিয়ন্ত্রণ—আমি বলে যাছি ওদের। বলিয়া অতসী দাওয়ায় উঠিয়া নিজেই পিঁড়ি পাতিয়া বাসিয়া গেল দেখিয়া হাজারি প্রমাদ গণিল। একে সময় নাই, দশটার মধ্যে হোটেলের পোর্টিয়ায় রান্স চাপাইতে হইবে। এক বাটি চালভাজা চিবাইতেও ত্রো সময় লাগে! হতভাগা মেয়েটা সব মাটি করিল।...বাটিটা লুকাইয়া বাসিয়া থাকাই বা কতক্ষণ চলে!

অতসী বলিল—কাকাবাবু, আমার সঙ্গে যদি আপনার আর দেখা না হয়?

—কেন দেখা হবে না?

অতসী লাজুক মাথের বলিল—ধরুন যদি আমি—এখান থেকে যদি—

—বুঝেছি মা, ভালই তো, আনন্দের কথাই তো।

—আপনারা তাড়াত্তে পারলে বাঁচেন তা জানিই। মার মুখেও সেই এক কথা, বাবার মুখেও সেই এক কথা। সে যা হয় হবে আমি তা বলছি নে। আমি বলছি আপনি আজ থেকে যান, আমি যে কথা দিয়েছিলাম আপনার কাছে—সেই টাকা, মনে আছে তো? আপনাকে তা আজ দিগ্লে দিই। যদি বলেন তো এখনি আমি। আমার মনের ভার কমে যায়। তারপর যেখানে আপনারা আমার বিদেশ করে দেন দেবেন—

—ওকি মা। বিদেশ তোমার কেউ করছে না। এমন কথা বলতে নেই!...কিন্তু টাকা নিতান্তই দেবে তা'হলে?

—যখন বলছি, তখন আপনি কি ভেবেছিলেন কাকাবাবু, আমি মিথ্যে বলছি?

—তা ভাবিনি—আচ্ছা ধরো এমন তো হতে পারে, আমি হোটেল খুলে লোকসান দিলাম, তখন তোমার টাকা তো শোধ দিতে পারবো না?

—আমি তো বলছি, না দিতে পারেন তাই কি?...আপনি বসুন, আমি টাকা নিয়ে আসি—

অশ্বষাটার মধ্যে অতসী ফিরিল। সন্তর্পণে আঁচলের গেরো খুলিয়া তাহাকে দুইশত টাকার খুচরা নোট গনিয়া দিতে দিতে বলিল—এই রইল। আমার টাকা ফেরত দিতে হবে না। টেঁপির বিয়ে দেবেন সে টাকায়। আমি যাই, লুকিয়ে চলে এসেছি, বাবা খুঁজবেন আবার।

রাণাঘাট ঘাইতে সারাপথ হাজারি অন্যমনস্কভাবে চলিল...

বেশ মেয়ে অতসী ভগবান ওর ভাল করুন। তাহার মন বলিতেছে ওর হাত দিয়া যে টাকা আসিয়াছে—সে টাকায় বাবসা খুলিলে লোকসান যাইবে না। স্বয়ং লক্ষ্মী যেন তাহার হাতে আসিয়া টাকা গুঁজিয়া দিয়া গেলেন।.....

হোটলে পৌঁছিয়া সে দেখিল রামাধরে বংশী ঠাকুর ডাল চাপাইয়া একা বসিয়া। তাহাকে দেখিয়া বলিল—আরে এসো হাজারি-দা, বস বেলো করলে যে! বড় ডেকে ভাতটা চাপাও—নেবে নাকি একটু দম দিয়ে?

—তা নাও না? সাজো গিয়ে—আমি ডাল দেখছি—

একটু পরে গাঁজার কলিকাটি হাজারির হাতে দিয়া বংশী বলিল—একটা বড় কাজের বায়না এসেছে, নেবে? আন্দুলের ঘোষেদের বাড়ী রাস হবে—সাতদিনের ঠিকে কাজ। বৌদে ভিয়েন, সন্দেহ ভিয়েন, রান্না এই সব। দুটোকা মজার দিন—খোরাকি বাদে—

হাজারি বলিল—বংশী একটা কথা বলি তোমায়। আমি হোটেল খুলছি রাণা-ঘাটের বাজারে। কাউকে বোলো না কথাটা। তোমাকে আসতে হবে আমার হোটলে। কথাটা ঠিক শুনিয়াছে বলিয়া বংশীর যেন মনে হইল না। সে অবাক হইয়া উহার দিকে চাইয়া থাকিয়া বলিল—হোটেল খুলবে? তুমি!

—হ্যাঁ, আমি না কে? তোমার বেহাই?

বংশী বলিল—কি পালের মত বলছ হাজারি-দা? কলকে রাখো, আর টান দিও না। রেলবাজারে একটা হোটেল খুলতে কত টাকা লাগে তুমি জানো?

—কত টাকা বলে তোমার মনে হয়?

—পাঁচশো টাকার কম নয়।

—চারশোতে হয় না?

—আপাততঃ চলবে—কিন্তু কে তোমার চারশো টাকা—

উত্তরে কোঁচার কাপড়ের গেরো খুলিয়া হাজারি বংশীকে নোটের তাড়া দেখাইয়া

বলিল—এই দেখছো তো দুশো টাকা এতে আছে। যোগাড় করে এনেছি। এখন লাগে গাছকোমর বেঁধে—তোমার অংশ থাকবে যদি প্রাপ্যপণে চালাতে পারো—তোমার ফাঁক দেবো না। আজ থেকেই বাড়ী দেখ—পনেরো টাকা পর্যন্ত ভাড়া দেবো—আর দুশো টাকাও যোগাড় আছে।

বংশী ঠাকুর মূখের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ করিয়া বলিল—ভ্যালো আমার মানিক রে। হাজারি-দা এসো তোমায় কোলে করে নাচি। এক অস্ত্রে বেচু চক্ৰান্তি বধ, পদ্মাদিদি, বধ, বদ, বাঁড়ুয্যে বধ—

—চূপ, চূপ—চলো ছুটির পর দুজনে ঘর দেখা যাক। তোমাদের দোকানের পাশে ওই ঘরখানা নটকা ভাড়া বলে। জায়গাটা ভাল। আচ্ছা, বাজার কেন্দ্র, বংশী?

—বাজার ভালো। নতুন আলু সস্তা হোলে আরও সুবিধে হবে। নতুন আলু উঠলো বলে। কেবল মাছটা এখনও আত্রা—

—ঘর দেখার পর একটা ফর্দ করে ফেলা যাক এসো। খালা বাসন, বালতি, জালা শিলনোড়া, বর্টি—

—অজ খাওয়াও হাজারি-দা। মাইরি, একটা কাজের মত কাজ করলে। আচ্ছা টাকা পেনে কোথায় বল না?

—পরে বলবো সব। তার চের সময় আছে! এখন আগেকার কাজ আগে করো। পদ্মকি হঠাৎ রান্নাঘরে ঢুকিয়া বলিল—বেশ তো দুটিতে খোসগল্প চলছে। উদিকে মাছ ডাঙর, তরকারি ডাঙর—এখনি লোক খেতে আসবে—

গোবরা চাকর হাঁকিল—থান্ড কেলাস একথানা—

পদ্মকি বলিল—ওই! এলো তো? এখনও মাছ ভাজা পর্যন্ত হোল না যে তাই দিয়ে ভাত দেবে। এদিকে গাঁজার ধোঁয়ায় তো রান্নাঘর অন্ধকার—সব ভাড়াতে হবে তবে হোটেল চলবে। কতবার খেয়েদেয়ে নেই কাজ তাই স্বত হাড়হাভাতে উনপাঁজুরে গাঁজাখোর আবার জুটিয়ে এনে হাতাবেড়ি হাতে দিয়েছে—

বংশী ঠাকুর বলিল—রাগ করো কেন পদ্মাদিদি, কাল রাতের বাসি মাছ ভেজে রেখেছি—থান্ড কেলাসের খন্দের যারা সকালে খায়, তাই চিরকাল খেয়ে আসছে।

হাজারি বংশীর দিকে চাহিয়া বলিল—না বংশী, দই এনে দাও সেও ভাল। বাসি মাছ দিও না—ওতে নাম খারাপ হয়ে যায়—ও থাক।

পদ্মকি খাঁজের সহিত বলিল—দইয়ের পয়সা তুমি দিও তবে ঠাকুর। হোটেল থেকে দেওয়া হবে না। তুমি বেলা করে বাড়ী থেকে এলে বলেই মাছ হোল না। বংশী ঠাকুর একা কত দিকে যাবে?

হাজারি চূপ করিয়া রহিল।

হোটেলের ছুটির পর হাজারি চণীঘাটে যাইবার পথে রাধাবল্লভতল্লার বার বার নমস্কার করিয়া গেল। ঠাকুর রাধাবল্লভ এতদিন পরে বৈশ্ব মূখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। তাহার সেই প্রিয় গাছটির তলয় বসিয়া হাজারি কত কি কথা ভাবিতে লাগিল। অতসী টাকা দিয়া দিয়াছে, তাহার বাড়ী বহিয়া আসিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে—হয়তো সে হোটেল খুলিতে দেরি করিত, কিন্তু আর দেরি করা চলিবে না। অতসী-মায়ের কাছে কথা দিয়াছে, সে কথা রাখিতে হইবেই তাহাকে।

রান ঘাট বেশ লাগে তাহার। বেচুবাবুর হোটেল তো একমাত্র জায়গা যেখানে তাহার মন ভাল থাকে। জীবনটা শান্তিতে কাটাইতেছি বলিয়া মনে হয়। এই রান্নাঘাটের রেল-বাজার ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না। এখানেই হোটেল খুলিবে, অন্যত্র নয়।

বৈকালের দিকে সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম বলিল—অজকে এলেন?

আসুন, বসুন।

হাজারি হাসিমুখে বলিল—একটা জিনিস রাখতে হবে মা।

—কি?

হাজারি পেট-কোঁচড় হইতে দু'শো টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল—রেখে দাও।

কুসুম অবাক হইয়া বলিল—কোথায় পেলেন?

—ভগবান দিয়েছেন। হোটেল খুলবার রেষ্ট জুটিয়ে দিয়েছেন এতদিন-পরে—এই দু'শো। আর তোমার দু'শো, সামনের মাসেই খুলবো ভাবছি।

—এ টাকা কে দিলে জাঠামশায় বলবেন না আমার?

—তোমার মত আর একটি মা।

—আমি চিনি?

—আমাদের গাঁয়ের বাবুর মেয়ে অতসী। বলবো সে সব কথা আর একদিন, আজ বলা যাচ্ছে। আমি গিয়ে ডেক চাপাই গে—টাকা রেখে দাও এখন।

হোটলে আসিয়া বংশীকে বলিল—তোমার ভাগ্নেটিকে চিঠি লিখে আনাও বংশী। তাকে গদিতে বসতে হবে। লেখাপড়ার কাজ তো আমার বা তোমায় দিয়ে হবে না।

বংশী বলিল—সে তো বমসেই আছে হাজারি-দা। একটা কাজ পেলে বেঁচে যায়। আমি আজই লিখছি আর ঘর আমি দেখে এসেছি—তমাকের দোকানের পাশে ঘরটা ভাল—ওইটেই নাও। লেগে যাও দুর্গা বলে।

দিন দুই পরে একদিন সকালে পদ্মবি বলিল—ও ঠাকুর, শুনুন রাখো, আজ কোথাও যেও না সব ছুটির পরে। আজ ও-বেলা সত্যনারায়ণের সিমি—খন্দেরদের ভাত দেবার সময় বলে দিও ও-বেলা যেন থাকে—আর তোমরা খেয়ে-দেয়ে আমার সঙ্গে বেরুবে সত্যনারায়ণের বাজার করতে।

বংশী ঠাকুর হাজারির দিকে চাইয়া হাসিল—অবশ্য পদ্মবি চলিয়া গেলে।

ব্যপারটা এই, হোটেলের এই যে সত্যনারায়ণের পূজা, ইহা ইহাদের একটি ব্যবসা। বাহারা মাসিক হিসাবে হোটলে খায় তাহাদের নিকট হইতে পূজার নাম করিয়া চাঁদা বা প্রণামী আদায় হয়। আদায়ী টাকার সব অংশ ব্যয় করা হয় না বলিয়াই হাজারি বা বংশীর ধারণা। অথচ, সত্যনারায়ণের প্রসাদের লোভ দেখাইয়া দৈনিক নগদ খরিস্দের বাহারা তাহাদেরও রাত্রে আনিবার চেষ্টা করা হয়—কারণ এমন অনেক নগদ খরিস্দের আছে, বাহারা একবেলা হোটলে খাইয়া যায়, দু-বেলা আসে না।

বংশী ঠাকুর পরিবেশনের সময় প্রত্যেক ঠিকা খরিস্দেরকে মোলারেম হারিস হাসিয়া বলিতে লাগিল—আজ্ঞে ববু, ও-বেলা সত্যনারায়ণ হবে হোটলে আসবেন ও-বেলা—অবিশ্য করে আসবেন—

বাহিরে গদির ঘরে বেঁচু চক্রান্ত ও খরিস্দেরদিগকে ঠিক অমনি বলিতে লাগিল।

বংশী ঠাকুর হাজারিকে আড়ালে বলিল—সব ফাঁকির কাজ, এক চিলতে কলার পাতার আগায় এক হাতা করে গড় গোলা আটা আর তার ওপর দুখানা বাতাসা—হয়ে গেল এর নাম তোমার সত্যনারায়ণের সিমি। চামার কোথাকার—

সন্ধ্যার সময় পূর্ণ ভট্টাচার্য সত্যনারায়ণের পূজা করিতে আসিলেন। বাসনের ঘরে সত্যনারায়ণের পিঁপড় পাতা হইয়াছে। হোটেলের দুই চাকর মিলিয়া ঢাক ও কাঁসর পিটাইতেছে, পদ্মবি ঘন ঘন শাঁকে ফুঁ পাড়িতেছে—খানিকটা খরিস্দের আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাতেও বটে।

স্টেশনে যে চাকর 'হি-ই-ই-ম্' হোটেল-ল' বলিয়া চেঁচায়, তাহাকেও বলিয়া

দেওয়া হইয়াছে, সে যাত্রীদের প্রত্যেককে বলিতেছে—‘আসুন বাবু, সিন্ধি পেরসাদ হচ্ছেন। হোটেলের খাওয়ার বস্তু জুড়ু আজগে—বসুন বাবু—’

যাহারা নগদ পয়সার খরিস্কার তাহারা ভাবিতেছে—অন্য হোটেলেরও তো পয়সা দিয়া খাইবে যখন তখন সত্যনারায়ণের প্রসাদ ফাউ যদি পাওয়া যায়, বেচু চক্রান্তির হোটেলেরই যাওয়া যাক্ না কেন। ফলে যদু বাঁড়ুবার হোটেলের দৈনিক নগদ খরিস্কার যাহারা, তাহারাও অনেকে আসিয়া জুটিতেছে এই হোটেলের। এদিকে নগদ খরিস্কারদের জন্য ব্যবস্থা এই যে, তাহাদের সিন্ধি খাইতে দেওয়া হইবে ভাতের পাতে অর্থাৎ টীকট কিরিয়া ভাত খাইতে ঢুকিলে তবে। নতুবা সিন্ধিটুকু খাইয়া লইয়াই যদি খরিস্কার পালায়?

মাসিক খরিস্কারের জন্য অন্য প্রকার ব্যবস্থা। তাহারা চাঁদা দিয়াছে, বিশেষতঃ তাহাদের খাতির করাও দরকার। পূজা সাঙ্গ হইলে তাহাদের সকলকে একত্র বসাইয়া প্রসাদ খাইতে দেওয়া হইল—বেচু চক্রান্তি নিজ প্রত্যেকের কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তাহারা আর একটু করিয়া প্রসাদ লইবে কি না।

যখন ওদিকে মাসিক খরিস্কারগণকে সিন্ধি বিতরণ করা হইতেছে, সেই সময় হাজারি দেখিল রাস্তার উপর যতীন মজুমদার দাঁড়াইয়া হাঁ করিয়া তাহাদের হোটেলের দিকে চাহিয়া আছে। সেই যতীন...

হাজারির মনে হইল লোকটার অবস্থা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন অনাহারশীর্ণ চেহারা। সে ডাকিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, কেমন আছেন?

যতীন মজুমদার অবাধ হইয়া বলিল—কে হাজারি নাকি? তুমি আবার কবে এলে এখানে?

—সে অনেক কথা বলবো এখন। আসুন না—আসুন—

যতীন ইতস্ততঃ করিয়া রামাখরের পাশে বেড়ার গায়ের দরজা দিয়া হোটেলের ঢুকিয়া রামাখরের দোরের আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারির দেখিল তাহার পায়ে জুতা নাই, গায়ে অতি মলিন উড়ানি, পরনের ধূতি-খানিও তদ্রূপ। আগের চেয়ে রোগাও হইয়া গিয়াছে লোকটা। দারিদ্র্য ও অভাবের ছাপ চোখে মুখে বেশ পরিস্ফুট।

যতীন কার্ভহাসি হাসিয়া বলিল—আর, তোমাদের এখানে বৃদ্ধি সত্যনারায়ণ হচ্ছে আজগে? আগে আমিও কত এসেছি খেয়েছি—

—তা থাকেন না? আপনি তো ছিলেন বারোমাসের বাঁধা খন্দের—তা আসুন পেরসাদ খেয়ে যান—

যতীন ভদ্রতা করিয়া বলিল—না না, থাক্ থাক্—তার জন্যে আর কি হয়েছে—

হাজারি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল কেহ কোনোদিকে নাই। সবাই খাবার ঘরে মাসিক খরিস্কারের আদর-আপায়ন করিতে রাস্তা—সে কলার পাতে পাতিয়া যতীনকে বসাইল এবং পাশে বাসনের ঘর হইতে বড় বাটির একবাটি সত্যনারায়ণের সিন্ধি, একমুঠা বাতাসা ও দুটি পাকা কলা আনিয়া যতীনের পাতে দিয়া বলিল—একটু পেরসাদ খেয়ে নিন—

যতীন মজুমদার দ্বিধা না করিয়া সিন্ধির সহিত কলা দুটি চটকাইয়া মাখিয়া লইয়া যেভাবে গোণ্ডাসে গিলিতে লাগিল তাহাতে হাজারির মনে হইল লোকটা সত্যই যথেষ্ট ক্ষুধার্ত ছিল, বোধ হয় ওবেলা আহার জোটে নাই। তিন-চার গ্রাসে অতখানি সিন্ধি সে নিঃশেষে উড়াইয়া দিল।

হাজারি বলিল—আর একটু নেবেন?

যতীন পূর্বের মত ভদ্রতার সুরে বলিল—না না, থাক্ থাক্ আর কেন—

হাজারি আরও এক বাটি সিমি আনিয়া পাতে ঢালিয়া দিতে যতীনের মূখচোখে যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তাহার খাওয়া অর্দ্ধেক হইয়াছে এমন সময় পশ্মাঝি রান্নাঘরের দোরে আসিয়া হাজারিকে কি একটা বলিতে গেল এবং গেগ্ৰাসে ভোজনরত যতীন মজুমদারকে দেখিয়া হঠাৎ ধমাকিয়া দাঁড়াইল। বলিল—ও কে?

হাজারি হাসিয়া বলিল—ও যতীনবাবু, চিনতে পাচ্ছে না পশ্মাদিদি? আমাদের পুরোনো বাবু। যাঁচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে, তা আমি বললাম আজ পূজোর দিনটা একটু পেরসাদ পেয়ে যান বাবু—

পশ্মাঝি বলিল—বেশ—বলিয়াই সে ফিরিয়া আবার গিয়া মাসিক খরিদ্দারদের খাবার ঘরে ঢুকিল।

যতীন ততক্ষণ পশ্মাঝিকে কি একটা কথা বলিতে মাইতোঁছিল, কিন্তু সে কথা বলিবার সুযোগ ঘটিল না তাহার। সে খাওয়া শেষ করিয়া এক ঘটি জল চাহিয়া লইয়া খাইয়া চোরের মত খিড়কি দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল।

অতপক্ষণ পরেই গোবরা চাকর আসিয়া বলিল—ঠাকুর, কর্তা তোমাকে ডাকছেন—
হাজারি বিকিয়া ছিল কর্তা কি জন্য তাকে জরুরী তলব দিয়াছেন। সে গিয়া বুঝিল তাহার অনুমান সত্য—কারণ পশ্মাঝি মুখে তার করিয়া গদির ঘরে বেচু চক্রান্তির সামনে দাঁড়াইয়া। বেচু চক্রান্তি বলিলেন—হাজারি, তুমি যতনেটাকে হোটেলে ঢুকিয়ে তাকে বসিয়ে সিমি খাওয়াচ্ছিলে?

পশ্মাঝি হাত নাড়িয়া বলিল—আর খাওয়ানো বলে খাওয়ানো! এক এক গাম্‌লা সিমি দিয়েছে তার পাতে—ইচ্ছে ছিল নরুঁকিয়ে খাওয়াবে, ধর্ম্মের ঢাক বতাসে নড়ে, আমি গিয়ে পড়েছি সেই সময় বড় ডেকু নামলো কি না তাই দেখতে—আমায় দেখে—

হাজারি বিনীত ভাবে বলিল—সত্যনারাণের পেরসাদ বলেই বাবু, দিয়েছিলাম—
আমাদের পুরোনো খন্দের—

বেচু চক্রান্তি দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন—পুরোনো খন্দের? ভারি আমার পুরোনো খন্দের রে? হোটেলে একটা মুর্তো টাকা ফাঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে, ভারি খন্দের আমার! চার মাস বিনি পরমায় খেয়ে গেল একটা আধলা উপড়-হাত করলে না, পরলো নম্বরের জুয়াচোর কোথাকার—খন্দের! তুমি কার হুকুমে তাকে হোটেলে ঢুকতে দিলে শূনি?

পশ্মাঝি বলিল—আমি কোনো কথা বলিয়েই তো পশ্ম বড় মন্দ। এই হাজারি ঠাকুর কি কম শয়তান নাকি—বাবু? আপনি জানেন না সব কথা, সব কথা আপনার কানে তুলতেও আমার ইচ্ছে করে না। নরুঁকিয়ে নরুঁকিয়ে হোটেলে আর্দ্ধেক জিনিস ওঠে ওর এয়ার বকশীদের বাড়ী। যতনে ঠাকুর ওর এয়ার বকশেন না আপনি? বহাল করেন লোক, তখন আমি কেউ নই—কিন্তু হাতে হাতে ধরে দেবার বেলা এই জন্য না হোলোও দেখি চলে না—এই দেখুন আবার চর-চামার শব্দ, যদি না হয় হোটেলে, তবে আমার নাম—

বেচু চক্রান্তি বলিলেন—এটা তোমার নিজের হোটেল নয় যে তুমি হাজারি ঠাকুর এখানে যা খুশি করবে। নিজের মত এখানে খাটালে চলবে না জেনো। তোমার আট আনা জরিমানা হোল।

হাজারি বলিল—বেশ বাবু, আপনার বিচারে যদি তাই হয়, করুন জরিমানা। তবে যতীনবাবু আমার এয়ারও নয় বা সে সব কিছুই নয়। এই হোটেলেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ—শুঁক দেখনিও কতদিন। পশ্মাদিদি অনেক অনেক কথা লাগায় আপনার কাছে—

আমি আসছে মাস থেকে আর এখানে চাকরি করবো না।

পদ্মকি এ কথায় অনর্থ বাধাইল। হাত পা নাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিল—
লাগায়? লাগায় তোমার নামে? তুমি যে বড় লগাবার মর্গিগ্য লোক। তাই পদ্ম
লাগিয়ে লাগিয়ে বেড়াচ্ছে তোমার নামে। যত বড় মূখ নয় তত বড় কথা! তোমার মত
লোককে পদ্ম গেরাষার মধ্যে আনে না তা তুমি ভাল করে বুঝো ঠাকুর। যাও না,
তুমি আজই চলে যাও। সামনের মাসে কেন, মাইনেপত্তর চুকিয়ে আজই বিদেয় হও না—
তোমার মত ঠাকুর রেলবাজারে গন্ডায় গন্ডায় মিলাবে—

বেচু চক্ৰবর্তী বলিলেন—চুপ চুপ পদ্ম, চুপ করো। খন্দেরপত্র আসচে বাচ্ছে, ওকথা
এখন থাক। পরে হবে—আচ্ছা তুমি যাও এখন হাজারি ঠাকুর—

অনেক রাত্রে হোটেলের কাজ মিটিল।

শুইবার সময় হাজারি বংশীকে বলিল—দেখলে তো কি রকম অপমানটা আমার
করলে পদ্মাদিদি? তুমিও ছাড়, চল দুজনে বোরিয়ে যাই। দ্যাখো একটা কথা বংশী,
এই হোটেলের ওপর কেমন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল, মুখে বলি বাটে যাই যাই—কিন্তু
যেতে মন সরে না। কতকাল ধরে তুমি আর আমি এখানে আছি ভেবে দ্যাখো তো? এ
যেন আপনার ঘর বাড়ী হয়ে গিয়েচে—তাই না? কিন্তু এরা—বিশেষ করে পদ্মাদিদি
এখানে টিকতে দিলে না—এবার সত্যিই যাবো।

বংশী বলিল—যতীনকে তুমি ডেকে দিলে, না ও আপনি এসেছিল?

—আমি ডেকেছিলাম। ওর অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েচে, আজকাল খেতেই পায়
না। তাই ডাকলাম। বলি পুরোনো খন্দের তো, কত লোক খেয়ে বাচ্ছে, ও একটু সিম্ব
খেয়ে যাক। এই তো আমার অপরাধ।

পরের মাসের শুভ পয়লা তারিখে রেলবাজারে গোপাল ঘোষের তামাকের দোকানের
পাশেই নতুন হোটেলটা খুলিল। টিনের সাইনবোর্ড লেখা আছে—

আদর্শ-হিন্দু হোটেল

হাজারি ঠাকুর নিজের হাতে রান্না করিয়া থাকেন।

ভাত, ডাল, মাছ, মাংস সব রকম প্রস্তুত থাকে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সস্তা।

আসুন! দেখুন!! পরীক্ষা করুন!!

বেচু চক্ৰবর্তীর হোটেলের অনুকরণে সামনেই গদির ঘর, সেখানে বংশী ঠাকুরের
ভাগ্যে সেই ছেলেরটি কাঠের বাক্সের উপর খাতা ফেলিয়া খরিশদারগণের আনুগোনার হিসাব
রাখিতেছে। ভিতরে রান্না করিতেছে বংশী ও হাজারি—বেচু চক্ৰবর্তীর হোটেলের মতই
তিনটি শ্রেণী করা হইয়াছে, সেই রকম টিকিট কিনিয়া ঢুকিতে হয়।

তা নিতান্ত মন্দ নয়। খুঁলিবার দিন দুপুরের খরিশদার হইল ভালই! বংশী
ঋতুভর ঘরে ভাত দিতে আসিয়া ফিরিয়া গিয়া হাজারিকে বলিল—খাড়, কেলাস গ্রিস
খানা। প্রথম দিনের হক্ক যথেষ্ট হয়েছে। ওবেলা মাংস লাগিয়ে দাও।

বহুদিনের বাসনা ঠাকুর রান্নাবান্না পূর্ণ করিয়াছেন। হাজারি এখন হোটেলের
মালিক। বেচু চক্ৰবর্তীর সমান দরের লোক সে আজ। অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, যত জানাশোনা
পরিচিত লোক যে যেখানে আছে—সকলকেই কথাটা বলিয়া বেড়ায়। মনের আনন্দ
চাপিতে না পারিয়া বৈকালে কুসুমের বাড়ী গিয়া হাজারি হইল। কুসুম বলিল—কেমন

চলো হোটেল জ্যাঠামশায় ?

—বেশ খন্দের পাচ্ছি। আমার বক্ত ইচ্ছে তুমি একবার এসে দেখে যাও—তুমি তো অংশীদার—

—যাবো এখন! কাল সকালে যাবো। আপনার মনিব কি বলছে ?

—রেগে কাঁই। ও মাসের মাইনে দেয় নি—না দিক্‌গে, সত্যিই বলছি কুসুম মা, আমার বয়েস কে বলে আটচল্লিশ হয়েছে ? আমার যেন মনে হচ্ছে আমার বয়েস পনের বছর কমে গিয়েছে। হাত-পায়ে বল এসেচে কত ! তুমি আর আমার অতসী মা—তোমরা আর জন্ম আমার কি ছিলে জানিনে, তোমাদের—

কুসুম বাধা দিয়া বলিল—আবার ওই সব কথা বলছেন জ্যাঠামশায় ? আমার টাকা দিইচি সুদ পাবো বলে। এ তো ব্যবসায় টাকা ফেলা—টাকা কি তোরপের মধ্যে থেকে আমার স্বর্ণগণে পিঁদিম দিতো ? বলি নি আমি আপনাকে ? তবে হ্যাঁ, আমাদের বাবুর মেয়ের কথা বা বল্লেন, সে দিয়েচে বটে কোন খাঁই না করে। তার কথা, হাজার বার বলতে পারেন। তার বিশ্বের কি হোল ?

—সামনের সোমবার বিয়ে। চিঠি পেয়েছি—যাচ্ছি ওঁদিন সকালে।

—আমার কাকুর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে এসব টাকাকড়ির কথা যেন বলবেন না সেখানে।

—তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে না মা, যতবার দেখা হয়েছে তোমার নামটি পর্যন্ত কখনো সেখানে ঘণ্ণ করে করি নি। আমারও বাড়ী এ'ড়োশোলা, আমার তোমার কিছু শেখাতে হবে না।

কথামত পরদিন সকালে কুসুম হোটেল দেখিতে গেল। সে দুধ দই লইয়া অনেক বেলা পর্যন্ত পাড়ার পাড়ায় বেড়ায়—তাহার পক্ষে ইহা আশ্চর্যের কথা কিছুই নহে।

হাজারি তাহাকে রান্নাঘরে যত্ন করিয়া বসাইতে গেল—সে কিন্তু দেরের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, বলিল—আমি গুরুঠাকরুন কিছু আসি নে যে আসন পেতে বস্তু করে বসাতে হবে।

হাজারি বলিল—তোমরও তো হোটেল কুসুম-মা—তুমি এর অংশীদারও বটে, মহাজনও বটে। নিজের জিনিস ভাল করে দেখো শোনো। কি হচ্ছে না হচ্ছে তদারক করো—এতে লজ্জা কি ? বংশী চিনে রাখো এ একজন অংশীদার।

এ কথায় কুসুম খুব খুশি হইল—মুখে তাহার অহাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। এমন একটা হোটেলের সে অংশীদার ও মহাজন—এ একটা নতুন জিনিস তাহার জীবনে। এ ভাবে ব্যাপারটা বোধ হয় ভাবিয়া দেখে নাই। হাজারি বলিল—আজন্নাছ রান্না হয়েছে বেশ পাকা রুই। তুমি একটু বোসো মা, ম'ড়োটা নিয়ে যাও।

—না না জ্যাঠামশায়।—ওসব আপনাকে বারণ করে দিইচি না! সকলের মুখ বশিত করে আমি মাহের ম'ড়ো খাবো—বেশ মজার কথা।

—আমি তোমার ব'ড়ো বাবা, তোমাকে খাইয়ে আমার যদি তৃপ্তি হয়, কেন খাবে না বুঝিয়ে দাও।

হোটেলের চাকর হাঁকিল—খাড্‌ কেলাস তিন থালা—

হাজারি বলিল—খন্দের অসছে, বোসো মা একটু। আমি আসছি, বংশী ভাত বেড়ে ফেলো।

আসবার সময় কুসুম সলজ্জ সঙ্কোচের সহিত হাজারির দেওয়া এক কাঁসি মাছ তরকারি লইয়া আসিল।

এক বছর কাটিয়া গিয়াছে।

হাজারি এঁড়ে শোলা হইতে গরুর গাড়ীতে রাণাঘাট ফিরিতেছে। সঙ্গে টেঁপি মা-টেঁপি ও ছেলেমেয়ে। তাহার হোটেলের কাজ আজকাল খুব বাড়িয়া গিয়াছে। রাণাঘাটে বাসা না করিলে আর চলে না।

টেঁপি মা বলিল—আর কতটা আছে হ্যাঁ গা?

—ওই তো সেগুন বাগান দেখা দিয়েছে—এইবার পেঁছে যাবো—

টেঁপি বলিল—বাবা সেখানে নাইবো কোথায়? পুকুর আছে না গাঙ?

—গাঙ আছে, বাসায় টিউব কল আছে।

টেঁপি মা বলিল—তাহলে জল টানতে হবে না পুকুর থেকে। বেঁচে যাই—

ইহারা কখনো শহরে আসে নাই—টেঁপি মার বপের বাড়ী এঁড়েশোলার দু ক্রোশ উত্তরে মণিরামপুর গ্রামে। জন্ম সেখানে, বিবাহ এঁড়েশোলার, শহর দেখিবার একবার সযোগ হইয়াছিল অনেকদিন আগে, অগ্ৰহায়ণ মাসে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে একবার নব্ব্বীপে রাস দেখিতে গিয়াছিল।

হোটেলের কাছেই একখানা একতলা বাড়ী পূর্বে হইতে ঠিক করা ছিল। টেঁপি মা বাড়ী দেখিয়া খুব খুশি হইল। চিরকাল খড়ের ঘরে বাস করিয়া অভ্যাস, কোঠাঘরে বাস এই তাহার প্রথম।

—ক'খানা ঘর গা? রান্নাঘর কোন দিকে? কই তোমার সেই টিউবল দেখি? জল বেশ ওঠে তো? ওরে টেঁপি, গাড়ীর কাপড়গুলো আলাদা করে রেখে দে—একপাশে। ও-সব নিয়ে ছিটি ছোঁয়ানোপা করো না যেন বস্তার মধ্যে থেকে একটা ঘটি আগে বের করে দাও না গো এক ঘটি জল আগে তুলে নিয়ে আসি।

একটু পরে কুসুম আসিয়া চুকিয়া বলিল—ও জেঠিমা, এলেন সব? বাসা পছন্দ হয়েছে তো?

টেঁপি মা কুসুমকে চেনে। গ্রামে তাহাকে কুমারী অবস্থা হইতেই দেখিয়াছে।

বলিল—এসো মা কুসুম, এসো এসো! ভাল আছ তো? এসো এসো কল্যাণ হোক।

হোটেলের চাকর রাখাল এই সময় আসিল। তাহার পিছনে মটের মাথায় এক বস্তা পাখুরে করলা। হাজারিকে বলিল—করলা কোন দিকে নামাবো বাবু?

হাজারি বলিল—করলা আন্লি কেন রে? তাকে যে বলে দিলাম কাঠ আনতে? এরা করলার আঁচ দিতে জানে না।

কুসুম বলিল—করলার উন্ন আছে? আমি আঁচ দিয়ে দিছি। আর শিখে নিতে তো হবে জেঠিমা। করলা সম্ভা গড়বে কাঠের চেয়ে এ শহর-বাজার জায়গায়। আমি একদিনে শিখিয়ে দেবো জেঠিমা।

রাখাল করলা নাম ইয়া বলিল—বাবু, আর কি করতে হবে এখন?

হাজারি বলিল—ভই এখন মসনে—জলটলগুলো তুলে দিনে জিনিসপত্তর গুছিয়ে রেখে তবে যাবি। হোটেলের বাজার এসেছে?

—এসেছে বাবু।

—তা থেকে এবার মত মাছ-তরকারি চান্স-পাঁচ জনের মত নিয়ে অয়। ওবেলা সন্ধ্যা বাজার করলট হবে। আগে জল তুলে দে দিকি।

টেঁপি মা বলিল—ও বে গা?

—ও আমদের হোটেলের চাকর। বাসর কাজও ও করবে, বলে দিইছি।

টেঁপি মা অধাক হইল। তাহাদের নিজের চাকর, সে আবার হাজারিকে 'বাবু' স্বাধন করিতেছে—এ সব ব্যাপার এতই অভিনব যে বিশ্বাস করা শক্ত। গ্রামের মধ্যে

তাহারা ছিল অতি গরীব গৃহস্থ, বিবাহ হইয়া পর্যন্ত বাসন-মাজা, জল-তোলা, স্কার-কাচা, এমন কি ধান ভানা পর্যন্ত সমস্তই গৃহকর্ম সে একা করিয়া আসিয়াছে। মাস চার-পাঁচ হইল দুটি সচ্ছল অল্পের মুখ সে দেখিয়া আসিতেছে, নতুবা আগে আগে পেট ভরিয়া দুটি ভাত খাইতে পাওয়াও সব সময় ঘটিত না।

আর আজ এ কি ঐশ্বর্যের দ্বার হঠাৎ তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল! কোঠা-বাড়ী, চাকর, কলের জল—এ সব স্বপ্ন না সত্য?

রাখাল আসিয়া বলিল—দেখুন তো মা এই মাছ-তরকারিতে হবে না আর কিছু আনবো?

বড় বড় পোনা মাছের দাগা দশ-বারো খানা। টেঁপির মা খুশির সাহিত বলিল—না বাবা আর আনতে হবে না। রাখো ওখানে।

—ওগুলো কুটে দিই মা?

মাছ কুটিয়াও দিতে চায় যে! এ সৌভাগ্যও তাহার অদৃষ্টে ছিল।

হাজারি বলিল—আগে জল ভুলে দে তারপর কুটবি এখন। আগে সব নেয়ে নিই।

কুসুম কয়লার উনুনে আঁচ দিয়া আসিয়া বলিল—জোঠিমা, আপনিও নেয়ে নিন। ততক্ষণ আঁচ ধরে যাক। বেশা প্রায় এগারোটা বাজে। রান্না চাড়িরে দেবার আর দেরি করবার দরকার কি? আমি এবার যাই।

টেঁপির মা বলিল—তুমি এখানে এবেলা থাকে কুসুম।

কুসুম ব্যস্তভাবে বলিল—না না আপনারা এলেন তেঁতেপড়ে এই দুপুরের সময়। এখন কোনোরকমে দুটো ঝোলভাত রেখে আপনারা এবেলা খেয়ে নিন—তার মধ্যে আবার আমার খাওয়ার হাংনামার—

—কিছু হাংনামা হবে না মা। তুমি না খেয়ে যেতে পারবে না। ভাল বেগুন এনেছি গাঁ থেকে, তোমাদের শহরে তেমন বেগুন মিলবে না—বেগুন পোড়াবো এখন। বাপের বাড়ীর বেগুন খেয়ে যাও আজ। কল শটকে যাবে।

হাজারি স্নান সারিয়া বলিল—আমি একবার হোটেল চললাম। তোমরা রান্না চাপাও। আমি দেখে আসি।

আধঘণ্টা পরে হাজারি ফিরিয়া দেখিল টেঁপি ও টেঁপির মা দুজনে উনুনে পরি-য়াই ফুঁ পাড়িতেছে! আঁচ নামিয়া গিয়াছে, তখনও মাছের ঝোল বাকি।

টেঁপির মা বিপন্নমুখে বলিল—ওগো, এ আবার কি হোল, উনুন যে নিবে আসছে। কি করি এখন?

কুসুম বাড়ীতে স্নান করিতে গিয়াছে, রাখাল গিয়াছে হোটেল, কারণ এই সময়টা সেখানে খরিন্দারের ভিড় স্রাবান্ত। এবেলা অমৃততঃ একশত জন খায়। বেচা চক্কি ও ফদ বাঁড়বোর হোটেল কানা হইয়া পড়িয়াছে। হাজারি নিজের হাতে রান্না করে, তাহার রান্নার গুণে—রেলবাজারের যত খরিন্দার সব বড়কিয়াছে তাহার হোটেল। তিনজন ঠাকুর ও চারিজন চাকরে হিম্মাসিম খাইয়া যায়। ইহারা কেহই কয়লার উনুনে আঁচ দেওয়া দরের কথা করলার উনুনই দেখে নাই। আঁচ কমিয়া যাইতে বিষম বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া হাজারির হাসি পাইল। বলিল—শেখো, পাড়গেয়ে ভত হয়ে কতকাল থাকবে। সরে! দিকি। ওর ওপর আর চাটু কয়লা দিতে হয়—এই দেখিয়ে দিই।

টেঁপির মা বলিল—আর তুমি বস্ত শহরে মানুস! তবু যদি এঁড়েশোলা বাড়ী না হোত!

—আমি? আমি আজ সাত বছর এই রাণাঘাটের রেলবাজারে আছি। আমাকে

পাড়াগায়ে বলবে কে? ওকথা ভুলে রাখাগে ছিকের।

টোঁপ বলিল—বাবা এখানে টক আছে? ভূমি দেখেছ?

হাজারি বিশ হাত জলে পড়িয়া গেল। টক বইস্কেপ এখানে আছে বটে কিন্তু বইস্কেপ দেখার শখ কখনও তাহার হয় নাই। কিন্তু টোঁপ আধুনিক, এঁডোশোলার থাকিলে কি হয়, বাংলার কেন পাড়াগায়ে আধুনিকতার ঢেউ বায় নাই?...বিশেষতঃ অতসী তার বন্ধু...অতসীর কাছে অনেক জিনিস সে শুনিয়েছে বা শিখিয়েছে বাহা তাহার বাবা (মা তো নয়ই) জানেও না।

টোঁপের মা বলিল—টক কি গা?

হাজারি আধুনিক হইবার চেষ্টায় গম্ভীর ভাবে বলিল—হবিতে কথা কয়, এই! দেখেছ অনেকবার। দেখবো না আর কেন? হু—

বলিয়া তাচ্ছিল্যের ভাবে সবটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে গেল—কিন্তু টোঁপ পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করিল—কি পালা দেখেছিলে বাবা?

—পালা? তা কি আর মনে আছে! লক্ষ্মণের শক্তি শেল বোধ হয়, হাঁ—লক্ষ্মণের শক্তিশেল।

মনের মধ্যে বহু কণ্ঠে হাতড়াইয়া ছেনেকৈয়া দেখা এক যাত্রার পালার নামটা হাজারি করিয়া দিল। টোঁপ বলিল—লক্ষ্মণের শক্তিশেল আবার কি পালার নাম? গুরুকম নাম তো টকির পালার থাকে না? তাদের নাম আমি শনেচি অতসীদির কাছে, সে তো অন্যরকম—

—হাঁ হাঁ—তুই আর অতসীদি ভারি সব জানিস আর কি! যা—সর দিকি—ওই কয়লার ঝুড়িটা—

—ও মামাবাবু, খাওয়া-দাওয়া হোল—বলিয়া বংশীর ভয়ে সেই সুন্দর ছেলোট বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই টোঁপের মা, পাড়াগায়ে বউ, তাড়তাড়ি মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিতে গেল। টোঁপ কিন্তু নবগত লোকটির দিকে কোতাহলের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হাজারি বলিল—এসো বাবা এসো—ঘোমটা দিচ্ছ কাকে দেখে? ও হেল বংশীর ভাগে। আমার হোটেলের খতাপত্র রাখে। ছেলেরামানুষ—ওকে দেখে আবার ঘোমটা—

বংশীর ভাগিনের আসিয়া টোঁপের মার পায়ের ধলা লইয়া প্রণাম করিল।

হাজারি মেয়েকে বলিল—তোরা নরেন দাদাকে প্রণাম কর টোঁপ। এইটি আমার মেয়ে, বাবা নরেন। ও বেশ লেখাপড়া জানে—সেলাইয়ের কাজটাজ ভাল শিখেছে আমাদের গায়ের ব্যবসার মেয়ের কাছে।

টোঁপের হঠাৎ কেমন লজ্জা করিতে লাগিল। ছেলোট দেখিতে যেমন, এমন চেহারা ছেলে সে কখনো দেখে নাই—কেবল ইহার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা যার অতসীদির বরের। অনেকটা মূখের আদল যেন সেই রকম।

বংশীর ভাগেও তাহার স্বচ্ছন্দ হৃদযাত্রা ভব হারাইয়া ফেলিয়াছে। চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া চাওয়া যেন একটু কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। টোঁপের দিকে তো তেমন চাহিতেই পারিল না।

হাজারি বলিল—মুর্শিদাবাদের গাড়ী থেকে ক'জন নামলো আজ?

—নেমোছিল জনদশেক, তার মধ্যে তিনজনকে বেচু চক্রান্তর চাকর একরকম হাত বরে জোর করেই টেনে নিয়ে গেল। যাক সাতজন আমরা পেয়েছি—আর বনগার টেন থেকে এসেছিল পাঁচজন।

—ইন্টশানে গিয়েছিল কে?

—বুজ ছিল, রাখালও ছিল বনগার গাড়ীর সময়। বুজ বয়ে, বেচু চক্রান্তর চকুর

সঙ্গে খন্দের নিয়ে তার হাতাহাতি হয়ে যেতো আজ।

—না না, দরকার নেই বাবা ওসব। হাজার হোক, আমার পুরোনো মনিব। ওদের খেয়েই এতকাল মানুষ—হোটেলের কাজ শিখিছিও ওদের কাছে। শব্দ রাখতে জানলে তো হোটেল চালানো যায় না বাবা, এ একটা ব্যবসা। কি করে হাট-বাজার করতে হয়, কি করে খন্দের তুষ্ট করতে হয়, কি করে হিসেবপত্র রাখতে হয়—এও তো জানতে হবে। আমি ছ'বছর ওদের ওখানে থেকে কেবল দেখতাম ওরা কি করে চালাচ্ছে। দেখে দেখে শেখা। এখন সব পারি।

বংশীর ভাগ্নে বলিল—আচ্ছা মামীমা, খাওয়া-দাওয়া করুন, আমি আসবো এখন ওবেলা।

হাজারি বলিল—তুমি কাল দুপুরে হোটেল থেকে না—বাসাতে থাকে এখানে। বৃকলে?

বংশীর ভাগ্নে চলিয়া গেলে টেঁপিপ অদৃশ্য়ভাবে হাজারি বলিল—কেমন ছেলোটি দেখলে?

—বেশ ভাল। চমৎকার দেখতে।

—ওর সঙ্গে টেঁপিপ বেশ মানায় না?

—চমৎকার মানায়। তা কি আর হবে! আমাদের অদৃষ্টে কি অমন ছেলে জুটেবে?

—জুটেবে না কেন, জুটে আছে। ওকে আনিয়ে রেখোঁচ হোটেলের ভাবে কি জন্যে? তোমাদের বাবাঘাটের বাসায় আনলাম তবে কি জন্যে?...টেঁপিপকে যেন এখন কিছু—বোঝে তো? কাল ওকে একটু বন্ধ-আতি্যা করো। আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ওর সঙ্গে টেঁপিপ—তা এখন অনেকটা ভরসা পাচ্ছি। ওর বাপের অবস্থা বেশ ভাল, ছেলোটো ম্যাট্রিক পাস। বিয়ে দিয়ে হোটলেই বসিয়ে দেবো—থাক, আমার অংশীদার হয়ে। কাজ শিখে নিক—টেঁপিপও কাছেই রইল আমাদের—বৃকলে না, অনেক মতলব আছে।

টেঁপিপ মা বোকাসোকা মানুষ—অবাক হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার কথা শুনিতো লাগিল।

সন্ধ্যার পরে খবর আসিল স্টেশনে বেচ, চক্কির হোটেলের লোকের সঙ্গে হাজারির চাকরের খরিস্কার লইয়া মারামারি হইয়া গিয়াছে। হাজারির চাকর নাথানি বলিল—বাবু, ওদের হোটেলের চাকর খন্দেরের হাত ধরে টানটানি করে—আমাদের খন্দের, আমাদের হোটলে আসচে—তার হাত ধরে টানবে আর আমাদের হোটেলের নিন্দে করবে। তাই আমার সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে গিয়েছে।

—খন্দের কেমনথার গেছে?

—খন্দের এসেছে আমাদের এখানে। ওদের হোটেলের লোকের আমাদের ওপর আকচ আছে, আমরাই সব খন্দের পাই, ওরা পায় না—এই নিয়েই ঝগড়া, বাবু। ওদের হোটেলের হয়ে এল, বাবু। একটা গাড়ীতেও খন্দের পায় না।

রাত আটটার সময়ে হাজারি সবে ঘাছের কোল উল্টনে চাপাইয়াছে এমন সময় বংশী বলিল—হাজারি-দা, জ্বর খবর আছে। ভোমার আগের কব্জা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন দেখে এসো গে। কোষ হুঁস মারামারি নিয়ে—

—বোলটা তুমি দেখো। আমি এসে মাংস চাপাবো—দেখি কি খবর।

অনেকদিন পরে হাজারি বেচ, চক্কির হোটেলের সেই গদির ঘরটিতে গিয়া দাঁড়াইল। সেই পুরোনো দিনের মনের ভাব সেই মুহূর্তেই তাহাকে পাইয়া বসিল যেন ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গেই। যেন সে রাখুন বাবু, বেচ, চক্কি আজও মনিব।

বেচু চক্রান্ত তাহাকে দেখিয়া খাতির করিবার সূত্রে বলিলেন—আরে এস এস হাজারি এস—এখানে বসো।

বলিয়া গদির এক পাশে হাত দিয়া বাড়িয়া দিলেন, যদিও বাড়িবার কোন আবশ্যক ছিল না। হাজারি দাঁড়াইয়াই রহিল। বলিল—না বাবু, আমি বসবো না। আমার ডেকেছেন কেন?

—এসো, বসোই এসে আগে। বলিচি।

হাজারি জিভ কাটিয়া বলিল—না বাবু, আপনি আমার মনিব ছিলেন এতদিন। আপনার সামনে কি বসতে পারি? বলুন, কি বলবেন—আমি ঠিক আছি।

হাজারির চোখ আপনা-আপনি খাওয়ার ঘরের দিকে গেল। হোটেলের অবস্থা সত্যি খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে। রাত নটা বাজে। আগে আগে এসময় পরিদ্বারের ভিড়ে ঘরে জায়গা থাকিত না—আর এখন লোক কই? হোটেলের জলুসও আগের চেয়ে অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বেচু চক্রান্ত বলিলেন—না, বোসো হাজারি। চা খাও, ওরে কাঙালী, চা নিয়ে আর আমাদের।

হাজারি তবুও বসিতে চাহিল না। চাকর চা দিয়া গেল, হাজারি আড়ালে গিয়া চা খাইয়া আসিল।

বেচু চক্রান্ত দেখিয়া শুনিয়া খুব খুশি হইলেন। হাজারির মাথা ঘুরিয়া যায় নাই হঠাৎ অবস্থাপন্ন হইয়া। কারণ অবস্থাপন্ন যে হাজারি হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি এতদিন হোটেল চালাবার অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝিতে পারেন।

হাজারি বলিল—বাবু, আমার কিছু বলছিলেন?

—হ্যাঁ—বলিছিলাম কি জানো, এক জায়গায় ব্যবসা যখন আমাদের তখন তোমার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নাই তো—তোমার চাকর আজ আমার চাকরকে মেরেচে ইন্টিশানে। এ কেমন কথা?

এই সময় পক্ষ্মি দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হোটেলের চাকরও আসিল।

হাজারি বলিল—আমি তো শুনলাম বাবু আপনার চাকরটা আগে আমার চাকরকে মারে। নাথানি খন্দের নিয়ে আসিছিল এমন সময়—

পক্ষ্মি বলিল—হ্যাঁ তাই বৈকি! তোমাদের নাথানি আমাদের খন্দের ভাগ্যের চেষ্টা করে—আমাদের হোটলে আসিছিল খন্দের, তোমাদের হোটলে যেতে চায় নি—

একথা বিশ্বাস করা যেন বেচু চক্রান্তের পক্ষেও শক্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—শাক, ও নিয়ে আর বগড়া করে কি হবে হাজারির সঙ্গে। হাজারি তো সেখানে ছিল না, দেখেও নি, তবে তোমায় বললাম হাজারি, যাতে আর এমন না হয়—

হাজারি বলিল—বাবু, বেশ আমি রাজী আছি। আপনার হোটেলের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ করলে চলবে না। আপনি আমার পুরোনো মনিব। আসুন, আমরা গাড়ী ভাণ করে নিই। আপনি যে গাড়ীর সময় ইন্টিশানে চাকর পাঠাবেন, আমার হোটেলের চাকর সে সময় যাবে না।

বেচু চক্রান্ত বিস্মিত হইলেন। ব্যবসা জিনিসটাই রেবারের উপর, আড়াআড়ির উপর চলে—তিনি বেশ ভালই জানেন। রাখার চুল পাকাইয়া ফেলিলেন তিনি এই ব্যবসা করিয়া। এখানে হাজারির প্রস্তাব যে কতদূর উদার, তাহা বুঝিতে বেচুর বিলম্ব হইল না। তিনি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—না তা কেন, ইন্টিশান তো আমার একলায় নয়—

—না বাবু, এখন থেকে তাই রইল। মর্শদাবাদ আর বনগাঁর গাড়ীর মধ্যে আপনি

কি নেবেন বলুন—মুর্শিদাবাদ চান, না বনগাঁ চান? আমি সে সময় চাকর পাঠাবো না ইন্টিশানে।

পদ্মকি দোর হইতে সরিয়া গেল।

বেচু চক্ৰটি বলিলেন—তা তুমি যেমন বলো। মুর্শিদাবাদখানাই তবে রাখে আমার। তা আর একটু চা খেয়ে যাবে না?—আচ্ছা, এসো তবে।

হাজারি মনিবকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিল।

পদ্মকি পুনরায় দোরের কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাবু, কি বলে গেল?

—গাড়ী ভাগ করে নিয়ে গেল। মুর্শিদাবাদখানা আমি রেখেছি। যা কিছু লোক আসে, মুর্শিদাবাদ থেকেই আসে—বনগাঁর গাড়ীতে কটা লোক আসে? লোকটা বোকাম, লোক মন্দ নয়। দুর্ভাগ্য নয়।

—আমি আজ সাত বছর দেশে আসিচি আমি জানিনে? গাজা খেয়ে বৃন্দ হয়ে থাকে, হোটেলের ছাই দেখাশুনো করে। রেংগেই মরে, মজা লুটচে বংশী আর বংশীর ভাগ্নে। কাশ তার হাতে।* আমি সব খবর নিইচি তলায় তলায়। বংশীকে আবার এখানে আনুন বাবু, ও হোটেল এক দিনে ভূসিন্যাস হয়ে বসে রয়েছে। বংশীকে ভাগ্যবান লোক লাগান আপনি—আর ওর ভাগ্যটাকেও—

পরদিন দুপুরে বংশীর ভাগ্নে সসজ্জা হাজারির বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল। হাজারি হোটেল হইতে তাহাকে পাঠাইয়া দিল বাটে, কিন্তু নিজের তখন আসিতে পারিল না, অত্যন্ত ভিড় লাগিয়াছে খরিদ্দারের, কারণ সেদিন হাটবার।

মারের আদেশে টেঁপিকে অতিথির সামনে অনেকবার বাহির হইতে হইল। কখনও বা আসন পাতা, কখনও জলের গ্লাসে জল দেওয়া ইত্যাদি। টেঁপি খুব চটপটে চালাক-চতুর মেয়ে, অতসীর শিষ্য—কিন্তু হঠাৎ তাহারও কেমন যেন একটু লজ্জা করিতে লাগিল এই সুন্দর ছেলের সামনে বার বার বাহির হইতে।

বংশীর ভাগ্নেটিও একটু বিস্মিত হইল। হাজারি-মামার পাড়াগাঁয়ের লোক সে জানে—অবস্থাও এতদিন বিশেষ ভাল ছিল না। আজই না হয় হোটেলের ব্যবসারে দূ-পরসার মুখ দেখিতেছে। কিন্তু হাজারি-মামার মেয়ে তো বেশ দেখিতে, তাহার উপর তার চালচলন খরন-খরন যেন স্কুলে পড়া আধুনিক মেয়েছেলের মত। সে কাপড় গুছাইয়া পড়িতে জানে, সাজিতে গুজিতে জানে, তার কথাবার্তার ভঙ্গিটাও বড় চমৎকার।

তাহার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে এমন সময় হাজারি আসিল। বলিল—খাওয়া হয়েছে বাবা, আমি আসতে পারলাম না—আজ আবার ভিড় বড় বেশী।

—ও টেঁপি আমার একটু তেল দে মা, নেয়ে নিই—আর তের ঐ দ্বার শোওয়ার জায়গা করে দে দিকি—পাশের ঘরটাতে একটু গড়িয়ে নাও বাবা।

বংশীর ভাগ্নে গিয়া শইয়াছে—এমন সময় টেঁপি পান দিতে আসিল। পানের ঝিঝ নাই, একখানা ছোট বেকারিতে পান আনিয়াছে। ছেলেরি দেখিল চুন নাই বেকারিতে। লাজুক মুখে বলিল—একটু চুন দিয়ে যাবেন?

টেঁপির সারা দেহ লজ্জার আন্দে কেমন যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার প্রথম কারণ তাহার প্রতি সম্ভ্রমসূচক জিয়াপদের ব্যবহার এই হইল প্রথম। জীবনে ইতিপূর্বে তাহাকে কেহ 'আপনি' 'আজ্ঞে' করিয়া কথা বলে নাই। দ্বিতীয়তঃ কোনও অন্যায়ী তরুণ যুবকও তাহার সহিত ইতিপূর্বে কথা বলে নাই। বলে নাই কি একেবারে! গাঁয়ের রামু-দা, গোপাল-দা, জহর-দা—ইহারাও তাহার সঙ্গে তো কথা বলিত! কিন্তু তাহাতে

এমন আনন্দ তাহার হয় নাই তো কেনোদিন? চুন আনিয়া রেকাবিতে রাখিয়া বলিল—এতে হবে?

—খুব হবে। থাক ওখানেই—ইয়ে, এক গেলাস জল দিয়ে যাবেন?

টোঁপির বেশ লাগিল ছেলোটিকে। কথাবার্তার ধরন যেমন ভাল, গলার সুরটিও তেমন মিষ্ট। যখন জলের গ্লাস আনিল, তখন ইচ্ছা হইতছিল ছেলোটি তাহার সঙ্গে আর একবার কিছু বলে। কিন্তু ছেলোটি এবার আর কিছু বলিল না। টোঁপি জলের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বেলা যখন প্রায় পাঁচটা, বৈকাল অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছে—টোঁপি তখন একবার টোঁক মারিয়া দেখিল, ছেলোটি অঘোরে ঘুমাইতেছে।

ইহা টোঁপির কেমন একটা অহেতুক মেহ আসিল ছেলোটির প্রতি।

আহা, হোটেলের কত রাত পর্যন্ত জাগে! ভাল ঘুম হয় না রাতে!

টোঁপি আসিয়া মাকে বলিল—মা সেই লোকটা এখনও ঘুমুচ্ছে! ডেকে দেবো, না ঘুমবে।

টোঁপির মা বলিল—ঘুমুচ্ছে ঘুমুচ্ না। ডাকবার দরকার কি? চাকরটা কোথায় গেল? ঘুম থেকে উঠলে ওকে কিছু খেতে দিতে হবে। খাবার আনতে দিতাম। উনিও তো বাড়ী নেই।

টোঁপি বলিল—লোকটা চা খায় কিনা জানিনে, তাহলে ঘুম থেকে উঠলে একটু চা করে দিতে পারলে ভাল হোত।

টোঁপির মা চা নিজে কখনো খায় নাই, করিতেও জানে না। আধুনিকা মেয়ের এ প্রস্তাব তাহার মন্দ লাগিল না।

মেয়েকে বলিল—তুই করে দিতে পারবি তো?

মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি যে কি বল মা, হেসে প্রাণ বেরিয়ে যায়—পরে কেমন একটি অপূর্ণ ভাগিতে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া হাসিভরা মুখের চিবুক-খানি বার বার উঠাইয়া-নামাইয়া বলিতে লাগিল—চা কই? চিনি কই? কেটলি কই? চায়ের জল ফুটেবে কিসে? ডিস-পেরালা কই? সে সব আছে কিছ?

টোঁপির মায়ের বড় ভাল লাগিল টোঁপির এই ভাগি। সে সম্মুখে মুগ্ধদৃষ্টিতে মেয়ের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। এমন ভাবে এমন সুন্দর ভাগিতে কথা টোঁপি আর কখনও বলে নাই।

এই সময় হাজারি বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, হোটেলেরই ছিল। বলিল—নরেন কোথায়? ঘুমুচ্ছে নাকি?

টোঁপির মা বলিল—তুমি এককণ ছিলে কোথায়? ওকে একটু খাবার আনিয়া দিতে হবে। আর টোঁপি বলছে, চা করে দিলে হোত।

হাজারির বড় মেহ হইল টোঁপির উপর। সে না জানিয়া যাহাকে আজ যত্ন করিয়া চা খাওয়াইতে চাহিতেছে, তাহারই সঙ্গে তাহার বাবা-মা যে বিবাহের বড়বন্দ করিতেছে—বেচারী কি জানে?

বলিল—আমি সব এনে দিচ্ছি। হোটেলেরই আছে। হোটেলের বড় বাসন্ত আছি, কলকাতা থেকে দশ-বারো জন-বারু এসেছে শিকার করতে। ওরা অনেকদিন আগে এক-বার এসে আমার রান্না মাংস খেয়ে খুব খুশি হয়েছিল। সেই আগের হোটেলের গিয়েছিল সেখানে নেই শনে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে। ওরা রাতে মাংস আর পোলাও খাবে। তোমরা এবেলা রান্না কোরো না—আমি হোটেল থেকে আলাদা করে পাঠিয়ে দেবো এখন। নরেনকে যে একবার দরকার, বাবুদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্তা কইতে হবে, সে তো

আমি পারবো না, নরেনকে ওঠাই দাঁড়াও—

টোর্পিংর মা বলিল—ঘুম থেকে উঠিয়ে কিছু না খাইয়ে ছাড়া ভাল দেখায় না। টোর্পিং চায়ের কথা বলছিল—তাহলে সেগুলো আগে পাঠিয়ে দেওগে, এখন জাগিও না।

বৈকালের দিকে নরেন ঘুম ভাঙিয়া উঠিল। অত্যন্ত বেলা গিয়াছে, পাঁচিলের ধারে সজ্জনে গাছটার গায়ে রোদ হলে হইয়া আসিয়াছে। নরেনের লজ্জা হইল—পরের বাড়ী কি ঘুমটাই ঘুমাইরাছে! কে কি—বিশেষ করিয়া হাজারি-মামার মেয়েটি কি মনে করিল। বেশ মেয়েটি। হাজারি-মামার মেয়ে যে এমন চালাক-চতুর, চটপটে, এমন দেখিতে, এমন কাপড়-চোপড় পরিতে জানে তাহা কে ভাবিয়াছিল?

অপ্রতিভ মুখে সে গায়ে জামা পরিয়া বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে। এমন সময় টোর্পিং আসিয়া বলিল—আপনি উঠেছেন? মুখ ধোবার জল দেব?

নরেন থতমত খাইয়া বলিল—না, না, থাক্ আমি হোটেলের—

—মা বললে আপনি চা খেয়ে যাবেন, আমি মাকে বলে আসি—

ইতিমধ্যে হাজারি চায়ের আসবাব হোটেলের চাকর দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, টোর্পিং নিজের চা করিতে বসিয়া গেল। তাহার মা জলখাবারের জন্য ফল কাটিতে লাগিল।

টোর্পিং বলিল—মা চায়ের সঙ্গে শসা-টমা দেয় না। তুমি বরং ঐ নিমকি আর রস-গোল্লা দাও রেকাবিতে—

—শসা দেয় না? একটা ডাব কাটবো? বাড়ীর ডাব আছে—

টোর্পিং হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে আর কি! মুখে আঁচল চাপা দিয়া বলিল—হি হি, তুমি মা যে কি!...চায়ের সঙ্গে বুদ্ধি ডাব খায়?

টোর্পিংর মা অপ্রসন্ন মুখে বলিল—কি জানি তোদের একেলে ঢং কিছু বুদ্ধিবে বাপু। যা বোঝা তাই করো। ঘুম থেকে উঠলে তো নতুন জামাইদের ডাব দিতে দেখেছি চিরকাল দেশেঘরে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই টোর্পিংর মা মনে মনে জিভ কাটিয়া চূপ করিয়া গেল। মানদুষ্টা একটু বোকা ধরনের, কি ভাবিয়া কি বলে, সব সময় তলাইয়া দেখিতে জানে না।

টোর্পিং আশ্চর্য হইয়া বলিল—নতুন জামাই? কে নতুন জামাই?

—ও কিছু না, দেশে দেখেছি, তাই বলছি। তুই নে, চা করা হোল?

টোর্পিংর মনে কেমন যেন খটকা লাগিল। সে খুব বুদ্ধিমতী, তাহার উপর নিতান্ত ছেলেমানুষটিও নয়, যখন চা ও খাবার লইয়া পুনরায় ছেলোটর সামনে গেল তখন তাহার কি জ্ঞান কেন যে লজ্জা করিতেছিল তাহা সে নিজেই ভাল ধরিতে পারিল না।

ছেলেটি তাহাকে দেখিয়া বলিল—ও কি! এই এত খাবার কেন এখন, চা একটু হোলোই—

টোর্পিং কোনো রকমে খাবারের রেকাবি লোকটার সামনে রাখিয়া পলাইয়া আসিলে যেন বাঁচে।

ছেলেটি ডাকিয়া বলিল—পান একটা যদি দিয়ে যান—

পান সাজিতে বসিয়া টোর্পিং ভাবিল—বাবা খাটিয়ে মারলে আমার! চা দেও—পান সাজে—আমার যেন যত গরজ পড়েছে, বাবার হোটেলের লোক তা আমার কি?

টোর্পিং একটা চায়ের পিরিচে পান রাখিয়া দিতে গেল। ছেলেটি দেখিতে বেশ কিলতু। কথাবার্তা বেশ, হাসি-হাসি মুখ। কি কাজ করে হোটেল কে জানে?

পান লইয়া ছেলেটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—মামীমা আমি যাচ্ছি, কষ্ট দিয়ে গেলাম অনেক, কিছু মনে করবেন না। এত ঘুমিয়েছি, বেলা আর নেই আজ।

বেশ ছেলেরা।

নতুন জামাই? কে নতুন জামাই? কাহাদের নতুন জামাই?

মা এক-একটা কথা বলে কি যে, তাহার মানে হয় না।

টোঁপার মা কখনও এত বড় শহর দেখে নাই।

এখানকার কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছে। মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, ইন্সটিশানে বিদ্যুতের আলো, লোকজনই বা কত! আর তাদের এড়োশোলার দিন-শানেই শেরাল ডাকে বাড়ীর পিছনকার ঘন বাঁশবনে! সোঁদিন তেঁা দিনদুপুরে জেলেপাড়ার কেপ্ট জেলের তিন মাসের ছেলেকে শেরালে লইয়া গেল।

ইতিমধ্যে কুসুম আসিয়া একদিন উহাদের বেড়াইতে লইয়া গেল। কুসুমের সঙ্গে তাহার রাধাবল্লভতলা, সিদ্ধেশ্বরীতলা, চণ্ডীর ঘাট, পালচৌধুরীদের বাড়ী—সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিল। পালচৌধুরীদের প্রকাণ্ড বাড়ী দেখিয়া টোঁপার মা ও টোঁপি দু-জনেই অবাক। এত বড় বাড়ী জীবনে তাহারা দেখে নাই। অতসীসের বাড়ীটাই এতদিন বড়-জ্বালকের বাড়ীর চরম নিদর্শন বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছে বাহারা, তাহাদের পক্ষে অবাক হইবার কথা ষটে।

টোঁপার মা বলিল—না, শহর জায়গা বটে কুসুম। গায়ে গায়ে বাড়ী আর সব কোঠাবাড়ী এদেশে। সবাই বড়লোক। ছেলেমেয়েদের কি চেহারা, দেখে চোখ জুড়ায়। হারো, এদের বাড়ী ঠাকুর হয় না? পূজোর সময় একদিন আমাদের এনো মা, ঠাকুর দেখে যাবো।

সে আর ইহার বেশী কিছুই বোঝে না।

একটা বাড়ীর সামনে কত কি বড় বড় ছবি টাঙানো, লোকজন চুকিতেছে, রাস্তার ধারে কি কাগজ বিলি করিতেছে। টোঁপার মনে হইল এই বোধ হয় সেই টাঁক বাকে বলে, তাহাই। কুসুমকে বলিল—কুসুম-দি, এই টাঁক না?

—হ্যাঁ দিদি। একদিন দেখবে?

—একদিন এনো না আমাদের। মা-ও কখনো দেখে নি—সবাই আসবে।

একখানা ধাবমান মোটর গাড়ীর দিকে টোঁপার মা হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, যতক্ষণ সেখানা রাস্তার মোড় ঘুরিয়া অদৃশ্য না হইয়া গেল।

কুসুম বলিল—আমার বাড়ী একটু পায়ের ধুলো দিন এবার জ্যাঠাইমা—

কুসুমের বাড়ী যাইতে পথের ধারে রেলের লাইন পড়ে। টোঁপার মা বলিল—কুসুম, দাঁড়া মা একখানা রেলের গাড়ী দেখে যাই—

বলিতে বলিতে একখানা প্রকাণ্ড মালগাড়ী আসিয়া হাজির। টোঁপি ও টোঁপার মা দু-জনেই একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল। গাড়ী চলিয়াছে তেঁা চলিয়াছে—তাহার আর শেষ নাই। উঃ, কি বড় গাড়ীটা!

কুসুম বলিল—জ্যাঠাইমা, রাগাখাট ভাল লাগছে?

—লাগচে, বৈকি, বেশ জায়গা মা।

আসলে কিন্তু এড়োশোলার জন্য টোঁপার মায়ের মন কেমন করে। শহরে নিজেই কখনও খাপ খাওয়াইতে পারে নাই। সেখানকার তালপুকুরের ঘাট, সদা বোষ্টমের বাড়ীর পাশ দিয়া যে ছোট নিম্নত পথটি বাঁশবনের মধ্য দিয়া বাড়ীঘো-পাড়ার দিকে গিয়াছে, দুপুর বেলা তাহাদের বাড়ীর কাছে বড় শিরীষ গাছটার এই সময় শিরীষের স্ফটিক ফল ফলিয়া বুন বুন শব্দ করে, তাহাদের উঠানের বড় লাউমাটায় এতদিন কত লাউ ফলিয়াছে, পেঁপে গাছটার কত পেঁপের ফল ও জাল দেখিয়া আসিয়াছিল—সে সবের জন্য মন

কেমন করে বৈকি।

তবে এখানে বাহা সে পাইয়াছে, টেপির মা জীবনে সে রকম সুখের মুখ দেখে নাই। চাকরের ওপর হুকুম চালাইয়া কাজ করাইয়া লওয়া, সকলে মানে, খাতির করে—অমন সুন্দর ছেলের ছেলের ছোটেলের মত—এ ধরনের ব্যাপারের কল্পনাও কখনও সে করিয়াছিল?

কুসুমের বাড়ী সকলে গিয়া পৌঁছিল। কুসুম ভারি খুশি হইয়া উঠিয়াছে—তাহার বাপের বাড়ীর দেশের রান্না-পরিবারকে এখানে পাইয়া। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া টেপির মায়ের পায়ে ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আমাদের বস্তু ভাগ্য মা, আপনাদের চরণ-ধুলো পড়লো এ বাড়ীতে।

টেপির মাকে এত খাতির করিয়া কেহ কখনো কথা বলে নাই—এত সুখও তাহার কপালে লেখা ছিল! হায় মা কীটকিপোতার বনবিবি, কি জাগ্রত দেবতাই তুমি। সেবার কীটকিপোতায় চৈত্র মাসে মেলায় গিয়া টেপির মা বনবিবিতলার স-পাট আনার সিদ্ধি দিয়া স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনা করিয়াছিল, এখনও যে বছর পায় হয় নাই! তবুও লোকে ঠাকুর-দেবতা মানিতে চায় না।

কুসুম সকলকে জলযোগ করাইল। পান সাজিয়া দিল। কুসুমের শাশুড়ী আসিয়া কতক্ষণ গল্পগজব করিল। কুসুম গ্রামের কথাই কেবল শুনিতে চায়। কতদিন বাপের বাড়ী যায় নাই, বাবা-মা মরিয়া গিয়াছে, জ্যাঠামশায় আছে, কাকারা আছে—তাহারা কোনো দিন খোঁজও নেয় না। খোঁজ করিত অবশ্যই যদি তাহার নিজের অবস্থা ভাল হইত। গরীব লোকের আদর কে করে?...এই সব অনেক দুঃখ করিল। আরও কিছুক্ষণ বসিবার পরে কুসুম উহাদের বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া গেল।

হাজারির হোটেলে রাতে এক মজার ব্যাপার ঘটিল সেদিন।

দশ-পনেরোটি লোক একই সঙ্গে খাইতে বসিয়াছে—হঠাৎ একজন বলিয়া উঠিল—ঠাকুর, এই যে ভাতটা দিলে, এ দেখছি ও বেলার বাসি ভাত।

বংশী ঠাকুর ভাত দিতেছিল, সে অবাধ হইয়া বলিল—আজ্ঞে বাবু, সে কি? আমাদের হোটেলে ওরকম পাবেন না। আধ মণ চাল এক-একবেলা রান্না হয়, তাতেই কুলোয় না—বাসি ভাত থাকবে কোথা থেকে?

—আলবাৎ এ ও-বেলার ভাত। আমি বলছি এ ও-বেলার ভাত—

গোলমাল শুনিয়া হাজারি আসিয়া বলিল—কি হয়েছে বাবু?...বাসি ভাত? কক্ষনো না। আপনি নতুন লোক, কিন্তু এরা বাঁরা খাচ্ছেন তাঁরা আমায় জানেন—আমার হোটেল না চলে না চলুক কিন্তু ওসব পরিবাস্তি ভগবান যেন আমায় না দেন—

লোকটা তখন তকের মোড় ঘুরাইয়া ফেলিল। সে যেন বগুড়া করিবার জন্যই তৈরী হইয়া আসিয়াছে। পাত হইতে হাত তুলিয়া চোয় গরম করিয়া চাঁৎকার করিয়া বলিল—তবে তুমি কি বলতে চাও আমি মিথ্যে কথা বলছি?

হাজারি নরম হইয়া বলিল—না বাবু, তা তো আমি বলছি নে। কিন্তু আপনার ভুলও তো হতে পারে। আমি দাবী করে বলছি বাবু, বাসি ভাত আমার হোটেলে থাকে না—

—থাকে না? বস্তু নব্বারী কথা বলছে যে! বাসি ভাত আবার এ-বেলা হাঁড়িতে ফেলে দাও না তুমি?

—না বাবু।

—পষ্ট দেখতে পাচ্ছি—আবার তবুও না বলছ? দেখবে মজা?

। এই সময়ে নরেন ও হোটেলের আরও দু-একজন সেখানে আসিয়া পড়িল। নরেন

গরম হইয়া বলিল—কি মজা দেখাবেন আপনি ?

—দেখবে? সরে এসো দেখাচ্ছি—জোড়োর সব কোথাকার—

এই কথায় একটা মহা গোলমাল বাধিয়া গেল। পুরানো খরিস্দাররা সকলেই হাজারির পক্ষ অবলম্বন করিল। লোকটা রাস্তার দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—রাস্তার সমবেত জনতার সামনে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—শুনুন মশাই সব বলি। এই এর হোটেলের বাস ভাত দিরেছিল খেতে—ধরে ফেলেছি কিনা তাই এখন আমার আমাকে মারতে আসছে—পুলিশ ডাকবো এখনি—স্যানিটারি দারোগাকে দিয়ে রিপোর্ট করিয়ে তবে ছাড়বো—জোড়োর কোথাকার—লোক মারবার মতলব তোমাদের ?

এই সময় হোটেলের চাকর শশী হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—বাবু, এই লোকটাকে যেন আমি বেচু চক্রান্তির হোটেলের দেখেছি। সেখানে যে ঝি থাকে, তার সঙ্গে বাজার করে নিয়ে যেতে দেখেছি—

নরেনের সহস খুব। সে হোটেলের রোয়াকে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মশাই, আপনি বেচু চক্রান্তির হোটেলের পশ্চিমায়ের কে হন ?

তবুও লোকটা ছাড়ো না। সে হাত-পা নাড়িয়া প্রমাণ করিতে গেল পশ্চিমায়ের নামও সে কোনোদিন শোনে নাই। কিন্তু তাহার প্রতিবাদের তেজ যেন তখন কমিয়া গিয়াছে।

কে একজন বলিয়া উঠিল—এইবার মানে মানে সরে পড় বাবা। কেন মার খেয়ে মরবে !

কিছুক্ষণ পরে লোকটাকে আর দেখা গেল না।

এই ঘটনার পরে অনেক রাত্রে হাজারি বেচু চক্রান্তির হোটেলের গিয়া হাজারি হইল। বেচু চক্রান্তি তহবিল মিনাইতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল—কি, হাজারি যে? এসো এসো। এত রাত্রে কি মনে করে ?

হাজারি বিনীতভাবে বলিল—বাবু, একটা কথা বলতে এলাম।

—কি-বল ?

—বাবু আপনি আমার অন্নদাতা ছিলেন একসময়ে—আজও আপনাকে তাই বলেই ভাবি। আপনার এখানে কাজ না শিখলে আজ আমি পেটের ভাত করে খেতে পারতাম না। আপনার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা আছে বলে আমি তো ভাবিনে।

—কেন, কেন, একথা কেন ?

হাজারি সব ব্যাপার খুলিয়া বলিল। পরে হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবু, আপনি ব্রাহ্মণ, আমার মনিব। আমাকে এভাবে বিপদে না ফেলে যদি বলেন হাজারি তুমি হোটেলের উঠিয়ে দাও। তাই আমি দেবো। আপনি হুকুম করুন—

বেচু চক্রান্তি আশ্চর্য হইবার ভান করিয়া বলিল—আমি তো এর কোনো খবর রাখিনে—আচ্ছা, তুমি যাও আজ, আমি তদন্ত করে দেখে তোমার কাজ জানাবো। আমাদের কোন লোক তোমার হোটেলের যায় নি এ একেবারে নিশ্চয়। কাল জানতে পারবে তুমি। ...তারপর হাজারি চলচে-টলচে ভাল ?

—একরকম আপনার আশীর্বাদে—

—রোজ কি রকম বিক্রীসিতি হচ্ছে? রোজ তাবলে কি রকম থাকে? তুমি কিছু মনে কোরো না—তোমাকে আপনার লোক বলে ভাবি বলেই জিজ্ঞেস করছি।

—এই বাবু পয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা—ধরুন না কেন আজ রাস্তারের তাবিল দেখে এসেছি ছত্রিশ টাকা সব্বারো আনা।

বেচু চক্রান্তি আশ্চর্য হইলেন মনে মনে। মধ্যে বলিলেন—বেশ বেশ। খুব ভালো

—শুনে খুশি হলাম। আচ্ছা, তাহলে এসো আজগে। কাল খবর পাবে।

হাজারি চলিয়া গেলে বেচু চক্ৰবর্তী পশ্চিমিকে ডাকাইলেন। পশ্ম আসিয়া বলিল—
হাজারি ঠাকুরটা এসেছিল নাকি? কি বলছিল?

বেচু চক্ৰবর্তী বলিলেন—ও পশ্ম, হাজারি যে অধাক করে দিয়ে গেল! রাগাঘাটের
বাজারে হোটেল করে পরিশিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা রোজকার দাঁড়া-তবিল; এ তো
কখনো শুনি নি। তার মানে বুঝচো? দাঁড়া-তবিলে গড়ে ত্রিশ টাকা থাকলেও সাত-
আট টাকা দৈনিক লাভ, ফেলে-বোলেও। মাসে হোল আড়াইশো টাকা। দুশো টাকার
তো মার নেই—হ্যাঁ পশ্ম?

পশ্ম ঝি মৃদুভাষি করিয়া বলিল—গুলু দিয়ে গেল না তো?

—না, গুলু দেবার লোক নয় ও। সাদাসিধে মানুষটা—আমার বন্ধ মানে এখনও।
ও গুলু দেবে না, অন্ততঃ আমার কাছে। তা ছাড়া দেখছ না রেলবাজারে কোন হোটেল
আর বিক্রী নেই। সব শ্রুবে নিচ্ছে ওই একলা।

—আজ নৃসিংহ গিয়েছিল বাবু ওর হোটেল। খুব খানিকটা রাউ করে দিয়েও
এসেছে নাকি। খুব চোঁচিয়েছে বাসি ভাত পচা মাছ এই বলে। আর কিছু হোক না
হোক লোকে শুনে তো রাখলে?

—যদু বাঁড়ুঘোরাও আমার ডেকে পাঠিয়েছিল, ওর হোটেল ভাঙতেই হবে। নইলে
রেলবাজারে কেউ আর টিকবে না। এই কথা যদু বাঁড়ুঘোও বললে। কিন্তু তাতে কিছু
হবে না—ওর এখন সময় যাচ্ছে ভালো। নৃসিংহ আছে?

—না বেরিয়ে গেল। পুর্লিশে সেই যে খবর দেবার কি হোল?

—দেখ পশ্ম, আমি বলি ওরকম আর পাঠিয়ে দরকার নেই। হাজারি লোকটা
ভালো—আজ এসেছিল, এমন হাত জোড় করে নরম হয়ে থাকে যে দেখলে ওর ওপর রাগ
থাকে না।

—খাংরা মারি ওর ভালমানুষেতার মুখে—ভিজ়ে বেড়ালটি, মাছ খেতে কিন্তু ঠিক
আছে—পুর্লিশের সেই যে মতলব দিয়েছিল যদু বাবু, তাই তুমি করো এবার। ওর
হোটেল না ভাঙলে চলবে না। নয়তো আমাদের পাততারা গটুতে হবে এই আমি বলে
দিলাম—এবেলা তবিল কত?

বেচু চক্ৰবর্তী অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—মোট ছটাকা সাড়ে তিন আনা—

পশ্ম ঝি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিল—দু'মাসের বাড়ীভাড়া বাকী ওদিকে। কাল
বলেছে অন্ততঃ একমাসের ভাড়া না দিলে হৈ চৈ বাধাবে। ভাড়া দেবে কোথেকে?

—দেখি।

—তারপর কানাই ঠাকুরের মাইনে বাকী পাঁচ মাস। সে বলছে আর কাজ করবে না,
তার কি করি?

—বুঝিয়ে রাখো এই মাসটা। দোঁখ সামনের মাসে কি রকম হয়—

পশ্ম ঝি রাগাঘরে গিয়া ঠাকুরকে বলিল—আমার ভাতটা বেড়ে দাও ঠাকুর, রাত
হয়েছে অনেক, বাড়ী যাই।

তারপর সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। ছন্দাড়া অবস্থা, ওই বড় দশ সেরী
ডেক্‌চিটা আজ তিন-চার মাস তোলা আছে—দরকার হয় না। আগে পিতলের বালতি
করিয়া সরিষার তৈল আসিত, এখন আসে ছোট ভাঁড়ে—বালতি দরকার হয় না। এমন
দুরবস্থা সে কখনো দেখে নাই হোটেলের।

তাহার মনটা কেমন করিয়া উঠে।...

নানারকমে চেষ্টা করিয়া এই হোটেলটা সে আর কতী দু'জনে গড়িয়া তুলিয়াছিল।

এই হোটেলের দৌলতে বধেষ্ঠ একদিন হইয়াছে। ফুলেনবলা গ্রামের যে পাড়ায় তাহার আদি বাস ছিল, সেখানে তার ভাই এখনও আছে—চাম্বাস করিয়া খায়—আর সে এই রাণাঘাটের শহরে সোনাদানাও পরিয়া বেড়াইয়াছে একদিন—এই হোটেলের দৌলতে। এই হোটেল তার বৃকের পাঁজর। কিন্তু আজ বড় মর্শ্বাকলের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কোথা হইতে এক উমপাজুরে গাঁজখোর আসিয়া জুটিল হোটলে—হোটেলের সুলুক-সম্মান জানিয়া লইয়া এখন তাহাদেরই শীলনোড়ায় তাহাদেরই দাঁতের গোড়া ভঙিতেছে। এত যত্নের, এত সাধ-আশার জিনিসটা আজ কোথা হইতে কোথায় দাঁড়াইয়াছে! যাহার জন্য আজ হোটেলের এই দুরবস্থা—ইচ্ছা হয় সেই কুকুরটার গলা টিপিয়া মারে, যদি বাগে পায়। তাহার উপর আবার দয়া কিসের? কতৃণা ওই রকম ভালমানুষ সদাশিব লোক বলিয়াই তো আজ পথের কুকুর সব মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে।...দয়া!

একদিন রাণাঘাটের স্টেশন মাস্টার হাজারিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

হাজারি নিজে যাইতে রাজী নয়—কারণ স্টেশন মাস্টার সাহেব, সে জানে। নরেন যাওয়াই ভাল। অবশেষে তাহাকেই যাইতে হইল। নরেন সঙ্গে গেল।

সাহেব বলিলেন—টোমার নাম হাজারি? হিন্দু হোটেল রাখা বাজারে?

—হ্যাঁ হুজুর।

—টুমি প্লাটফর্মে কেটার করবে? হিন্দু ভাত, ডাল, মাছ, দহি :

হাজারি নরেনের মূখের দিকে চাহিল। সাহেবের কথা সে বুঝিতে পারিল না। নরেন ব্যাপারটা সাহেবের নিকট ভাল করিয়া বুঝিয়া লইয়া হাজারিকে বুকাইল। রেল-যাত্রীর সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী স্টেশনের প্লাটফর্মে একটা হিন্দু ভাতের হোটেল খুলিতে চায়। সাহেব হাজারির নামডাক শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। আপাততঃ দেড়শো টাকা জমা দিলে উহার লাইসেন্স মঞ্জুর করিবে এবং রেলের খরচে হোটেলের ঘর বানাইয়া দিবে।

হাজারি সাহেবের কাছে বলিয়া আসিল সে রাজী আছে।

স্টেশন মাস্টার নরেনকে একখানা টেন্ডার ফর্ম দিয়া ঘরগুলা পুঁজাইয়া হাজারির নাম সেই করিয়া আনিতে বলিয়া দিলেন। স্টেশনের এই হোটেল লইয়া তারপর জোর কমিপিটশন চলিল। মৈত্রীটির এবং কৃষ্ণনগরের দুইজন ভাটিয়া হোটেলওয়ালারা টেন্ডার দিল এবং ওপরওয়ালারা কমিচারীদের নিকট তন্মিব্রতাগাদাও শুরু করিল।

নিজ রাণাঘাটের বাজারে এ খবরটা কেহ রাখিত না—শেখের দিকে, অর্থাৎ যখন টেন্ডারের তারিখ শেষ হইবার অল্প কয়েকদিন মাত্র বাকী, যদু বাড়ুয়ো কঁথাটা শুনিল। স্টেশনের একজন ক্লার্ক যদুর হোটলে খায়, সেই কি করিয়া জমিতে পারিয়া যদুকে বলিল—একটু চেষ্টা করুন না আপনি টেন্ডার দিন। হলে যেতে পারে।

যদু চুপি চুপি টেন্ডার সই করিয়া পাঁচ টাকা টেন্ডারের জন্য জমা দিয়া আসিল।

সেদিন বেচু চক্রান্তি সব হোটেলের গদিত আসিয়া বসিয়াছে এমন সময় পদ্মকি কাস্তসম্মত হইয়া আসিয়া বলিল—শুনেছ গো? শুনে এলাম একটা কথা—

—কি?

—ইন্সটান্সে ভারতের হোটেল খুলে দেবে রেল কোম্পানি, দরখাস্ত দাও না কতৃণা।

—ইন্সটান্সে? ছোঃ, ওতে খন্দের হবে না! দূরের বাটীদের মধ্যে কে ভাত খাবে?

সব কলকাতা থেকে খেয়ে আসবে—

—তোমার এই সব বসে বসে পরামর্শ আর রাজা-উজীর মারা। সবাই দূরের বাটী থাকে না—যারা গাড়ী বদলে খুলনে লাইনে যাবে, তারা খাবে, দূপুরে যে সব গাড়ী

কলকাতায় যায়—তারা এখানে ভাত পেলে এখানেই থেয়ে যাবে। শূন্যলম্ব বাঁড়ুঘো মশায় নাকি দরখাস্ত দিয়েছে পাঁচ টাকা জমা দিয়ে—

বেচু চক্ৰবর্তীর চমক ভাঙিল। যদু বাঁড়ুঘো যদি দরখাস্ত দিয়া থাকে, তবে এ দুধে সর আছে, কারণ যদু বাঁড়ুঘো ঘুঘু হোটেলওয়ালা। পরস্যা আছে না বুকিয়া সে টেণ্ডারের পাঁচ টাকা জমা দিত না। বেচু বলিল—যাই, একবার দরখাস্ত দিয়ে আসি তবে—

পদ্মবি বলিল—কেরানী বাবুদের কিছু খাইয়ে এস—নইলে কাজ হবে না। আমাদের হোটলে সেই যে শশধরবাবু খেতো, তার শালা ইন্সট্যানের মালবাবু, তার কাছে সলুদুক-সম্বান নিও। না করলে চলবে কি করে? এ হোটেলের অবস্থা দেখে দিন দিন হাত-পা পেটের ভেতর সোঁদিয়ে যাচ্ছে।

—কেন ওবেলা খন্দের তো মন্দ ছিল না?

পদ্মবি হতাশার সুরে বলিল—ওকে ভাল বলে না কর্তা। সতেরো জন খাড়া কেলাস আর ন'জন বাঁধা খন্দেরে টাকা দিচ্ছে তবে হোটেল চলছে—নইলে বাজার হোত না। যদি ধার দেওয়া বন্ধ করবে বলে শাসিয়েছে, তারই বা দোষ কি—একশো টাকার ওপর থাকী।

বেচু বলিল—টেণ্ডারের দরখাস্ত দিতে গেলে এখন পাঁচটা টাকা চাই, তাবিলে আছে দেখছি এক টাকা সাড়ে তের আনা মোট। ওবেলার দরুন। তার মধ্যে কয়লার দাম দেবো বলা আছে ওবেলা, কয়লাওয়ালা এল বলে। টাকা কোথায়?

পদ্মবি একটু ভাবিয়া বলিল—ও-থেকে একটা টাকা নাও এখন। আর আমি চার টাকা যোগাড় করে এনে দিচ্ছি। আমার লবণাকুল থাকে এপাড়ায় তার কাছ থেকে। কয়লাওয়ালাকে আমি বুঝিয়ে বলবো—

—বুঝিয়ে রাখবে কি, সে টাকা না পেলে কয়লা বন্ধ করবে বলেছে। তুমি পাঁচ টাকাই এনে দ্যাও—

সম্ভার পূর্বে বেচুও গিয়া টেণ্ডার দিয়া আসিল। পদ্মবি সাগ্রহে গদির ঘরের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছিল। এখনও খরিন্দার আসা শূন্য হয় নাই। বলিল—হয়ে গেল কর্তা? কি শূনে এলে?

—হয়ে যাবে এখন? ছেলের হাতের পিঠে বুঝি? তবে খুব লাভের কান্ড যা শূনে এলাম। যদু পাঁচা লোক—নইলে কি দরখাস্ত দেয়? আমি আগে বুঝতে পারি নি। মোটা লাভের ব্যবসা। ইন্সট্যানের ক্ষেত্রবাবু আমার এখানে খেতো মনে আছে? সে আবার বদলি হয়ে এসেছে এখানে। সে-ই বলে—যাত্রীরা রেলের বড় আঁপসে দরখাস্ত করেছে আমাদের খাওয়ার কর্তা। তা ছাড়া, রেল কোম্পানী এলেকট্রিক আলো দেবে, পাখা দেবে, ঘর করে দেবে—তার দরুন কিছু নেবে না আপাতোকা। রেলের বোর্ড না কি আছে, তাদের অর্ডার। যাত্রীদের সুবিধে আগে করে দিতে হবে। যথেষ্ট লোক থাকে পদ্ম, মোটা পরসার কান্ড বা বুঝে এলাম।

পদ্মবি বলিল—ছোড়া পাঁচা দিয়ে পাঁছো দেবো সিম্পস্বরীতলায়। হয়ে যেন বার—তুমি কাল আর একবার গিয়ে ওদিগের কিছু খাইয়ে এসো—

—বলি যদু বাঁড়ুঘো টের পেলে কি করে হয়?

—ওসব ঘুঘু লোক। ওদের কথা ছাড়ান দ্যাও।

ক্রমে এ সম্বন্ধে অনেক রকম কথা শোনা গেল। টেণ্ডারের প্র্যাটফর্ম দেখা গেল কর্তার তরফ হইতে একটি চমৎকার ঘর তৈয়ারী করিতেছে—আসবাবপত্র, আলমারি, হটকিল, চেয়ার দিয়া সেটি সাজানো হইবে, সে-সব কোম্পানী দিবে।

এই সময় একদিন যদু বাঁড়ুয়েকে হঠাৎ তাহাদের গদিঘরে আসিতে দেখিয়া বেচু ও পদ্মঝি উভয়েই আশ্চর্য হইয়া গেল। যদু বাঁড়ুয়ে হোটেলওয়ালাদের মধ্যে সম্প্রান্ত ব্যক্তি—কুলীন ব্রাহ্মণ, মাটিঘরার বিখ্যাত বাঁড়ুয়ে-বংশের ছেলে। কখনও সে কারো দোকানে বা হোটেল গিয়া হাউ-হাউ করিয়া বকে না—গম্ভীর মেজাজের মানবুটি।

বেচু চক্ৰান্তি বধেষ্ঠ খাতির করিয়া বসাইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

যদু বাঁড়ুয়ে কিছুক্ষণ তামাক টানিয়া একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—তারপর এসেছি একটা কাজে, চক্ৰান্তি মশায়। হোটেল চলছে কেমন?

বেচু বলিল—আর তেমন নেই, বাঁড়ুয়ে মশায়। ভাবছি তুলে দিয়ে আর কোথায়ও যাই! খন্দেরপত্তর নেই আর—

—আপনার কাছে আমার আসার উদ্দেশ্য বলি। ইন্সটিশানে হোটেল হচ্ছে জানেন নিশ্চয়ই। আমি একটা টেণ্ডার দিই। শুনলাম আপনিও নাকি দিয়েছেন?

—হ্যাঁ—তা—আমিও—

—বেশ। বলি, শুনুন। নৈহাটির একজন ভাটিয়া নাকি বস্ত তাম্বির করছে ওপরে—তারই হয়ে যাবে। মোটা পরসার কারবার হবে ওই হোটেলটা। আসাম মেল, শান্তিপুর, বনগাঁ, ডাউন চার্টার্ড মেল—এসব পরসেজার থাকে—তা ছাড়া খাউকো লোক থাকে। ভাল পরসার হবে এতে। আসুন আপনি আর আমি দু'জনে মিলে দরখাস্ত দিই যে রাণাঘাটের আমরা স্থানীয় হোটেলওয়ালার, আমাদের ছেড়ে ভাটিয়াকে কেন দেওয়া হবে হোটেল। স্থানীয় হোটেলওয়ালারা মিলে একসঙ্গে দরখাস্ত করেচে এতে জোর দাঁড়াবে আমাদের দ্বারা।

বেচু বুঝিল নিতান্ত হাতের মুঠার বাহিরে চলিয়া যার বলিয়াই আজ যদু বাঁড়ুয়ে তাহার গদিতে ছাটিয়া আসিয়াছে—নতুবা যদু যদু কখনও লাভের ভাগাভাগিতে রাজী হইবার পাত্র নয়। বলিল—বেশ দরখাস্ত লিখিয়ে আনুন—আমি সহ করে দেবো এখন।

যদু বাঁড়ুয়ে পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিল—আরে, সে কি, বাকি আছে, সে অবশিষ্ট উকীলকে দিয়ে মসৌবিদে করে টাইপ করিয়ে ঠিক করে এনেছি। আপনি এখনটার সহ করুন—

যদু বাঁড়ুয়ে সহ লইয়া চলিয়া গেলে পদ্মঝি আসিয়া বলিল—কি গা কর্ত্তা?

বেচু হাসিয়া বলিল—কারে না পড়লে কি যদু, যদু বাঁড়ুয়ে এখানে আসে কখনো? সেই হোটেল নিয়ে এসেছিল। শুনবে?

পদ্ম সব শুনিয়া বলিল—তাও ভালো। বেশী যদি বিক্রী হয়, ভাগাভাগিও ভালো। এখানে তোমার চলবেই না, যেরকম দাঁড়াচ্ছে তার আর কি। হোক, ইন্সটিশানে আধা বখরাই হোক।

দিন কুড়ি-বাইশ পরে একদিন যদু বাঁড়ুয়ে বেচুর গদিঘরে ঢুকিয়া যে ভাবে ধপ করিয়া হতাশ ভাবে তক্তপোশের এক কোণে বসিয়া পড়িল তাহাতে পদ্মঝি (সেখানেই ছিল) বুঝিল স্টেশনের হোটেল হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদের জন্য পদ্মঝি প্রস্তুত ছিল না।

যদু বলিল—শুনেছেন, চক্ৰান্তি মশায়! কাণ্ডটা শোনেন নি?

বেচু চক্ৰান্তি ওভাবে যদু বাঁড়ুয়েকে বসিতে দেখিয়া পক্ষেই বুঝিয়াছিল সংবাদ শ্রুত নয়। তবুও সে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—কি! কি ব্যাপার?

—ইন্সটিশানের থেকে আসিচি এই মাস্তর, আজ ওদের হেড অফিস থেকে টেণ্ডার মঞ্জুর করে নোটিশ পাঠিয়েছে—

বেচু এ কথা শুনে উত্তরে কিছু না বলিয়া উদ্ভ্রম মুখে যদু বাঁড়ুয়ের মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল।

—কর হয়ে গেল জানেন?

—না—সেই ভাটিয়া ব্যাটার বৃদ্ধি—

—তা হলেও তো ছিল ভাল। হল হাজারির, তোমাদের হাজারির—

বেচু ও পদ্মাবি দ্বন্দ্বনেই বিস্ময়ে অক্ষুট চীৎকার করিয়া উঠিল প্রায়।

বেচু চক্ৰান্ত বলিল—দেখে এলেন?

—নিজের চোখে। ছাপা অক্ষরে। নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে—

পদ্মাবি হতবাক হইয়া যদু বাঁড়ুয়োর দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হইল কথাটা যেন সে এখনও বিশ্বাস করে নাই।

বেচু চক্ৰান্ত বলিল—তা হলে ওরই হল!

এ কথার কোন অর্থ নাই, যদুও বৃদ্ধি, পদ্মাবিও বৃদ্ধি। ইহা যদু বেচুর মনের গভীর নৈরাশ্য ও ঈর্ষার অভিব্যক্তি মাত্র।

যদু বাঁড়ুয়ো বলিল—ওঃ, লোকটার বরাত খুবই ভাল যাচ্ছে দেখছি। খুলো মদুঠো ধরলে সোনা মদুঠো হচ্ছে। আজ একুশ বছর এই রেলবাজারে হোটেল চালাচ্ছি, আমরা গেলান ভেসে, আর ও হাতাবোড়ি ঠেলে আপনার হোটেলে পেট চালাত, তার কিনা—সবই বরাত—

বেচু বলিল—কেন হল, কিছু শুনলেন নাকি? টাকা ঘুষঘাষ দিয়েছিল নিশ্চয়ই—

—টাকার ব্যাপার নেই এর মধ্যে। হেড্ অফিসের বোর্ড থেকে নাকি মঞ্জুর করেছে—এখানকার ইন্সট্যান মাস্টার সাহেব নাকি ওর পক্ষে খুব লিখেছিল। কোন কোন প্যাসেঞ্জার ওর নাম লিখেছে হেড্ অফিসে, খুব ভাল রাস্তা করে নাকি, এই সব।

আর কিছুক্ষণ থাকিয়া যদু চলিয়া গেলে পদ্মাবি বলিল—বলি এ কি হল, হ্যাঁ কর্ত্তা?

—তাই তো!

—মজুই পোড়া বামনটা বড় বাড় বাড়িয়েচে, আর তো সাহ্য হয় না—

—কি আর করবে বল। আমি ভাবছি—

—কি?

—কাল একবার হাজারির হোটেলে আমি যাই—

—কেন, কি দেখে?

—ওকে বলি আমার হোটেলে তুমি অংশীদার হও, রেলের হোটেলের অংশ কিছু

আমায় দাও—

পদ্মাবি ভাবিয়া বলিল—কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু যদি তোমায় না দিতে চার?

—আমাকে খুব মানে কিনা তাই বলছি। এ না করলে আর উপায় নেই পদ্ম। হোটেল আর চালাতে পারবো না! একরশ দেনা—খরচে আয়ে আর কুলোয় না। আমার করতেই হবে।

পদ্মাবিরের মধ্যে বেদনার চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। বলিল—যা ভাল বোঝ কর কর্ত্তা। আমি কি বলব বল!

কিছুক্ষণ পরে যদু বাঁড়ুয়ো পদ্মাবির বেচুর হোটেলে আসিয়া বসিল। বেচু চক্ৰান্ত খাতির করিয়া তাহাকে চা খাওয়াইল। তামাক সাজিয়া হাতে দিল।

তামাক টানিতে টানিতে যদু বলিল—একটি মন্তব্য মনে এসেছে চক্ৰান্ত মশায়—তাই আবার এলাম।

বেচু সকৌতুহলে বলিল—কি বলুন ভো?

—আমি পালচৌধুরীদের নায়েব মহেন্দ্রবাবুকে ধরেছিলাম। ওরা জমিদার, ঠাকুর খাতির করে রেল কোম্পানী। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে কাল চলুন। আপনি আর আমি কলকাতা রেল আপসে একবার আপীল করি গিয়ে।

পশ্মিকি দোরের কাছেই ছিল, সে বলিল—তাই যান গিয়ে কর্তা। আমিও বলি যাতে কক্ষনো ও মড়ুই পোড়া বামুন হোটেল না পায় তা করাই চাই। দৃ'জনে তাই যান—

বেচু চক্ৰান্ত ভাবিয়া বলিল—কখন যেতে চান কাল?

যদু বলিল—সকাল সকাল যাওয়াই ভাল। বড় বাবুকে ধরতে হবে গিয়ে—পাল-চৌধুরীদের পুকুরে মাছ ধরতে আসেন প্রায়ই। গরমহতে বাড়ী, বড় ভাল লোক। মহেন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে গিয়ে ধরি।

যদু চলিয়া গেলে বেচু চক্ৰান্ত পশ্মিকে বলিল—কিন্তু তাহলে হাজারির কাছে আমার ওভাবে যাওয়া হয় না। ও সব টের পাবেই যে আমরা আপীল করেছি, ওকেও নোটিশ দেবে কোম্পানী। আপীলের শুনানী হবে। তারপর কি আর ওর কাছে যাওয়া যায়?

—না হয় না গেলে। ওর দরকার নেই, যাতে ওর উচ্ছেদ হয় তাই কর।

—বেশ, যা বল।

পরদিন যদু বাঁড়ুয়োর সঙ্গে বেচু চক্ৰান্ত কয়লাঘাটে রেলের বড় আপসে যাইবে বলিয়া বাহির হইল এবং সম্ভার পরে পুনরায় রাণাঘাটে ফিরিল। বেচু যখন নিজের হোটেলের চুকিল, তখন খাওয়াদাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। পশ্মিকি বাস্তবভাবে বলিল—কি হ'ল কর্তা?

বেচু বলিল—আর কি, মিথ্যে যাতায়াত সার হ'ল, দুটো টাকা বেরিয়ে গেল। তারা বস্ত্রে—এ আমাদের হাতে নেই, টেন্ডার মঞ্জুর হলে বোর্ডের কাছে চলে গিয়েছে। এখন আর আপীল খাটেবে না।

—তবে যাও কাল হাজারির কাছেই যাও—

—তার দরকার নেই। বাঁড়ুয়ো মশায় আসবার সময় বলেন—ওর হোটেল আর আমার হোটেল একসঙ্গে মিলিয়ে দিতে। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সামনের মাসে ওর ঘরেই—

পশ্মিকি বলিল—এ কিন্তু খুব ভাল কথা। ও ছোটলোকটার কাছে না গিয়ে বাঁড়ুয়ো মশায়ের সঙ্গে কাজ করা ঢের ভাল।

পরবর্তী পনেরো দিনের মধ্যে রাণাঘাট রেলবাজারে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গেল।

স্টেশনের আগ প্রাটফর্মে নতুন হিন্দু-হোটেল খোলা হইল। শ্বেতপাথরের টেবিল, চেয়ার, ইলেকট্রিক আলো, পাখা দিরা সাজানো আধুনিক ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অতি চমৎকার হোটেলটি। হোটেলের মালিকের স্থানে হাজারির নাম দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়া গেল।

আর একটি লিখিত ঘটনা, বেচু চক্ৰান্তের পুরোনো হোটেলটি উঠিয়া যাইবে এমন একটা গুজব রেলবাজারের সমস্ত রটিল।

সৌদীন বিকালের দিকে হাজারি তাহার পুরোনো অভ্যাসমত চুর্ণীর ধার হইতে বেড়াইয়া ফিরিতেছে এমন সময় পশ্মিকিয়ের সঙ্গে রাস্তায় দেখা।

হাজারিই পশ্মিকে ডাকিয়া বলিল—ও পশ্মদিদি, কোথায় যাচ্ছ?

পশ্মিকি দাঁড়াইল। তাহার হাতে একটা ছোট পাথরের বাটি। সম্ভবতঃ কাছেই কোথাও পশ্মিকিয়ের বাসা।

হাজারি বলিল—বাটিতে কি পশ্মদিদি?

—একটু দম্বল, দই পাতখো বলে গোরালবাড়ী থেকে নিয়ে যাচ্ছি।

—তারপর, ভাল আছ?

—তা নন্দ নয়। তুমি ভাল আছ ঠাকুর?

—এখানে কাছেই থাকো যদি?

এ কথার উত্তরে পদ্মিমা বাহা বলিল হাজারি তাহার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না।
বলিল—এস না ঠাকুর, আমার বাড়ীতে একবার এলেই না হয়—

—তা বেশ বেশ চলো না পদ্মদিদি।

ছোট বাড়ীটা, একপাশে একটা পাতকুয়া, অন্যদিকে টিনের রান্নাঘর এবং গোরাল। পদ্মিমা রোয়াকটাত্তে একথানা মাদুর আনিয়া হাজারির জন্য বিছাইয়া দিল। হাজারি খানিকটা অস্বস্তি ও আড়ষ্ট ভাব বোধ করিতেছিল। পদ্ম যে তাহার মনিব, তাহাদেরই হোটেলে সে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাজ করিয়াছে, এ কথাটা এত সহজে কি ভোলা যায়? এমন কি, পদ্মিকাকে সে চিরকাল ভয় করিয়া আসিয়াছে, আজও যেন সেই ভাবটা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল।

পদ্মিমা বলিল—পান সাজবো খাবে?

হাজারি আমতা আমতা করিয়া বলিল—তা—তা বরং একটা—

পান সাজিয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া হাজারির সম্মুখে রাখিয়া বলিল—তারপর, রেলের হোটেল তো পেয়ে গেলে শুনলাম। ওখানে কসাবে কাকে?

—ওখানে বসাবো ভাবিছ বংশীর ভাগ্নে সেই নরেন—নরেনকে মনে আছে? সেই তাকে।

—মাইনে কত দেবে?

—সে সব কথা এখনও ঠিক হয় নি। ও তো আমার এই হোটেলে খাতাপত্র রাখে, দেখা-শুনো করে, বড় ভাল ছেলোটি।

—তা ভালো।

—চক্রান্ত মশায়ের শরীর ভাল আছে? কর্দন ওদিকে আর যেতে পারি নি। হোটেল চলছে কেমন?

—হোটেল চলছে নন্দ নয়। তবে আমি কি বলছিলাম জানানো ঠাকুর, কর্ত্তামশায়কে রেলের হোটেলে একটা অংশ দিয়ে রাখা না তুমি? তোমার কাজের সুবিধে হবে।

হাজারি এ প্রস্তাবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। একটু বিস্ময়ের সুরে বলিল—কর্ত্তা কি করে থাকবেন? ঠিক নিজেই হোটেল?

—সেজন্যে ভাবনা হবে না। সে আমি দেখব। কি বল তুমি?

—এখন আমি কোন কথা দিতে পারব না পদ্মদিদি। তবে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে তা বলি। রেল-কোম্পানী এখন টেন্ডার নেয়, তখন যার নাম লেখা থাকে, তার ছাড়া আর কোন লোকের অংশটংগ থাকতে দেবে না হোটেল। হোটেল তো আমার নয়—হোটেল রেল-কোম্পানীর।

—ঠাকুর একটা কথা বলব? তুমি এখন বড় হোটেলওয়াল। অনেক পরস্য রোজগার কর শুন। কিন্তু আমি তোমার সেই হাজারি ঠাকুরই দেখি। তুমি এস আমাদের হোটেলে আবার।

হাজারি বিস্ময়ের সুরে বলিল—চক্রান্ত মশায়ের হোটেলে? রাধিতে?

সে মনে মনে ভাবিল—পদ্মদিদির মাথা খরাপ হয়ে গেল নাকি? বলে কি?

পদ্ম কিন্তু বেশ দৃঢ় স্বরেই বলিল—সত্যি বলছি ঠাকুর। এস আমাদের ওখানে আবার।

—কেন বল তো পদ্মদিদি? একথা ভুললে কেন?

—তবে বলি শোন। তুমি এলে আমাদের হোটেলটা আবার জঁকাবে।

এমন ধরনের কথা হাজারি কখনও পদ্মবিয়ের মুখে শোনে নাই। সেই পদ্ম আজ কি কথা বলিতেছে তাহাকে?

হাজারি গলিয়া গেল। সে ভুলিয়া গেল যে সে একজন বড় হোটেলের মালিক—পদ্মদিদি তাহার মনিবের দরের লোক, তাহার মুখের এ কথা যেন হাজারির জীবনের স্বর্ষ্যস্পর্শ পূর্বস্কার। এরই আশায় যেন সে এতদিন রাণাঘাটের রেলবাজারে এত কষ্ট করিয়াছে।

অন্য লোক হাজারি ভাল বলুক, পদ্মদিদির ভাল বলা তাদের চেয়ে অনেক উচ্চ, অনেক বেশী মূল্যবান।

কিন্তু পদ্ম যাহা বলিতেছে, তাহা যে হয় না এ কথা সে পদ্মকে কি করিয়া বুঝাইবে? যখন সে গোপালনগরের চাকুরি ছাড়িয়া পুনরায় চক্রান্ত মশায়ের হোটেল চাকুরি লইয়াছিল—তখনও উহার যদি তাহাকে না তাড়াইয়া দিত, তো নিজস্ব হোটেল খুলিবার কল্পনাও তাহার মনে আসিত না। উহাদের হোটেল পুনরায় চাকুরি পাইয়া সে মহা সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছিল নিজেকে—কেন তাহাকে উহার তাড়াইল।

এখন আর হয় না।

এখন সে নিজের মালিক নয়, কুসুমের টাকা ও অতসী-মার টাকা হোটলে খাটিতেছে, তাহার উন্নতি-অবনতির সঙ্গে অনেকগুলি প্রাণীর উন্নতি-অবনতি জড়ানো। নিজের খেয়াল-খুশিতে বা-তা করা এখন আর চলবে না।

টোপির ভবিষ্যৎ দেখিতে হইবে—টোপি আর নয়েন।

অনেক দূর আগাইয়া আসিয়াছে—আর এখন পিছানো চলে না।

হাজারি পদ্মবিয়ের মুখের দিকে দৃষ্টি ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আমার ইচ্ছে করে পদ্মদিদি। কিন্তু এখন যাওয়া হয় কি করে তুমিই বল!

পদ্ম যে কথাটা না বোঝে তা নয়, সে নিতান্ত মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। হাজারির কথার কোনো জবাব না দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কিছুক্ষণ পরে একটা কাপড়-জড়ানো ছোট পুটুলি আনিয়া হাজারির সামনে রাখিয়া বলিল—পড়তে জান তো, পড়ে দেখ না?

হাজারি পড়িতে জানে না তাহা নয়, তবে ও কাজে সে খুব পারদর্শী নয়। তবু পদ্মদিদির সম্মুখে সে কি করিয়া বলে যে সে ভাল পড়িতে পারে না! পুটুলি খুলিয়া সে দেখিল, খানকয়েক কাগজ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু নাই।

পদ্মবি তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। সে নিজেই বলিল—কখনো হ্যান্ড-নোট, তা সবসুদ্ধ সত-শ টাকার হ্যান্ডনোট। কতাকে আমি টাকা দেই যখনই দরকার হয়েছে তখন। নিজের হাতের চুড়ি বিক্রি করি, কানের ঝাকড়ি বিক্রি করি—ছিল তো সব, তখন এইসিতির ছিলাম, দুখানা সোনাদানা ছিল তো অঙ্গে।

হাজারি বিস্মিত হইয়া বলিল—তুমি টাকা দিয়েছিলে পদ্মদিদি?

—দেই নি তো কার টাকার হোটেল চলছিল এতদিন? বা কিছু ছিল সব ওর পেছনে খইয়েছি।

—কিছু টাকা পাও নি?

—পেটে খেয়েছি আমি। আমার বোনাকি, আমার এক দেওর-পো এই পর্যন্ত। পরস্যা যে একেবারে পাই নি তা নয়—তবে কত আর হবে তা? বোনাকির বিয়েতে কস্তা-বশায় এক-শ টাকা দিয়েছিলেন—সে আদ্য সাত বছরের আগের কথা। সাত-শ টাকার সদ্য ধর

কত হয় ?

—টাকা অনেক দিন দিয়েছিলে :

—আজ ন-বছরের ওপর হ'ল। ওই এক-শ টাকা ছাড়া একটা পয়সা পাই নি—কর্তা-মশায় কেবলই বলে আসছেন একটু অবস্থা ভাল হোক হোটেলের—সব হবে, দেব।

—ওঁকে আগে থেকে জানতে নাকি, না রূপাঘাটে আলাপ ?

—সে-সব অনেক কথা ঠাকুর। উনি আমাদের গাঁ ফুলে-নবলার চক্রান্তদের বাড়ীর ছেলে। ওঁর বাবার নাম ছিল তারাচাঁদ চক্রান্ত—বড় ভাল লোক ছিলেন তিনি। অবস্থাও ভাল ছিল তাঁর—আমাদের কর্তা হচ্ছেন তারাচাঁদ চক্রান্তর বড় ছেলে। লেখাপড়া তেমন শেখেন নি, বললেন রূপাঘাটে গিয়ে হোটেল করব, পশ্ম কিছু টাকা দিতে পার ? দিলাম টাকা। সে আজ হয়ে গেল—

হাজারি ঠাকুরের মনে কৌতূহল জাগিলেও সে দেখিল আর অন্য কোনো প্রশ্ন পশ্ম-দিদিকে না করাই ভাল। গ্রামে এত লোক থাকিতে তারাচাঁদ চক্রান্তর বড় ছেলে তাহার কাছেই টাকা চাহিল কেন, সেই বা টাকা দিল কেন, রূপাঘাটে বেচুর হোটেল তাহার কি-গিরি করা নিতান্ত দৈবাধীন যোগাযোগ না পূর্ষ হইতেই অবলম্বিত ব্যবস্থার ফল—এসব কথা হাজারি জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া বাইত না।

কিন্তু হাজারির বয়স হইয়াছে, জীবনে তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছে কম নয়, সে এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন না করিয়া বলিল—হ্যাঁডনেটগুলো তুলে রেখে দাও পশ্মদিদি ভাল করে। সব ঠিক হয়ে যাবে, টাকাও তেমনি হয়ে যাবে—এগুলো রেখে দাও।

পশ্ম কি রকম এক ধরনের হাসি হাসিয়া বলিল—ও সব তুলে রেখে কি করব ঠাকুর ! ওসব কোন কালে তামাদি হয়ে ভূত হয়ে গিয়েছে। পড়ে দেখ না ঠাকুর—

হাজারি অপ্রতিভ হইয়া শূন্য বলিল—ও !

—যা ছিল কিছু নেই ঠাকুর, সব হোটেলের পেছনে দিয়েছি—আর কি আছে এখন হাতে, ছাই বলতে রাইও না।

শেষের কথাগুলি পশ্মঝি যেন আপন মনেই বলিল, বিশেষ কাহাকেও উদ্দেশ্য করিয়া নহে। হাজারি অত্যন্ত দুঃখিত হইল। পশ্মঝির এমন অবস্থা সে কখনও দেখে নাই, ভিতরের কথা সে জানিত না, মিছামিছি কত রাগ করিয়াছে পশ্মদিদির উপর !

আরও কিছুরূপ বসিয়া হাজারি চলিয়া আসিল, সে কিছুই যখন করিতে পারিবে না আপাততঃ—তখন অপরের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া লাভ কি ?...

বাসায় ফিরিতেই সে এমন একটি দৃশ্য দেখিল যাহাতে সে একটি অশ্রুত ধরনের আনন্দ ও তৃপ্তি অনুভব করিল।

বাহরের দিকে ছোট ঘরটার মধ্যে টেঁপের গলা। সে বলিতেছে—নরেনদা, চা না খেয়ে কিছুতেই আপনি এখন বেতে পারবেন না। বসুন।

নরেন বলিতেছে—না, একবার এ-হোটেল-খেতে হবে, তুমি বোঝ না আশা, ইস্টিশানের হোটেল এখন তো বন্ধ—কিন্তু নামাধার আসবার আগে এ-হোটেলের সব দেখাশুনো আমায় করতে হবে।

টেঁপের ভাল নম চম আশালতা, হাজারি নিজেরই তা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—নরেন ইতিমধ্যে কোথা হইতে তাহার সন্ধান পাইল !

টেঁপ পুনরায় আবদারের সুরে বলিল—না ওসব কাজটাজ থাকুক, আপনি আমাকে আর মাকে টক দেখাতে নিয়ে যাবেন বলেছিলেন—আজ নিয়ে যেতেই হবে।

—কি আছে আজ ?

বি. র. মূলভ ২য়—১৮

—আনব ? একখানা টাকির কাগজ রয়েছে ও ঘরে। ঢাক বাজিয়ে কাগজ বিলি করে যাচ্ছিল ওবেলা খোকা একখানা এনেছে—

—যাও চট্ করে গিয়ে নিয়ে এস।

হাজারির ইচ্ছা ছিল না উহাদের কথাবার্তায় সে বাধা দেয়। এমন কি সে এক প্রকার নিঃশব্দেই রোয়াক পার হইয়া যেমন উত্তরের ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়াছে, অমনি টেঁপি টাকির কাগজের সন্ধানে আসিয়া একেবারে বাবার সামনে পাড়িয়া গেল।

টেঁপি পাছে কোনপ্রকার লজ্জা পায়—এজন্য হাজারি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল—এই যে টেঁপি। তোর মা কোথায় ?

টেঁপি হঠাৎ যেন কেমন একটু জড়সড় হইয়া গেল। মূখে বলিল—কে, বাবা ! কখন এলে ? টের পাই নি ভে ?

হাজারির কিন্তু মনে হইল টেঁপি তাহাকে দেখিয়া খুব খুশি হয় নাই। যেন ভাবিতেছে, আর একটু পরে বাবা আসিলে ক্ষতিটা কি হইত।

হাজারির বৃকের ভিতরটা কোথায় যেন বেদনায় টনটন করিয়া উঠিল। মেয়ে-সন্তান, আহা বেচারী ! সব কথা কি ওরা গুঁছিয়ে বলতে পারে, না নিজেরাই বৃকিতে পারে ? টেঁপি কি জানে তার নিজের মনের খবর কি ?

হাজারি বলিল—আমি এখনি হোটেলের বেরিয়ে যাব টেঁপি। বেলা পাঁচটা বেজে গিয়েছে, আর থাকলে চলবে না। এক গ্লাস জল বরং আমার দে—

ওঘর হইতে নরেন ডাকিয়া বলিল—মামাবাবু, কখন এলেন ?

হাজারি যেন পূর্বে নরেনের কথাবার্তা শুনিতে পায় নাই বা এখানে নরেন উপস্থিত আছে সে-বিষয়ে কিছু জানিত না। এমন ভাব দেখাইয়া বলিল—কে নরেন ? কখন এলে বাবাজী ?

—অনেকক্ষণ এসেছি মামাবাবু—চলুন, আমিও হোটেলের বেরিয়েছি—

বলিতে বলিতে নরেন সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

হাজারি বলিল—একটু জলটল খেয়ে যাও না ? হোটেলের এখন ধোয়ার মধ্যে গিয়েই বা করবে কি ? বস বস বরং। টেঁপি তোর নরেনদার জন্য একটু চা—

—না না থাক মামাবাবু, হোটেলের তো চা এমনিই হবে এখন।

—তা হোক, আমার বাসায় যখন এসেছ, তখন এখান থেকেই চা খেয়ে যাও।

বলিয়া হাজারি বাড়ীর মধ্যের ঘরের দিকে সরিয়া গেল। টেঁপির মা তখনও রান্না-ঘরের দাওয়ার একখান মাদুর বিছাইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে দেখিতে পাইল। বেচারী চিরকাল খাটিয়া মরিয়াছে এঁড়েশোলা গ্রামে—এখন চাকরে যখন প্রায় সব কাজই করিয়া দেয় তখন সে জীবনটাকে একটু উপভোগ করিয়া লইতে চায়।

হাজারি শ্রীকেও জাগাইল না। সবাই মিলিয়া বড় কট করিয়াছে চিরকাল এখন সুখের মত যখন দেখিতেছে—তখন সে তাহাতে বাদ সাধিবে না। টেঁপির মা ঘুমাইয়া থাকুক।

বাড়ীর বাহির হইতে যাইতেছে, নরেন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে লাজুক সরে বলিল—মামাবাবু—এই গিয়ে আশা বলছিল—মামামাকে নিয়ে আর ওকে নিয়ে একবার টক দেখিয়ে আনার কথা—তা আপনি কি বলেন ?

টেঁপিই যে একথা তাহার কাছে বলিতে নরেনকে অনুরোধ করিয়াছে, এ বিষয়ে হাজারির সন্দেহ রহিল না। তাহার মনে কৌতুক ও আনন্দ দুই-ই দেখা দিল। ছেলে-মানুষ সব, উহারা কি করে না-করে বলোবন্ধ লোকে সব বৃকিতে পারে, অথচ বেচারীরা

ভাবে তাহাদের মনের খবর কেহ কিছু রাখেন না।

সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—তা বাবে যাও না? আজই বাবে? পরমা-কড়ি সব তোমার মামীমার কাছে আছে, চেয়ে নাও! কখন ফিরবে?

—রাত আটটা হবে মামাবাবু—আপনি নিজে ইন্সটিশানে যদি গিয়ে বসেন একটু—

—আচ্ছা তা হোক, ইন্সটিশানে আমি যাব এখন, সে তুমি ভেবো না। তুমি ওদের নিয়ে যাও—ও টেঁপি ডেকে দে তোর মাকে। অবৈল্য পড়ে ঘুমুচ্ছে, ডেকে দে। বাস যদি তবে সব তৈরি হয়ে নে—

হাজারি আর বিলম্ব না করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল। বালকবালিকাদের আমোদের পথে সে বিখ্য সৃষ্টি করিতে চায় না। প্রথমে বাজারের হোটেলে আসিয়া এ-বেলার রান্নার সব ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বেলা পড়িলে সে আসিল স্টেশন প্ল্যাটফর্মের হোটেলে। এখানে সে বড় একটা বসে না। নরেনই এখানকার ম্যানেজার। এ সব সাহেবী ধরণের ব্যবস্থা তাহার যেন কেমন লাগে।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। *চাটগাঁ মেল আসিবার বেশী বিলম্ব নাই—বনগ্রামের গাড়ীও এখনি ছাড়িবে। এই সময় হইতে রান্নি সাড়ে এগারোটো পর্যন্ত সিরাজগঞ্জ, ঢাকা মেল, নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস প্রভৃতি বড় বড় দূরের ট্রেনগুলির ভিড়। যাত্রীরা যাতায়াত করে বহু অনেকেই খার। হাজারির আশা ছাড়াইয়া গিয়াছে এখানকার খরিদ্দারের সংখ্যা।

স্টেশনের হোটেলে দুজন নতুন লোক রান্না করে। এখানে বেশী ভাগ লোক চায় ভাত আর মাংস—সেজন্য ভাল মাংস রান্না করিতে পারে এরূপ লোক বেশী বেতন দিয়া রাখিতে হইতেছে। পরিবেশন করিবার জন্য আছে তিনজন চাকর—এক-একদিন ভিড় এত বেশী হয় যে, ও হোটেল হইতে পরিবেশনের লোক আনাহিতে হয়।

হাজারিকে দেখিয়া পাচক ও ভৃত্যরা একটু সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সকলেই জানে হাজারি তাহাদের আসল মনিব, নরেন ম্যানেজার মাত্র। তাহারা ইহাও ভাল জানিয়াছে যে হাজারির পদতলে বাঁসিয়া তাহারা এখন দশ বৎসর রান্না-কাজ শিখিতে পারে—সুতরাং হাজারিকে শ্রদ্ধা তাহারা যে মনিব বলিয়া সমীহ করে তাহা নয়, ওস্তাদ কারিগর বলিয়া শ্রদ্ধা করে।

একজন রাঁধুনীর নাম সতীশ দীঘড়ি। বাড়ী হুগলী জেলার কোনো পাড়াগাঁয়ে, রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। খুব ভাল রান্নার কাজ জানে, পুর্বে ভাল ভাল হোটেলের মোটা মাহিনায় কাজ করিয়াছে—এমন কি একবার জাহাজে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত গিয়াছিল—সেখানে এক শিখ হোটেলেরও কিছুদিন কাজ করিয়াছে। সতীশ নিজে ভাল রাঁধুনী বলিয়া হাজারির মম্ম খুব ভাল করিয়াই বোঝে এবং যথেষ্ট সম্মান করিয়া চলি।

হাজারি তাহাকে বলিল—কি দীঘড়ি মশাই, রান্না সব তৈরী হইলো?

সতীশ বিনীত সুরে বলিল—একবার দয়া করে আসুন না কর্তা, মাংসটা একবার দেখুন না?

—ও আমি আর কি দেখব, আপনি মোখানে রয়েছেন—

—অমন কথা বলবেন না কর্তা, আপনি কেউ আপনাকে বোঝে না-বোঝে আমি তো আপনাকে জানি—এসে একবার দেখিয়ে যান—

হাজারি রান্নাঘরে গিয়া কড়ম্ব মাংসের রং দেখিয়া বলিল—রং এরকম কেন দীঘড়ি মশায়?

সতীশ উৎফুল্ল হইয়া অপর রাঁধুনীকে বলিল—বলেছিলাম না কান্টিক? কর্তা চোখ দেখলেই ধরে ফেলবেন? কুঁদের মুখে বাঁক থাকে কখনো? কর্তা যদি কিছু যেন না করেন, কি দোষ হয়েছে আপনাকে ধরে দিতে হবে আজ।

হাজারি হাসিয়া বলিল—পরীক্ষা দিতে হবে দীর্ঘাড়া মশাই আবার এ বয়সে ? লক্ষ্যের বাটনা হয় নি—পূরনো লক্ষ্য, তাতেই রং হয় নি। রং হবে শুধু লক্ষ্যের গুণে।

—কর্ত্তা মশাই, মাধে কি আপনার পায়ের ধুলো মাখায় নিতে ইচ্ছে করে ? কিন্তু আর একটা দোষ হয়েছে সেটাও ধরুন।

হাজারি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাংসের কড়ার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল—কবানাংসে যে গরম জল ঢেলাইছিল, তা ভাল ফোটে নি। সেই জন্যে প্যাজা উঠেছে। ওতে মাংস জঠর হয়ে যাবে।

সতীশ অন্য পাচকের দিকে চাহিয়া বলিল—শোন কার্ত্তিক, শোন। আমি বলছিলাম না তোমায় জল ঢালবার সময় যে এতে প্যাজা উঠেছে আর মাংস নরম হবে না ? আর কর্ত্তামশায় না দেখে কি করে বন্ধ ফেলেচেন দয়খ। ওস্তাদ বটে আপনি কর্ত্তা।

হাজারি হাসিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় চট্টগ্রাম মেল আসিয়া সশব্দে প্রমটফর্মের ঢুকিতেই কথার সূত্র ছিঁড়িয়া গেল। হোটেলের লোকজন অন্যদিকে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

বেশ ভালো ঘর। বিজলী আলো জ্বলিতেছে। মার্শেল পাথরের টেবিলে বাবু খরিন্দারেরা খাইতেছে চেয়ারে বসিয়া। ভীষণ ভিড় খরিন্দারের—ওদিকে বনগা লাইনের স্টেশনও আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কলরব, হৈ-ঠে, বাস্ততা, পরসা গুনিয়া ক্ল করা যায় না—এই তো জীবন। বেচু চক্রান্তির হোটেলের রান্নাঘরে বসিয়া হাতাবোড়ি নাড়িতে নাড়িতে এই রকম একটা হোটেলের কল্পনা করিতে সে কিন্তু কখনও সাহস করে নাই। এত সুখও তার অদ্ভুত ছিল! পশ্চাদ্দিগের কত অপমান আজ সাধক হইয়াছে এই অপ্রত্যাশিত কর্মব্যস্ত হোটেল-জীবনের মধ্যে। আজ কাহারও প্রতি তাহার কোন বিষয় নাই।

হঠাৎ হাজারির মনে পড়িল চাকদহ হইতে হাটপথে গোপালনগরে খাইবার সময় সেই ছোট্ট গ্রামের গোয়ালাদের বাড়ীর বধূটির কথা। হাজারি তাহাকে কথা দিয়াছিল তাহার টাকা হাজারি ব্যবসায় খাটাইয়া দিবে। সে কাল যাইবে। গরীব মেয়েটির টাকা খাটাইবার এই ভাল ক্ষেত্র। বিশ্বাস করিয়া দিতে চাহিল হাজারির দৃঃসময়ে—দৃঃসময়ে সেই সরলা মেয়েটির দিকে তাহাকে চাহিতে হইবে। নতুবা ধর্ম্ম থাকে না।

পরদিন সকালেই হাজারি নতুন পাড়া রওনা হইল। চাকদা স্টেশন পর্য্যন্ত অবশ্য স্ট্রেনে আসিল—বাকী পথটুকু হাঁটিয়া চলিল।

সেই রকম বড় বড় তেলুল গাছ ও অন্যান্য গাছের জঙ্গলে দিনমানেই এ পথে অশ্বকার। হাজারির মনে পড়িল সেবার যখন সে এ পথে গিয়াছিল, তখন রাণাঘাট হোটেলের চাকুরি তাহার সবে গিয়াছে—হাতে পরসা নাই, পথ হাঁটিয়া এই পথে সে চাকুরি খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল। আর আজ ?

আজ অনেক তফাৎ হইয়া গিয়াছে। এখন সে রাণাঘাটের রাজারের দুটি বড় হোটেলের মালিক। তার অধীনে দশ-বারো জন স্লোক রাটে। যে মেয়েটির জন্য আজ তার এই উন্নতি, হাজারির সংখা নাই তাহার বিধু মাত প্রতাপকার সে করে—অতসী-রা কড়মানুষের মেয়ে, তার উপর সে বিশ্বাসিতা—হাজারি তাহাকে কি দিতে পারে ?

কিন্তু তাহার বদলে যে দুটি-একটি সরলা দারিদ্র মেয়ে তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, সে তাহাদের ভাল করিবার চেষ্টা করিতে পারে। নতুন পাড়ার গোয়াল-বউটি ইহাদের মধ্যে একজন। নতুন পাড়া পেঁপীছিতে বেলা প্রায় নটা বাজিল। গ্রামের মধ্যে হঠাৎ না ঢুকিয়া হাজারি পথের ধারের একটা তেলুলগাছের ছায়ায় কাহাদের একখানা গরুর গাড়ী পড়িয়া আছে, তাহার উপর আসিয়া বসিল। সন্ধ্যাংশে ঘাম, একহাটী ধুলো—একটু জিরাইয়া

লইয়া ঘাম মারলে সম্মুখের ক্ষুদ্র ডোবাটার জলে পা ধুইয়া জুতা পায়ে দিয়া ভদ্রলোক সাজিয়া গ্রামে ঢোকাই হুস্তিসঙ্গত।

একটি প্রৌঢ়বয়স্ক পথিক বশোরের দিক হইতে আসিতেছিল, হাজারিকে দেখিয়া সে কাছে গিয়া বলিল—দেশলাই আছে?

—আছে, বসুন।

—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

—প্রণাম হই, একটু পায়ের ধুলো দেন ঠাকুরমশাই।

লোকটির নাম কৃষ্ণলাল, জাতিতে শাঁখারি, বাড়ী পূর্ষবঙ্গ অঞ্চলে। কথাবার্তার বেশ টান আছে পূর্ষবঙ্গের। বনগ্রামে ইছামতীর ঘাটে তাহাদের শাঁখার বড় ভড় নোঙর করিয়া আছে, কৃষ্ণলাল পায়ে হাঁটরা এ অঞ্চলের গ্রামগদালি এবং ক্রেতার আনুমানিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখিতে বাহির হইয়াছে।

কাজের লোক বেশীকণ বসে না। একটা বিড়ি ধরাইয়া শেষ করিবার পূর্বেই কৃষ্ণলাল উঠিতে চাহিল। হাজারি কথাবার্তার তাহাকে বসাইয়া রাখিল। বনগাঁ হইতে সতেরো মাইল পথ হাঁটরা ব্যবসার খোঁজ লইতে বাহির হইয়াছে বে লোক, তাহার উপর অসমীম শ্রদ্ধা হইল হাজারির। ব্যবসা কি করিয়া করিতে হয় লোকটা জানে।

সে বলিল—গাঁজাটোজা চলে? আমার কাছে আছে—

কৃষ্ণলাল একগাল হাসিয়া বলিল—তা ঠাকুরমশায়—পেরসাদ যদি দেন দয়া করে—তবে তো ভাগি।

—বোসো তবে, এক ছিলিম সাজি।

হাজারি খুব বেশী যে গাঁজা খায় তা নয়। তবে উপযুক্ত সঙ্গী পাইলে এক-আধ ছিলিম খাইয়া থাকে। আজকাল রাণাঘাটে গাঁজা খাইবার সুবিধা নাই, হোটেলের সকলে খাতির করে, তাহার উপর নরেন আছে—এই সব কারণে হোটলে ও ব্যাপার চলে না—বাসায় তো নয়ই, সেখানে টেঁপ আছে। আবার যাহার তাহার সঙ্গেও গাঁজা খাওয়া উচিত নয়, তাহাতে মান থাকে না। আজ উপযুক্ত সঙ্গী পাইয়া হাজারি হৃষ্টমনে ভাল করিয়া ছিলিম সাজিল। কলিকটি ভদ্রতা করিয়া কৃষ্ণলালের হাতে দিতে মাইতেই কৃষ্ণলাল এক হাত জিভ কাটিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—বাপরে, আপনারা দেবতা! পেরসাদ করে দিন আগে—

কথায় কথায় হাজারি নিজের পরিচয় দিল। কৃষ্ণলাল খুশি হইল, সেও বাজে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে না—নিজের চেষ্টায় যে রাণাঘাটের বাজারে দুটি বড় বড় হোটেলের মালিক, তাহার সহিত বসিয়া গাঁজা খাওয়া যায় বটে।

হাজারি বলিল—রাণাঘাটে তো যাবে, আমার হোটেলেরই উঠো। রেলবাজারে আমার নাম বললেই সবাই দেখিয়ে দেবে। পরসাদ দিও না কিন্তু, আমি সেই দিয়ে দিচ্ছি—তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

কৃষ্ণলাল পুনরায় হাতজোড় করিয়া বলিল—আজ্ঞে ওইটি মাপ করতে হবে কর্তা। আপনার হোটেলেরই উঠো—কিন্তু বিনি পরসাদ খেতে পারব না। ব্যবসায় নিয়ম তা নয়, নেচা নেবে, নেচা দেবে। এ না হলে ব্যবসা চলে না। ও হুকুম করবেন না ঠাকুরমশায়।

বেশ, তা যা ভাল বোঝো।

কৃষ্ণলাল পুনরায় পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

হাজারি গ্রামের মধ্যে ঢুকিয়া গ্রীচরণ ঘোষের বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিল। গ্রীচরণ ঘোষ বাড়ীতেই ছিল, হাজারিকে দেখিয়া চিনিতে পারিল তখনই। এসব স্থানে কালে-ভদ্রে লোকজন আসে—কাজেই মানুষের মুখ মনে থাকে অনেক দিন।

বউটি সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিল। গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বলেছিলেন যে দু-মাসের মধ্যে আসবেন খুড়োমশায়? দু-বছর আড়াই বছর হয়ে গেল যে! মনে পড়ল এতদিন পরে মেয়ে বলে?

—তা তো পড়লো মা। এস সাবিত্রীসমান হও মা, বেশ ভাল আছ?

—আপনি যেরকম রেখেছেন। আপনাদের বাড়ীর সব ভাল খুড়োমশায়?

—তা এখন একরকম ভাল।

—কুসুমদিদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ভাল আছে?

—হ্যাঁ, ভাল আছে।

—আমার কথা বলেছিলেন?

হাজারি বিপদে পড়িল। ইহার এখন হইতে সেবার সেই বাইবার পরে গোপাল নগরে চাকুরি করিল অনেক দিন, তারপর কতদিন পরে রাণাঘাটে গিয়া কুসুমের সহিত দেখা—ইহার কথা তখন কি আর মনে ছিল?

—ইয়ে, ঠিক মনে পড়ছে না বলেছিলাম কিনা। নানা কাজে ব্যস্ত থাকি, সব সময় সব কথা মনেও পড়ে না ছাই। বড়োও তো হয়েছি মা—

—আহা বড়ো হয়েছেন না আরও কিছু! আমার পিসেমশায়ের চেয়ে আপনি তো কত ছোট!

—কে গঙ্গাধর? হ্যাঁ, তা গঙ্গাধর আমার চেয়ে অন্ততঃ ষোল-সতেরো বছরের বড়।

—বসুন খুড়োমশায়, আমি আপনার হাত-পা ধোয়ার জল আনি—

গ্রীচরণ ঘোষ তামাক সাজিয়া আনিয়া হাতে দিয়া বলিল—আপনি তো দাঠাকুর বউমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক—সব শুনোঁচ আমরা সেবার আপনি চলে গেলে বউমা সব পরিচয় দেলেন।

হাজারি বলিল—সে বউটির বাপের বাড়ীর গাঁয়ের লোক নয়, তবে তাহার পিসিমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের লোক বটে এবং বউয়ের পিতৃকুলের সহিত তাহার বহুদিন হইতে জানাশোনা আছে বটে।

গ্রীচরণ বলিল—দাঠাকুর আমরা ছোট জাত, বলতে সাহস হয় না—যখন এবার পারের খুলো দিয়েছেন তখন দু-চার দিন এখানে এবার থাকুন না কেন? বউমারও বস্তু সাধ আপনি দুদিন থাকেন, আমরা বলতি বলেচে আপনাকে।

—হ্যাঁ, আমি আসি।

সুদূর হয়েছে এই দশা। তা আপনি আসবেন বলেছিলেন আসুন না? ঐ দু'লালের ভিটেতে ঘর ভুলান কিংবা চলে আসুন আমার এই রাস্তার ধারের জমি দিচ্ছি আপনাকে। আমাদের গাঁয়ে এখন লোকের দরকার—আপনি আসুন, খুব ভাল ধানের জমি দেখে আপনাকে আর আম-কাঁঠালের বাগান। কত চান : বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান পড়ে রয়েছে ঘোর জঙ্গল হয়ে পুঁথু পাড়ায়। লোক নেই মশায়, কে ভোগ করবে আম-কাঁঠালের বাগান? আপনি আসুন, চারখানা বড় বড় বাগান আপনাকে জমা দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের গাঁয়ের মত খাদ্যসুখ কোথাও পাবেন না, আর এত সম্ভা! দুধ বলুন, ফলকল্লুরি বলুন, মাছ বলুন—সব সম্ভা।

হাজারি ভাবিল, জিনিস সম্ভা না হইয়া উপায় কি? কানিবার লোক কে আছে? একটা কথা তাহার মনে হওয়াতে সে বিহারী বাঁড়ুবোকে জিজ্ঞাসা করিল—গাঁয়ে লোক নেই তো জিনিসপত্র তৈরী করে কে? এই তরি-তরকারি দুধ?

বাঁড়ুবোমশায় বলিলেন—ওই যে—আপনি বুঝতে পারলেন না! ভদ্দলোক মরে হেজে যাচ্ছে কিন্তু চাষালোকের বাড়বাড়ন্ত খুব। সিম্লে গাঁয়ের বাইরে মাঠের মধ্যে দেখবেন একশো ঘর চাষী কাওরী আর বুনোর বাস। ওদের মধ্যে মশায় ম্যালেরিয়া নেই, যত রোগ বানাই সব কি এই ভদ্দরলোকের পাতায় মশায়? পাড়াকে পাড়া উজ্জোড় করে দিলে একেবারে রোগে!

বিহারী বাঁড়ুবোয় চারিটি ছেলে, বড় ছেলোটর বছরখানেক হইল বিবাহ দিয়াছেন, বলিলেন। সে ছেলোটর স্বাস্থ্য এত খারাপ যে হাজারির মনে হইল এ গ্রামে আর দু-তিন বছর এভাবে যদি ছেলোট কাটায় তবে বাঁড়ুবো মশায়ের পুত্রবধূকে কপালের সিঁদুর এবং হাতের নোয়ার মারা কাটাইতেই হইবে।

কিন্তু সে ছেলোটর বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইবার উপায় নাই, জমিজমা, চাষ-আবাদের সমস্ত কাজই তাহাকে দেখিতে হয়—বন্ধ বাঁড়ুবো মশায় একরূপ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বড় ছেলোটই একমাত্র ভরসা। তাহার উপর ছেলোট লেখাপড়া এমন কিছু জানে না যে বিদেশে বাহির হইয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারে, তাহার বিদ্যার দৌড় গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক পাঠশালা পর্যন্ত—শুধু তাহার কেন, অন্য ছেলেগুলিরও তাই।

তবুও হাজারি বলিল—বাঁড়ুবোমশায় একটা কথা বলি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আপনার একটি ছেলেকে আমি রাগাঘাটে নিয়ে গিয়ে হোটেলের কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারি—ক্রমে বেশ উন্নতি করতে পারে—

বিহারী বাঁড়ুবো বলিলেন—ভাত-বোচা হোটেল? না, মাগ করবেন। ও-সব আমাদের দ্বারা হবে না। আমাদের বংশে ও-সব কখনো—ও কাজ আমাদের নয়।

হাজারি আর কিছু বলিতে সাহস করিল না।

শ্রীনগর সিম্লে হইতে বাহির হইয়া যখন সে আবার বড় রাস্তায় উঠিল তখন সেবার-কারের মতই সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এমন নিরুপদ্রব নিশ্চিত সুখ মৃত্যুর সামিল—ও সুখ তাহার সহ্য হইবে না।

গোপালনগরে পৌঁছিতে বেলা পাঁচটা বাজিল।

গোপালনগরের কুন্ডবাড়ী পৌঁছিতেই হাজারি যথেষ্ট শান্তির পাইল। কুন্ডুদের বড়কর্তা খুশি হইয়া বলিলেন—আরে, হাজারি ঠাকুর যে, কোথায় ছিলেন এতদিন? আসুন—আসুন।

বাড়ীর মেয়েরাও খুশি হইল। হাজারি ঠাকুরের রম্মা সম্বন্ধে নিজেরদের মধ্যে আজও তাহারা বলাবলি করে। লোকটা যে গুণী এ বিষয়ে বাড়ীর লোকদের মধ্যে মতভেদ নাই। ইহারা হাজারির পুরানো মনিব স্মরণে সে ইহাদের ন্যায় প্রাপ্য সম্মান দিতে চেষ্টা করিল

না। বড়বাবুর স্ত্রী বলিলেন—ঠাকুরমশায়, দু-দিনের ছুটি নিয়ে গেলেন, আর দু-বছর দেখা নেই, ব্যাপার কি বলুন তো? মাইনে বাকী, তাও নিলেন না। হয়েছিল কি?

ইহারা ব্রাহ্মণকে ষষ্ঠে সন্মান করিয়া থাকে, রসুইয়ে ব্রাহ্মণের প্রতিও সে সন্মান প্রদর্শনের কার্পণ্য নাই। মেজকর্তার মেয়ে নিম্নলিখিত সেবার বিবাহ হইয়াছিল—সে শ্বশুরবাড়ীতে থাকিবার সময়ই হাজারি উহাদের চাকুরি ছাড়িয়া দেয়। নিম্নলিখিত এখানে সম্প্রতি আসিয়াছে, সে হাজারির পায়ের ধোলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—বেশ আপনি, শ্বশুরবাড়ী থেকে এসে দেখি আপনি আর নেই! উনি সেই বিয়ের পরদিন আপনার হাতের রান্না খেয়ে গেছিলেন, আমায় বললেন—তোমাদের ঠাকুরটি বড় ভাল। ওর হাতের রান্না আর একদিন না খেলে চলবে না, ওমা, এসে দেখি কোথায় কে!—কোথায় ছিলেন এতদিন? সেই রকম মাংস রাখুন তো একদিন। এখন থাকবেন তো আমাদের বাড়ী?

হাজারির কণ্ঠ হইল ইহাদের কাছে প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে। তবুও বলিতে হইল। নিম্নলিখিত বলিল—তোমার আমি মাংস রেখে খাইয়ে যাব মা, দু-দিন তোমাদের এখানে থেকে সকলকে নিজের হাতে রসুই করে খাওয়াব, তারপর যাব।

বড়কর্তা শুনিয়া খুশি হইয়া বলিলেন—রাগাঘাটের প্র্যাক্টিসের সে নতুন হোটেল আপনার? বেশ, বেশ! আমরা ব্যবসাদার মনুষ্য ঠাকুরমশায়, এইটে বুঝি যে চাকরি করে কেউ কখনও উন্নতি করতে পারে না। উন্নতি আছে ব্যবসাতে, তা সে যে কোন ব্যবসাই হোক। আপনি ভাল রাখেন, ওই হোটেলের ব্যবসাই আপনার ঠিক-মত ব্যবসা—যেটা যে বোঝে বা জানে। উন্নতি করবেন আপনি।

আসিবার সময় ইহারা হাজারিকে এক জোড়া খুঁটি উড়ানি দিল এবং প্রাপ্য বেতন বাহা বাকী ছিল সব চুকাইয়া দিল। হাজারি বেতন লইতে আসে নাই, কিন্তু উহা তাহার বলা সাজে না। সন্মানের সহিত হাত পাতিয়া সে টাকা ও কাপড় গ্রহণ করিয়া গোপাল-নগর হইতে বিদায় লইল।

রাগাঘাট স্টেশনে নামিতেই নরেনের সঙ্গে দেখা। সে বলিল—কোথায় গিয়েছিলেন মামাবাবু? বাড়ীসুদ্ধ সব ভেবে খুন। কাল রেলওয়ে ইম্পেটের এসেছিল, আমাদের হোটেল দেখে খুব খুশি হয়ে গিয়েছে। স্টেশনের রিপোর্ট বইতে বেশ ভাল লিখেছে।

—টোপ ভাল আছে?

—হ্যাঁ, কাল আমরা সব টকি দেখতে গেলাম মামাবাবু। মামীমা, আমি আর আশালতা। মামীমা টকি দেখে খুব খুশি।

টোপের কথাটা সে মামীমার উপর দিয়াই চালাইয়া দিল।

—আর একটা কথা মামাবাবু—

—কি?

—কাল পক্ষ্মি এসে আপনার বাসায় মামীমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করে গেল। আর কুমুদাদি একবার আপনাকে দেখা করতে বলেছেন। উনিও কাল এসেছিলেন।

হাজারি বাড়ী ঢুকিতেই টোপ ওরফে আশালতা এবং তাহার মা দুজনই টকির গল্পে মগ্ন হইয়া উঠিল। জীবনে এই প্রথম, তাহারা কখনও ও-জিনিসের কল্পনাই করে নাই—আবার একদিন দেখিতেই হইবে—এইবার কিন্তু টোপ বাবাকে সঙ্গে না লইয়া ছাড়বে না। কাজ তো সব সময়েই আছে, একদিনও কি সময় করিয়া যাইতে নাই?

—কি গান গাইলে! চমৎকার গান, বাবা। আমি দুটো শিখে ফেলোছি।

—কি গান রে?

—একটা হোল 'তোমারি পথ চেয়ে থাকব বসে চিরদিন'—চমৎকার সুন্দর বাণী। শুনবে? বেশ গাইতে পারি এটা—

—থাক এখন আর দরকার নেই। অন্য সময়...এখন একটু কাজ আছে।

টোঁপ মনঃক্ষুব্ধ হইল। এমন গানটা বাবাকে শোনাইতে পারিলে খুঁশি হইত। তা নয় বাবার সব সময় কেবল কাজ আর কাজ!

টোঁপের মা বলিল—ওগো, কাল পক্ষ বলে এটা মেয়ে এসেছিল আমার সঙ্গে দেশা করতে। বেশ লোকটা। ওদের হোটেল তুমি নাকি কাজ করতে!...

হাজারি আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—কি বললে পক্ষদিদি?

—গল্প করলে বসে, পান সেজে দিলাম, খেলে। ওদের সে হোটেল উঠে বাচ্ছে। আর চলে না, এই সব বললে।

হাজারি এখনও পক্ষকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে। পক্ষদিদি—সেই দোন্দ-উপ্রতাপ পক্ষদিদি তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিল বেড়াইতে—তাহার স্ত্রীর সহিত যাচিয়া আলাপ করিতে—হাজারি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বিবেচনা করিল—পক্ষি তাহার বাড়ীতে পদখলি দিয়া যেন তাহাকে কৃতার্থ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

টোঁপ বলিল—বাবা, নরেনদাদাকে আমি নৈমন্ত্য করছি। নরেন-দা বলেছে আমাকে মাংস রোধে খাওয়াতে হবে। তুমি মাংস এনে দাও—

হাজারি এদিকের সব কাজ মিটাইয়া কুসুমের বাড়ী যাইবার জন্য রওনা হইল, পক্ষে ইতঃ পক্ষিয়ারের সঙ্গে দেখা। পক্ষিয়ারের পরনে মলিন বস্ত্র। কখনও হাজারি জীবনে যাহা দেখে নাই।

হাজারি বলিল—হাতে কি পক্ষদিদি? যাচ্ছ কোথায়?

পক্ষ হাজারিকে দ্বিধিয়া দাঁড়াইল, বলিল—ঠাকুরমশায়, কবে ফিরলে? হাতে তেঁতুল, একটু নিরে এলাম হোটেল থেকে।

হাজারি মনে মনে হাসিল। হোটেল হইতে লুকাইয়া জিনিস সরাইবার অভ্যাস এখনও যায় নাই পক্ষদিদির!

হাজারি পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পক্ষ বলিল—শোনো, দাঁড়াও না ঠাকুরমশায়! কাল তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম যে! বলে নি বৌদিদি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বলিছিল বটে।

—বৌদিদি লোক বড় ভাল, আমার সঙ্গে কত গল্প করলে। আর একদিন যাব।

—বা, যাবে বৈ কি পক্ষদিদি, তোমাদেরই বাড়ী। এখন ইচ্ছে হয় যাবে। হোটেল কেমন চলছে?

—তা মন্দ চলছে না। একরকম চলছে।

—বেশ বেশ। তাহলে এখন আসি পক্ষদিদি—

হাজারি চলিয়া গেল। ভাবিল—একরকম চলছে বললে অথচ কাল বাড়ীতে বসে গল্প করে এসেছে হোটেল আর চলে না উঠে যাবে। পক্ষদিদি ভাঙে ভো মচকার না!

কুসুমের বাড়ীতে হাজারি অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিল। কথায়-কথায় নতুন গায়ের বধূটির কথাও মনে পড়াতে হাজারি বলিল—ভাল কথা কুসুম মা, চেনো? এ'ডোশোলায় বনমালীর স্ত্রীর 'ভাইঝি'—তোমাদের দিদি বলে ডাকে একটি মেয়ে, বিয়ে হয়েছে নতুন গাঁ। কুসুম বলিল—খুব চিনি। ওর নাম তো সুবাসিনী। ওকে কি করে জানলেন জ্যাঠামশায়?

হাজারি বধূটির সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল, তাহার টাকা লইয়া আসা, হোটেল

ভাহাকে অংশীদার করার সঙ্কল্প।

কুসুম বলিল—এ তো বড় খুশির কথা। আপনার হোটেলের টাকা খাটলে ওর ভবিষ্যতে একটা হিল্লো হয়ে রইল।

—কিন্তু যদি আজ মরে যাই মা? তখন কোথায় থাকবে হোটেল?

—ও কথা বলতে নেই জ্যাঠামশায়—ছিঃ—

কুসুমের অবস্থা আজকাল ফিরিয়াছে। হাজারি তাহাকে শুধু মহাজন হিসাবে দেখে না, হোটেলের অংশীদার হিসাবে প্রতি মাসে ত্রিশ-বত্রিশ টাকা দেয়, মাসিক লাভের অংশ-স্বরূপ।

কুসুম বলিল—অমন সব কথা বলেন কেন, ওতে আমার কণ্ট হয়। আপনি ছিলেন তাই আজ রাণাঘাট শহরে মাথা তুলে বৈড়তে পারছি, ছেলোপলে দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পাচ্ছে। এই বাড়ী বাঁধা রেখে গিয়েছিলেন শ্বশুর, আপনাকে বলি নি সে-কথা, এতদিন বাড়ী বিক্রি হয়ে যেতো দেনার দায়ে, যদি হোটেল থেকে টাকা না পেতাম মাস মাস! ওই টাকা দিয়ে দেনা সব শোধ করে ফেলেছি—এখন বাড়ী আমার নামে। আপনার দৌলতেই সব জ্যাঠামশায়—আমার চোখে আপনি দেবতা।

হাজারি বলিল—উঠি আজ মা। একবার ইন্সটিশানের হোটেলটাতে যাব। একদল বড়লোক টেলিগ্রাম করেছে কলকাতা থেকে, দাক্ষিণীং মেলের সময় এখানে থানা থাকবে। তাদের জন্যে মাংসটা নিজের রাখবো। তারে তাই লেখা আছে।

দাক্ষিণীং মেলে চার-পাঁচটি বাবু নামিয়া হাজারির রেলওয়ে হোটেলের খাইতে আসিল। হাজারি নিজের হাতে মাংস রান্না করিয়াছিল। উহারা খাইয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া গেল—হাজারিকে ডাকিয়া আলাপ করিল। উহাদের মধ্যে একজন বলিল—হাজারি-বাবু, আপনার নাম কলকাতায় পৌঁছেছে জানেন তা? বড়ঘরে যারা পণ্ডাশ টাকা মাইনের ঠাকুর রাখে, তারা জানে রাণাঘাটের হিন্দু-হোটেলের হাজারি ঠাকুর খুব বড় রাখুন। আমাদের সেইটে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আজ আপনার এখানে আসা। তারে বলাও ছিল খাতে আপনি নিজের রাখেন। বড় খুশী হয়েছি খেয়ে।

ইহার কয়েক দিন পরে একখানা চিঠি আসিল কলকাতা হইতে। সেদিন বাহারা রেলওয়ে হোটেলের খাইয়া গিয়াছিল তাহারা পুনরায় দেখা করিতে আসিতেছে আজ ওবেলা, বিশেষ জরুরী দরকার আছে। সাড়ে তিনটার কুন্ধনগর লোকালে দুজন ভদ্রলোক নামিল। তাহাদের একজন সেদিনকার সেই লোকটি—যে হাজারির রান্নার অত সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছিল। অন্য একজন বাঙালী নয়—কি জাত, হাজারি চিনিতে পারিল না।

পূর্বের ভদ্রলোকটি হাজারির সঙ্গে অবশ্যলী ভদ্রলোকটির পরিচয় করাইয়া দিয়া হিন্দীতে বলিল—এর কথাই আপনাকে বলেছিলাম। এই সে হাজারি ঠাকুর।

অবাঙালী ভদ্রলোকটি হাসিমুখে হিন্দীতে কি বলিলেন, হাজারি ভাল বুঝিল না। বিনীত ভাবে বাঙালী বাবুটিকে বলিল যে সে হিন্দী বুঝিতে পারে না।

বাঙালী বাবুটি বলিলেন—শুনুন হাজারি-বাবু, কথাটা বলি। আমার বন্ধু ইনি গুজরাটি, বড় ব্যবসাদার, ধরন্ধর খাচ্ছে কোম্পানির বড় অংশীদার। জি. আই. পি. রেলের সব হিন্দু রেস্টোরাণ্টের কন্ট্রাক্টর হলো খাচ্ছে কোম্পানি। ওরা আপনাকে বলতে এসেছে ওদের সব হোটেলের রান্না দেখানো তদারক করবার জন্যে দেড়শো টাকা মাইনেতে আপনাকে রাখতে চায়। তিন বছরের এগ্রিমেন্ট। আপনার সব খরচ, রেলের যে কোনো জায়গায় যাওয়া-আসা, একজন চাকর ওরা দেবে। বস্বেতে ফ্রি কোয়ার্টার দেবে। যদি ওদের নাম দাঁড়িয়ে যায় আপনার রান্নার গুণে, আপনাকে একটা অংশও ওরা দেবে।

আপনি রাজী?

হাজারি নরেনকে ডাকিয়া আলোচনা করিল আড়ালে। মন্দ কি? কাজকর্ম এদিকে যাহা রহিল নরেন দেখাশুনা করিতে পারে। খরচা বাদে মাসে অতিরিক্ত দেড় শত টাকা কম নয়—তা ছাড়া হোটেলের ব্যবসা সম্বন্ধে খুব একটা অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ এটি। এ হাত-ছাড়া করা উচিত হয় না—নরেনের ইহাই মত।

হাজারি আসিয়া বলিল—আমি রাজী আছি। কবে যেতে হবে বলুন। কিন্তু একটা কথা আছে—হিন্দী তো আমি তত জানিনে! কাজ চালাব কি করে?

বাঙালীবাবু বলিলেন—সেজন্যে ভাবনা নেই। দুদিন থাকলেই হিন্দী শিখে নেবেন। সেই করুন এ কাগজে। এই আপনার কন্সট্রাক্টর্ম, এই আপপ্রেস্টমেন্ট লেটার। দুজন সাক্ষী ডাকুন।

যদু বাঁড়ুয়াকে ডাকিয়া আনা হইল তাহার হোটেল হইতে, অন্য সাক্ষী নরেন। কাগজপত্রের হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে উহার চা-পানে আপ্যায়িত হইয়া ট্রেনে উঠিল। বাঙালী উদ্ভুলোক বলিয়া গেল—মে মাসের পয়লা জন্মের করতে হবে আপনাকে বস্বতে। আপনার ইন্টার ক্লাস রেলওয়ে পাস আসছে আর আমাদের লোকে আপনাকে সঙ্গে করে বস্ব পৌঁছে দেবে। তৈরী থাকবেন—আর পনেরো দিন বাকি।

হাজারি স্টেশন হইতে বাহির হইয়াই কুসুমের সঙ্গে একবার দেখা করিবে ভাবিল। এত বড় কথাটা কুসুমকে বলিতেই হইবে আগে। বোম্বাই! সে বোম্বাই যাইতেছে! দেড়শো টাকা মাহিনায়! বিশ্বাস হয় না। সব যেন স্বপ্নের মত ঘটিয়া গেল। টাকার জন্য নয়। টাকা এখানে সে মাসে দেড়শো টাকার বেশী ছাড়া কম রোজগার করে না। কিন্তু মানুষের জীবনে টাকাটাই কি সব? পাঁচটা বেশ দেখিয়া কেড়ানো, পাঁচজনের কাছে মান-খাতির পাওয়া, নূতনতর জীবনযাত্রার আশ্বাদ—এ সবই তো আসিল।

পিছন হইতে যদু বাঁড়ুয়ো ডাকিল—ও হাজারি-ভায়া, হাজারি-ভায়া শোন, হাজারি ভায়া—

হাজারি কাছে যাইতেই, যদু বাঁড়ুয়ো—রাণাঘাটের হোটেলের মালিকদের মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে—সেই যদু বাঁড়ুয়ো স্বয়ং নীচু হইয়া হাজারির পায়ের ধুলো লইতে গেল। বলিল—ধনি, খুব দেখালে ভায়া, হোটেল করে তোমার মত ভাগ্য কারো ফেরে নি। পায়ের ধুলো দাও, তুমি সাধারণ লোক নও দেখাছি—

হাজারি হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল।

—কি করেন বাঁড়ুয়োমশায়—আমার দ.দার সমান আপনি—ওকি—ওকি—আপনাদের বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে, আপনাদের আশীর্ব্বাদে—একরকম করে পাছি—

যদু বাঁড়ুয়ো বলিল—এসো না ভায়া গরীবের হোটেলের একবার এক ছিলাম তামাক খেয়ে যাও—এসো।

যদু বাঁড়ুয়ের অনুরোধ হাজারি এড়াইতে পারিল না। যদু চা খাওয়াইল, ছানার জিলাপি খাওয়াইল, নিজের হাতে তামাক সাজিয়া খাইতে দিল। স্বপ্ন না সত্য? এই যদু বাঁড়ুয়ো একদিন নিজের হোটেলের কাজ করিবার জন্য না ভাঙাইতে গিয়াছিল! তাহার মনিবের দরের মানুষ ছিল তিন বছর আগেও!

না, যথেষ্ট হইল তাহার জীবনে। ইহার বেশী আর সে কিছু চায় না। রাখাবল্লভ ঠাকুর তাহাকে অনেক দিয়াছেন। আশার অতিরিক্ত দিয়াছেন।

কুসুম শুনিয়া প্রথমে ঘোর আগ্রহ তুলিয়া বলিল, জ্যাঠামশায় কি ভাবেন, এই বয়সে

তাঁহাকে সে অত দূরে যাইতে কখনই দিবে না। জেঠিমাকে দিয়াও ব্যরণ করাইবে। আর টাকার দরকার নাই। সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের দেশে যাইতে হইবে এমন গরজ কিসের?

হাজারি বলিল—মা বেশীদিন থাকব না সেখানে। চুক্তি সই হয়ে গিয়েছে সাক্ষীদের সামনে। না গেলে ওরা খেসারতের দাবি করে নালিশ করতে পারে। আর একটা উদ্দেশ্য আছে কি জান মা, বড় বড় হোটেল কি করে চালায়, একবার নিজের চোখে দেখে আসি। আমার তো ঐ ব্যতিক, ব্যবসাতে যখন নেমোছি, তখন ওর মধ্যে যা কিছু আছে শিখে নিয়ে তবে ছাড়ব। বাধা দিও না মা, তুমি বাধা দিলে তো ঠেলবার সার্থ্য নেই আমার।

টোঁপির মা ও টোঁপি কাল্মাকটি করিতে লাগিল। ইহাদের দুজনকে বদ্বাইল নরেন। মামাবাবু কি নিরুদ্দেশ যাত্রা করিতেছেন? অত কাল্মাকটি করিবার কি আছে ইহার মধ্যে? বশেষ তো বাড়ীর কাছে, লোক কত দূর-দূরান্তর যাইতেছে না চাকুরির জন্য?

সেই দিন রাতে হাজারি নরেনের মামা বংশীধর ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল—একটা কথা আছে। আমি তো আর দিন পনেরোর মধ্যে বোম্বাই যাচ্ছি। আমার ইচ্ছে যাবার আগে টোঁপির সঙ্গে নরেনের বিয়েটা দিয়ে যাব। নরেন এখনকার কারবার দেখাশুনো করবে—রেলের হোটেলটা ওকে নিজে দেখতে হবে—ওটাতেই মোটা লাভ। এতে তোমার কি মত?

বংশীধর অনেকদিন হইতেই এইরূপ কিছু ঘটিবে আঁচ করিয়া রাখিয়াছিল। বলিল—হাজারিদা, আমি কি বলব বল। তোমার সঙ্গে পাশাপাশি হোটেল কাজ করছি। আমরা সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী হয়ে কাটিয়েছি বহুকাল। নরেনও তোমারই আপনার ছেলে। যা বলবে তুমি, তাতে আমার অমত কি? আর ওরও তো কেউ নেই—সবই জান তুমি। যা ভাল বোঝ কর।

দেনাপাওনার মীমাংসা অতি সহজেই মিটিল। হাজারি রেলওয়ে হোটেলটির স্বত্ব টোঁপির নামে লেখাপড়া করিয়া দিবে। তার অনুপস্থিতিতে নরেন ম্যানেজার হইয়া উভয় হোটেল চালাইবে—তবে বাজারের হোটেলের আয় হিসাবমত কুসুমকে ও টোঁপির মাকে ভাগ করিয়া দিতে থাকিবে।

বিবাহের দিন ধার্য হইয়া গেল।

টোঁপির মা বলিল—ওগো, তোমার মেয়ে বলছে অতসীকে নেমন্তন্ন করে পাঠাতে। ওর বড় বন্ধু ছিল—তাকে বিয়ের দিন আসতে লেখ না?

হাজারিও সে কথা ভাবিয়াছে। অতসীর সঙ্গে আজ বহুদিন দেখা হয় নাই। সেই মেয়েটির অম্মাচিত করুণা আজ তাহাকে ও তাহার পরিবারবর্গকে লোকের চোখে সম্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। অতসীর শ্বশুরবাড়ীর ঠিকানা হাজারি জানিত না, কেবলমাত্র এইটুকু জানিত অতসীর শ্বশুর বন্দুমান জেলায় মূলঘরের জমিদার। হাজারি চিঠিখানা তাঁহাদের গ্রামে অতসীর বাবার ঠিকানায় পঠাইয়া দিল, কারণ সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ। লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পত্রের পত্র লিখিবার সময় নাই।

বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে হাজারি শ্রীমন্ত কাঁসারির দোকানে দানের বাসন কিনিতে গিয়াছে। শ্রীমন্ত বলিল—আসুন আসুন হাজারিবাবু, বসুন। ওরে বাবুকে তামাক দে রে—

হাজারি নিজের বাসনপত্র কিনিয়া উঠিবার সময় কতকগুলি পুরানো বাসনপত্র, পিতলের বালতি ইত্যাদি নতুন বাসনের দোকানে দৌখিল বলিল—এগুলো কি হে শ্রীমন্ত?

এগুনো তো পুরোনো মাল—ঢালাই করবে নাকি ?

শ্রীমন্ত বলিল—ও কথা আপনাকে বলব ভেবেছিলাম বাবু। ও আপনাদের পুরোনো হোটেলের পক্ষিক রেখে গেছে—হয় বন্ধক নয় বিক্রী। আপনি জানেন না কিছ? চক্রান্ত মশায়ের হোটেল বে সীল হবে আজই। মহাজন ও বাড়ীওয়ালার দেনা একরাশ, তারা নালিশ করাইছিল। তা বাবু পুরোনো মালগুনো নিন না কেন? আপনাদের হোটেলের কাজে লাগবে—বড় ডেক্‌চি, পেতলের বালতি, বড় গামলা। সস্তা দরে বিক্রী হবে—ও বন্ধকী মালের হ্যান্ডামা কে পোয়াবে বাবু, তার চেয়ে বিক্রীই করে দেবো—

হাজারি এত কথা জানিত না। বলিল—পক্ষ নিজে এসেছিল ?

শ্রীমন্ত বলিল—হ্যাঁ, ওদের হোটেলের একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে। হোটেল সীল হলে কাল একটা জিনিসও কর করা যাবে না ঘর থেকে, তাই রেখে গেল আমার এখানে। বলে গেল এগুনো বন্ধক রেখে কিছ, টাকা দিতেই হইবে; চক্রান্ত মশায়ের একেবারে নাকি অচল।

বাসনের দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্য পাঁচটা কাজ, মিটাইয়া হোটеле ফিরিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। একবার বেচু চক্রান্তির হোটেল বাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু তাহা আর ঘটয়া উঠিল না।

কুসুম এ করদিন এ বাসাতেই বিবাহের আয়োজনের নানারকম বড় ছোট, খুচরা কাজে সারাদিন লাগিয়া থাকে। হাজারি তাহাকে বাড়ী বাইতে দেয় না, বলে—মা, তুমি তো আমার ঘরের লোক, তুমি থাকলে আমার কত ভরসা। এখানেই থাক এ কটা দিন।

বিবাহের পূর্বাধিন হাজারি অতসীর চিঠি পাইল। সে কুসুমের লোকালে আসিতেছে, স্টেশনে যেন লোক থাকে।

আর কেহ অতসীকে চেনে না, কে তাহাকে স্টেশন হইতে চিনিয়া আনিবে, হাজারি নিজেই বৈকাল পাঁচটার সময় স্টেশনে গেল।

ইটার ক্লাস কামরা হইতে অতসী আর তাহার সঙ্গে একটি বৃদ্ধক নামিল। কিন্তু তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে কাছে গিয়া হাজারি বাহা দেখিল, তাহাতে তাহার মনে হইল পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন এক মুহূর্তে মৃদিয়া লোপিয়া অন্ধকারে একাকার হইয়া গিয়াছে তাহার চক্ষুর সম্মুখে।

অতসীর বিধবা বেশ।

অতসী হাজারির পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কাকাবাবু, ভাল আছেন? ইনি কাকাবাবু—সুন্দরেন। এ আমার ভাসুরপো। কলকাতায় পড়ে। অমন করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

—না—মা—ইয়ে, চলো—এস।

—ভাবছেন বুঝি এ আবার ঘাড়ে পড়ল দেখছি। দিবেছিলাম একরকম বিনয় করে, আবার এসে পড়েছে সাত বোঝা নিয়ে—এই না? বাবা—কাকার এমনি নিষ্ঠুর বটে।

হাজারি হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। এক প্র্যাটফর্ম বিস্মিত জনতার মাঝখানে কি যে তাহার মনে হইতেছে তাহা সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। মনের কোন স্থান মনে হঠাৎ বেদনায় টন টন করিয়া জ্বালা পড়িতেছে। অতসীই তাহাকে শান্ত করিয়া নিজের আঁচলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া প্র্যাটফর্ম হইতে বাহির করিয়া আনিল। রেলওয়ে হোটেলের কাছে নরেন উহাদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়া ছিল। সে হাজারির দিকে

চাহিয়া দেখিল হাজারির চোখ রাঙা, কেমন এক ভাব মুখে। অতসীর বিধবা বেশ দেখিয়াও সে বিস্মিত না হইয়া পারিল না, কারণ টেপির কাছে অতসীর সব কথাই সে শুনিয়াছিল ইতিমধ্যে—সবে আজ বছর তিন বিবাহ হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছিল। অতসীর বিধবা হইয়াছে এ কথা তো কেহ বলে নাই।

বাড়ী পৌঁছিয়া অতসী টেপিকে লইয়া বাড়ীর ছাদে অনেকক্ষণ কাটাইল। দুজনে বহুকাল পরে দেখা—সেই এঁড়োশোলায় আজ প্রায় তিন বছর হইল তাহাদের ছাড়াছাড়ি, কত কথা যে জমা হইয়া আছে!

টেপি চোখের জল ফেলিল বাল্যসখীর এ অবস্থা দেখিয়া। অতসী বলিল—তোরা যদি সবাই মিলে কান্নাকাটি করবি, তা হ'লে কিন্তু চলে যাব ঠিক বলছি। এলাম বাপ-মায়ের কাছে, বোনের কাছে একটু জুড়তে, না কেবল কান্না আর কেবল কান্না—সরে আর, তোর এই দুল জোড়টা পর তো দেখি কেমন হয়েছে—আর এই ব্রেসলেটটা, দেখি হাত—

টেপি হাত ছিনাইয়া লইয়া বলিল—এ তোমার ব্রেসলেট অতসী-দি, এ আমার দিতে পারবে না—কক্‌খমা না—

—তা হ'লে আমি মাথা কুটবো এই ছাদে, যদি না পরিস্—সত্যি বলছি। আমার সাথ কেন মেটাতে দিবি নে?

টেপি আর প্রতিবাদ করিল না। তাহার দুই চক্ৰ জলে ভাসিয়া গেল, ওদিকে অতসী তাহার ডান হাত ধরিয়া শুখন ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ব্রেসলেট পরাইতেছে।

হাজারি অনেক রাতে তামাক খাইতেছে, অতসী আসিয়া নিঃশব্দে পাশে দাঁড়াইয়া বলিল—কাকাবাবু!

হাজারি চমকিয়া উঠিয়া বলিল—অতসী মা? এখনও শোও নি?

—না কাকাবাবু। আজ তো সারাদিন আপনার সঙ্গে একটা কথাও হয় নি, তাই এলাম।

হাজারি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—এমন জানলে তোমায় আনতাম না মা। আমি কিছুই শুনিনি। কতদিন গাঁয়ে ঘাই নি তো! তোমার এ বেশ চোখে দেখতে কি নিয়ে এলাম মা তোমায়?

অতসী চুপ করিয়া রহিল। হাজারির স্নেহশীল পিতৃহৃদয়ের সান্নিধ্যের নিবিড়তার সে যেন তাহার দুঃখের সাক্ষ্য পাইতে চায়।

হাজারি স্নেহে তাহাকে কাছে বসাইল। কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিল না। পরে অতসী বলিল—কাকাবাবু, আমি একদিন বলেছিলাম আপনার হোটেলের কাজেই উন্নতি হবে—মনে আছে?

—সব মনে আছে অতসী মা। ভুলি নি কিছুই। আর যা কিছু এখনকার ইস্টাট-পত্ন—সব তো তোমার দয়াতেই মা—তুমি দয়া না করলে—

অতসী তিরস্কারের সুরে বলিল—ওকথা বলবেন না কাকাবাবু, ছিঃ—আমি টাকা দিলেও আপনার ক্ষমতা না থাকলে কি সে টেকি রাঙতো? তিন বছরের মধ্যে এত বড় জিনিস করে ফেলতে পারত অন্য কেউ আনাড়ি লোক? আমি কিছুই জানতুম না কাকাবাবু, এখানে এসে সব দেখে শুনলে অবাক হয়ে গিয়েছি। আপনি ক্ষমতাবান পুরুষ-মানুষ কাকাবাবু।

—এখন তুমি এঁড়োশোলায় যাবে মা, না আবার শ্বশুরবাড়ী যাবে?

—এঁড়োশোলাতেই যাবো। বাবা-মা দুঃখে সারা হয়ে আছেন। তাঁদের কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকবো। জানেন কাকাবাবু, আমার ইচ্ছে দেশে এমন একটা কিছু করব, বি. র. সুলত ২য়—১৯

যাতে সাধারণের উপকার হয়। বাবার টাকা সব এখন আমিই পাব, শব্দদুবাড়ী থেকেও টাকা পাব। কিন্তু এ টাকার আমার কোন দরকার নেই কাকাবাবু। পাঁচজনের উপকারের জন্যে খরচ করেই সুখ।

—যা ভাল বোঝ মা করো। আমি তোমায় কি বলব?

—কাকাবাবু, আপনি বম্বে যাচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ মা।

অতসী ছেলোমানুবের মত আবদারের সুরে বলিল—আমায় নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে? বেশ বাপে-বিয়ে থাকবো, আপনাকে রেখে দেব—আমার খুব ভালো লাগে দেশ বেড়াতে।

—যেও মা, এবারটা নয়। আমি তিন বছর থাকব সেখানে। দেখি কি রকম সুবিধে অসুবিধে হয়। এর পরে যেও।

—ঠিক কাকাবাবু? কেমন মনে থাকবে তো?

—ঠিক মনে থাকবে। যাও এখন শোও গিয়ে মা, অনেক কষ্ট হয়েছে গাড়ীতে, সকাল সকাল বিশ্রাম কর গিয়ে।

পরদিন বিবাহ। টেঁপির নরম হাতখানি নরেনের বলিষ্ঠ পেশীবান্ধ হাতে স্থাপন করিবার সময় হাজারির চোখে জল আসিল।

কর্তাদনের সাধ—এতদিনে ঠাকুর রাধাবল্লভ পূর্ণ করিলেন।

বংশাধর ঠাকুর বরকর্ত্তা সাজিয়া বিবাহ-মজলিসে বাসিয়া ছিল। সেও সে সময়টা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—হাজারি-দা!

কাছাকাছি সব হোটেলের রাধুনী বামুনেরা তাহাদের আত্মীয়-স্বজন লইয়া বরষাত্রী সাজিয়া আসিয়াছে। এ বিবাহ হোটেলের জাতের, ভিন্ন জগতের কোনো লোকের নিমন্ত্রণ হয় নাই ইহাতে। ইহাদের উচ্চ কলরব, হাসি, ঠাট্টা ও হাঁকডাক বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল।

বিবাহের পরদিন বর-কনে বিদায় হইয়া গেল। বেশীদূর উহারা যাইবে না। এই রাগাঘাটেরই চূর্ণার ধারে বংশাধর একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়াছে পাঁচ দিনের জন্য। সেখানে দেশ হইতে বংশাধরের এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি (বংশাধরের স্ত্রী মারা গিয়াছে বহুদিন) আসিয়াছেন বিবাহের ব্যাপারে। বৌভাত সেখানেই হইবে।

হাজারি একবার রেলওয়ে হোটеле কাজ দেখিতে যাইতেছে, বেলা আন্দাজ দশটা, বেচু চক্রান্তির হোটেলের সামনে ভিড় দেখিয়া থামিয়া গেল। কোর্টের পিণ্ডন, বেলিফ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আছে আর আছে রামরতন পালচৌধুরীর জমাদার। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল মহাজনের দেনার দায়ে বেচু চক্রান্তির হোটেল-সীল হইতেছে।

হাজারি কিছুক্ষণ পক্ষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পুরোনো মনিবের হোটেল-এইখানে সে দীর্ঘ সাত বৎসর সুখে-দুঃখে কাটাইয়াছে। এত দিনের হোটেলটো আজ উঠিয়া গেল! একটু পরে পক্ষিয়া দৃষ্টিতে দুটি বড় বালতি লইয়া হোটেলের পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইতেই একজন আদালতের পেয়াদা বেলিফের দৃষ্টি সৈদিকে আকৃষ্ট করিল। বেলিফ সাক্ষী দুজনকে ডাকিয়া বলিল—এই দেখুন রশায়, ওই মেয়েলোকটা হোটেল থেকে জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, এটা বে-আইনী। আমি পেয়াদাদের দিয়ে আটকে দিচ্ছি আপনাদের সামনে।

পেয়াদারা গিয়া বাধা দিয়া বলিল—বালতি রেখে যাও—

পরে আরও কাছে গিয়া হাঁক দিয়া বলিল—শুধু বাল্‌তি নয় বাবু, বাল্‌তির মধ্যে পেতল কাঁসার বাসন রয়েছে।

পদ্মাবতী ততক্ষণ বাল্‌তি দুটা প্রাণপণে জোর করিয়া আঁটিয়া ধরিয়াছে। সে বলিল—এ বাসন আমার নিজের—হোটেল চক্রান্ত মশায়ের, আমার জিনিস উনি নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি।

পেয়াদারা ছাড়াবার পাত্র নয়। অবশ্য পদ্মাবতীও নয়। উভয় পক্ষে বাগবিতণ্ডা, অবশেষে টানাহেঁচড়া হইবার উপক্রম হইল। মজা দেখবার লোক জুটিয়া গেল বিস্তর।

একজন মহাজন পাওনাদার বলিল—আমি এই সকলের সামনে বলছি, বাসন নামিয়ে যদি না রাখো তবে আদালতের আইন অমান্য করবার জন্যে আমি তোমাকে পদাশ্রয় দেবো।

একজন সাক্ষী বলিল—তা দেবেন কেমন করে বাপু? ওর নামে তো ডিক্রি নেই আদালতের। ও আদালতের ডিক্রি মানতে যাবে কেন?

বোলফ্‌ বলিল—তা নয়, ওকে চুরির চার্জ্‌ ফেলে পদাশ্রয় দেওয়া চলবে। এ হোটেল এখন মহাজন পাওনাদারের। তার ঘর থেকে অপরের জিনিস নিয়ে যাবার রাইট কি? ওকে জিজ্ঞেস করো ও ভালোয় ভালোয় দেবে কিনা—

পদ্মাবতী তা দিতে রাজী নয়। সে আরও জোর করিয়া আঁকড়াইয়া আছে বাল্‌তি দুটা। বোলফ্‌ বলিল—কেড়ে নাও মাল ওর কাছ থেকে—বদমাইশ মাগী কোথাকার—ভাল কথায় কেউ নয়!

পেয়াদারা এবার বীরদর্পে আসিয়া গেল। পনেরায় একচোট ধস্তাধস্তির সূত্রপাত হইবার উপক্রম হইতেই হাজারি সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—পদ্মাবতী, বাসন ওদের দিয়ে দাও।

লজ্জায় ও অপমানে পদ্মাবতীর চোখে তখন জল আসিয়াছে। জনতার সামনে দাঁড়াইয়া এমন অপমানিত সে কখনো হয় নাই। এই সময় হাজারিকে দেখিয়া সে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

—এই দেখো না ঠাকুর মশায়, তুমি তো কতদিন আমাদের হোটলে ছিলে—এ আমার জিনিস না? বলো না তুমি, এ বাল্‌তি কার?

হাজারি সাম্ভ্রান্তর সুরে বলিল—কেদো না এমন করে পদ্মাবতী। এ হোল আইন-আদালতের ব্যাপার। বাসন রেখে এসো ঘরের মধ্যে, আমি দেখছি তারপর কি ব্যবস্থা করা যায়—

অবশ্য তখন কিছু করবার উপায় ছিল না। সে আদালতের বোলফ্‌কে জিজ্ঞাসা করিল—কি করলে এদের হোটেল আবার বজায় থাকে?

—টাকা চুকিয়ে দিলে। এ অতি সোজা কথা মশাই। মাড়ে সাতশো টাকার দাবীতে নালিশ—এখনও ডিক্রী হয় নি। বিচারের আগে সম্পত্তি সীল না করলে দেনাদার ইতিমধ্যে মাল হস্তান্তর করতে পারে, তাই সীল করা।

আদালতের পেয়াদারা কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল। বেচু চক্রান্তকে একধারে ডাকিয়া হাজারি বলিল—আমার সঙ্গে চলুন না কর্তা মশায় একবার ইন্সট্রানের দিকে—আসুন, কথা আছে।

রেলের হোটলে নিজের ঘরটিতে বেচু চক্রান্তকে বসাইয়া হাজারি বলিল—কর্তা একটু চা খাবেন?

বেচু চক্রান্তের মন খারাপ খুবই। চা খাইতে প্রথমটা চাহে নাই, হাজারি কিছুতেই ছাড়িল না। চা পান ও জলযোগান্তে বেচু বলিল—হাজারি, তুমি তো সাত-আট বছর

আমার সঙ্গে ছিলে, জানো তো সবই, হোটেলটা ছিল আমার প্রাণ। আজ বাইশ বছর হোটেল চালাচ্ছি—এখন কোথায় বাই আর কি করি! পৈতৃক জ্যেষ্ঠত্ব ঘরদোর যা ছিল ফুলে-নবলায়, সে এখন আর কিছু নেই, ওই হোটেলই ছিল বাড়ী। এমন কষ্ট হয়েছে, এই বড়ো বয়সে এখন দাঁড়াই কোথায়? চালাই কী করে?

—এমন অবস্থা হোল কি করে কর্তা? দেনা বাধালেন কী করে?

—খরচে আরে এদনীং কুলোতো না হাজারি। দু-বার বাসন চুরি হয়ে গেল। ছোট হোটেল, আর কত ধাক্কা সেইবার জান্ ছিল ওর! কাবু হয়ে পড়লো। খন্দের কমে গেল। বাড়ীভাড়া জমতে লাগলো—এসব নানা উৎপাত—

হাজারি বেচু চক্রান্তকে তামাক সাজিয়া দিয়া বলিল—কর্তা, একটা কথা আছে বলি। আপনি আমার পুরোনো মনিব, আমার যদি টাকা এখন থাকতো, আপনার হোটেলের সীল আমি খুলিয়ে দিতাম। কিন্তু কাল মেয়ের বিয়ে দিয়ে এখন অত টাকা আমার হাতে নেই। তাই বলছি, বতরিন বন্ডে থেকে না ফিরি, আপনি আমার বাজারের হোটেলের ম্যানেজার হয়ে হোটেল চালান। পঁচিশ টাকা করে আপনার খরচ দেবো। (হাজারি মাহিনার কথাটা বলিতে পারিল না।) খাবেন দাবেন হোটেলসে, আর পশ্চাদ্দিগ ওখানে থাকবে, মাইনে পাবে, খাবে। কি বলেন আপনি?

বেচু চক্রান্তর পক্ষে ইহা অস্বপনের স্বপন। এ আশা সে কখনো করে নাই। রেলবাজারের অত বড় কারবারী হোটেলের সে ম্যানেজার হইবে। পশ্চাদ্দিগও খবরটা পাইয়াছিল বোধ হয় বেচুর কাছেই, সেদিন সম্মুখবেলা সে কুসুমের বাড়ী গেল। কুসুম উহাকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য না হইয়া পারিল না, কারণ জীবনে কোনোদিন পশ্চাদ্দিগ কুসুমের দোর মাড়ায় নাই।

—এসো পশ্চাদ্দিগ বসো। আমার কি জাগিয়া। এই পিণ্ডিখানাতে বোসো পিসি। পান-দোস্তা খাও? বসো পিসি, সেজে আনি—

পশ্চাদ্দিগ বসিয়া পান খাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কুসুমের সঙ্গে এ-গল্প ও-গল্প করিল। পশ্চাদ্দিগেতে পারিয়াছে কুসুমও তাহার এক মনিব। ইহাদের সকলকে সন্তুষ্ট রাখিয়া তবে চাকুরি বজায় রাখা। যদিও সে মনে মনে জানে, চাকুরি বেশী দিন তাহাকে করিতে হইবে না। আবার একটা হোটেল নিজেরাই খুলিবে, তবে বিপদের দিনগুলিতে একটা কোনো আশ্রয়ে কিছুদিন মাথা গুঁজিয়া থাকা।

পরদিন পশ্চাদ্দিগ হোটেলের কাজে ভর্তি হইল। বেচু চক্রান্তও বাসল গদির ঘরে। ইহারা কেহই যে বিশ্বাসযোগ্য নয় তাহা হাজারি ভাল করিয়াই বুঝিত। তবে কথা এই যে, ক্যাশ থাকিবে নরেনের কাছে। বেচু চক্রান্ত দেখাশোনা করিয়াই খালাস।

হাজারির মনে হইল সে তাহার পুরোনো দিনের হোটেলের আবার কাজ করিতেছে, বেচু চক্রান্ত তাহার মনিব, পশ্চাদ্দিগও ছোট মনিব।

পশ্চাদ্দিগ যখন আসিয়া সকালে জিজ্ঞাসা করল—ঠাকুর মশায়, ইলিশ মাছ আনাব এবেলা না পোনা?—তখন হাজারি পূর্বে অভ্যাসমতই পশ্চাদ্দিগের সঙ্গে উত্তর দিল, যা ভাল মনে করে পশ্চাদ্দিগ। পচা না হলে ইলিশই এনা।

বেচু চক্রান্ত পাকা ব্যবসাদার লোক এবং হোটেলের কাজে তাহার অভিজ্ঞতা হাজারির অপেক্ষা অনেক বেশী। সে হাজারিকে ডাকিয়া বলিল—হাজারি, একটা কথা বলি, তোমার এখানে ফান্ট আর সেকেন্ড কেলাসের মধ্যে মোটে চার পরসর তফাৎ রেখেচ, এটা ভাল মনে হয় না আমার কাছে। এতে করে সেকেন্ড কেলাসে খন্দের কম হচ্ছে, বেশী লোক ফান্ট কেলাসে খায় অথচ খরচ যা হয় তাদের পেছনে তেমন লাভ দাঁড়ায় না। গত

এক মাসের হিসেব খতিয়ে দেখলাম কিনা! নরেন বাবাজী ছেলেমানুষ, সে হিসেবের কি বোঝে?

হাজারি কথাটার সত্যতা বসিল। বলিল—আপনি কি বলেন কর্তা?

—আমার মত হচ্ছে এই যে ফাস্ট কেল্লাস হয় একদম উঠিয়ে দাও, নয়তো আমার হোটেলের মত অন্ততঃ দু'আনা তফাৎ রাখো। শীতকালে যখন সব সস্তা, তখন এ থেকে যা লাভ হবে, বর্ষাকালে বা অন্য সময় ফাস্ট কেল্লাসের খদ্দেরদের পেছনে সেই জন্ডের খানিকটা খেয়ে গিয়েও যাতে কিছু থাকে, তা করতে হবে। বঝলে না?

—তাই করুন কর্তা। আপনি যা বোঝেন, আমি কি আর তত বুঝি?

বেচা চক্রান্ত খুব সন্তুষ্ট আছেন হাজারির ব্যবহারে। ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতই হাজারির নম্র কথাবার্তা—যেন তিনিই মনিব, হাজারি তাঁর চাকর। যদিও পশ্চিম ও তিনি—দুজনেরই দৃঢ় বিশ্বাস হাজারি যা কিছু করিয়া তুলিয়াছে, সবই কপালের গুণে, আসলে তাহার বুদ্ধিসূচক কিছুই নাই, তবুও দুজনেই এখন মনে ভাবে, বুদ্ধি যত থাক আর না-ই থাক—বুদ্ধি অবশ্য সকলের থাকে না—লোক হিসাবে হাজারি কিন্তু খুবই ভাল।

সকালে উঠিয়া হাজারি এক কলিকা গাঁজা সাজিবার উদ্যোগ করিতেছে। এই সময়টা সকলের অগোচরে সে একবার গাঁজা খাইয়া থাকে, হোটেল গিয়া আজকাল সে-সুবিধা ঘটে না। এমন সময় অতসীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি গাঁজার কলিকা ও সাজসরঞ্জাম লুকাইয়া ফেলিল।

অতসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—কি মা?

—কাকাবাবু, আপনি কবে বম্বে যাচ্ছেন?

—আসচে মঙ্গলবার বাব, আর চারদিন বাকি।

—আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে নিয়ে এ'ডোশোলা যাব, আমাদের বৈঠকখানায় আবার আপনাকে আর বাবাকে চা জলখাবার এনে দেব—যাবেন কাকাবাবু?

হাজারির চোখে জল আসিল। কি তুচ্ছ সাধ! মেয়েদের মনের এই সব অতি সামান্য আশা-আকাঙ্ক্ষাই কি সব সময়ে পূর্ণ হয়? কি করিয়া সে এ'ডোশোলা যাইবে এখন? ছেলেমানুষ, না হয় বলিয়া খালাস!

মুখে বলিল—মা, সে হয় না। কত কাজ বাকি এদিকে, সে তো মা জান না। নরেন ছেলেমানুষ, ওকে সব জিনিস দেখিয়ে বুঝিয়ে না দিয়ে—

—আজ চলুন আমরা নিয়ে। গরুর গাড়ীতে আমরা বাপ-মেয়েতে চলে যাই—কাল বিকেলে চলে আসবেন। তা ছাঁড়া চৌপাও বলা ছিল একবার গায়ে যাবার ইচ্ছে হয়েছে। চলুন কাকাবাবু, চলুন—

—তা নিতান্ত যদি না ছাড় মা, তবে পরশ, সকালে গিয়ে সেই দিনই সন্ধ্যার পরে ফিরতে হবে। থাকবার একদম উপায় নেই—কারণ তাঁর পরদিনই বিকেলে রওনা হতে হবে আমরা। বোম্বাইয়ের ডাকগাড়ী রাত আটটার ছাঁড়ে বলে দিয়েছে।

বৈকালে চণ্ডীর ধারের নিম্নগাছটার তলায় হাজারি একবার গিয়া বসিল। পাশের চুন-কয়লার আড়তে হিন্দুস্থানী কুলিরা সেই ভাবে সর করিয়া সমস্তরে ঠেঁট হিন্দুীতে গজল গাহিতেছে, চণ্ডীর খেয়াঘাটে ওপারের ফুলে-নবলার হাটের হাটের লোক পারাপার হইতেছে—পুরোনো দিনের মতই সব।

সে কি আজও বেচা চক্রান্তর হোটেলের কাজ করিতেছে? পশ্চিমের মখনাড়া

খাইয়া তাহাকে কি এখনি সদ্য আট বসানো কয়লার উন্দুনের ধোয়ার মধ্যে বসিয়া ও-বেলার রান্নার ফন্দ বন্ধিয়া লইতে হইবে?

সেই পদ্মাদিদি ও সেই বোচ্চ চক্কির সঙ্গে সকলবেলাও তেজ কথাবার্তা হইয়াছিল। দাঁড়িপাল্লার পাল্লা বদল হইয়াছে, পুরোনো দিনের সম্বন্ধগুলি ছায়াবার্জির মত অন্তর্হিত হইল কোথায়? বোম্বাই... বোম্বাই কত দূরে কে জানে? টেঁপিকে লইয়া, অতসী বা কুসুমকে লইয়া যদি যাওয়া যাইত! ইহারা যে-কেহ সঙ্গে থাকিলে সে বিলাত পর্য্যন্ত যাইতে পারে—দুনিয়ার যে-কোন জায়গায় বিনা আশংকায়, বিনা দ্বিধায় চলিয়া যাইতে পারে।

তখনকার দিনে সে কি একবারও ভাবিয়াছিল আজকের মত দিন তাহার জীবনে আসিবে? নরেনকে যৌদিন প্রথম দেখে সেইদিনই মনে হইয়াছিল যে সুন্দর ছবিটি—টেঁপ লাল চোল পরিয়া নরেনের পাশে দাঁড়াইয়া, মুখে লজ্জা, চোখে চাপা আনন্দের হাসি—তখন মনে হইয়াছিল এসব দুরাশা, এও কি কখনও হয়?

সবই ঠাকুর রাধাবল্লভের দয়া। নতুবা সে আবার কষ্টে ভাবিয়াছিল যে সে বোম্বাই যাইবে দেড়-শ টাকা মাহিনার চাকুরি লইয়া?

পরদিন অতসী আসিয়া আবার বলিল—কবে এঁড়োশোলা যাবেন কাকাবাবু? টেঁপও যাবে বলছে, কাকীমাও বলাছিলেন গাঁয়ে থেকে সেই আজ দু-বছর আড়াই বছর এসেছেন আর কখনও যান নি। ঠুরও যাবার ইচ্ছে। একদিনের জন্যেও চলুন না?

আবার স্বপ্নামে আসিয়া উহাদের গাড়ী চুকিল বহুদিন পরে। হাজারিদের বাড়ীটো বাসযোগ্য নাই, খড়ের ঘর, এত দিন দেখাশোনার অভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—ঝড়ে খড় উড়িয়া যাওয়ার দরুন চালের নানা জায়গা দিয়া নীল আকাশ দিবা চোখে পড়ে।

অতসী টানাটানি করিতে লাগিল তাহাদের বাড়ীতে সবসম্মত লইয়া বাইয়ার জন্য, কিন্তু টেঁপের মা রাজনী নয়, নিজের ঘরদোরের উপর মেয়েমানুষের চিরকাল টান—ভাঙা ঘরের উঠানের জঙ্গল নিজের হাতে তুলিয়া ফেলিয়া টেঁপের সাহায্যে ঘরের দাওয়া ও ভিতরকার মেঝে পরিষ্কার করিয়া নিজের বাড়িতেই সে উঠিল। টেঁপিকে বলিল—তুই বন্ মা, আমি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে আসি, পেয়ারাতলার ঘাটে কতদিন যাই নি!

পুকুরের ঘাটে গিয়া এ-পাড়ার রাধা চাটুজের পুত্রবধূর সঙ্গে প্রথমেই দেখা। সে মেয়েটির বয়স প্রায় টেঁপের মায়ের সমান, দুজনে যথেষ্ট ভাব চিরকাল। টেঁপের মাকে দেখিয়া সে তো একেবারে অবাক। বাসন মাজা ফেলিয়া হাসিমুখে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—ওমা, দিদি যে! কখন এলে দিদি? আর কি আমাদের কথা মনে থাকবে তোমার? এখন বড়লোক হয়ে গিয়েছে সবাই বলে। গরীবদের কথা কি মনে পড়ে?

দুজনে দুজনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ পরে রাধা চাটুজের পুত্রবধূকে সঙ্গে লইয়া টেঁপের মা ঘাট হইতে ফিরিল। মেয়েটি বাড়ী চুকিয়া টেঁপিকে বলিল—চিনতে পারিস মা?

—ওমা, কাকীমা যে, আসুন আসুন—

—এস মা, জন্ম-এইশ্বরী হও, প্রাণিতার সমান হও। হ্যাঁ গা তা তোমার কেমন আছেন? মেয়েকে আনলে, অমনি জামাইকেও আনতে হয় না? শ্রুতিচর্চাদের মত জামাই হয়েছে। এ চড়ি কে দিয়েছে—দেখি মা। কভার! একে কি বলে? পাশা? দেখি দেখি—কখনও শুনিও নি এসব নাম। তা একটা কথা বলি। তোমাদের রান্না এ-বেলা এখানে হওয়ার উপায়ও নেই—আমাদের বাড়ীতে তোমরা সবাই এ-বেলা দুটে ডালভাত—

টোঁপ বলিল—সে হবে না কাকীমা। অতসী-দি এসেছে আমাদের সঙ্গে জানেন না? অতসীদি সবাইকে বলেছে খেতে। সেখানেই নিয়ে গিয়ে তুলছিল আমাদের—মা গেল না, জানেন তো মার সাত প্রাণ বাঁধা এই ভিটের সঙ্গে—রাণাঘাটের অমন বাড়ী, কলের জল—শহর জায়গা, সেখানে থাকতেও মা শব্দ বাড়ী-বাড়ী করে—আহা বাড়ীর কি ছিরি! ফুটো খড়ের চাল, বাড়ী বললেও হয়, গোয়াল বললেও হয়—

—বাপের বাড়ীর নিন্দে করিস নে, যা যা—আজ না-হয় বড়লোক শব্দ হয়ছে, এই ফুটো খড়ের চালের তলায় তো মান্দু হইছে মা!

হাসি-গল্পের মধ্য দিয়া প্রায় ঘণ্টা দুই কখন কাটিয়া গেল। ইহাদের আসিবার খবর পাইয়া এ-পাড়ার ও-পাড়ার মেয়েমহলের সবাই দেখা করিতে আসিল। জামাইকে সঙ্গে করিয়া না আনার দরুন সকলেই অনুযোগ করিল।

টোঁপের মা বলিল—জামাইয়ের আসবার যো নেই যে! রেলের হোটেলের দেখাশুনো করেন, সেখানে একদিন না থাকলে চুরি হবে। উপায় থাকলে আনি নে মা?

অতসীর দুর্ভাগ্যের কথা সকলেই পূর্বে জানিত! গ্রামসম্ম লোক তাহার জন্য দুঃখিত। সবাই এক বাক্যে বলে, অমন মেয়ে—দেবীর মত মেয়ে। আর তারই কপালে এই দুঃখ, এই কাঁচ বয়সে!

সন্ধ্যার দৌর নাই। অতসীদের বৈঠকখানায় বসিয়া অতসীর বাবার সঙ্গে হাজারি কথাবার্তা বলিতেছিল। হরিচরণবাবু কন্যার অকাল-বৈধব্যে বড় বেশী আঘাত পাইয়াছেন। হাজারির মনে হইল যেন এই আড়াই বৎসরের ব্যবধানে তাঁর দশ বৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েকে দেখিয়া আজ তবুও একটু সুস্থ হইয়াছেন।

হরিচরণবাবু বলিলেন—এই দেখ তোমার বয়েস আর আমার বয়েস—খুব বেশী তফাৎ হবে না। তোমারও প্রায় পঞ্চাশ হয়েছে—না হয় এক-আধ বছর বাকি। কিন্তু তোমার জীবনে উদ্যম আছে, আশা আছে, মনে তুমি এখনও যুবক। কাজ করবার শক্তি তোমার অনেক বেশী এখনও। এই বয়সে বসে থাক, শুনে হিংসে হচ্ছে হাজারি। বাঙালীর মধ্যে তোমার মত লোক যত বাড়বে ঘুমন্ত জাতটা ততই জাগবে। এরা পশ্চিম বংসর বয়সে গলায় তুলসীর মালা পরে পরকালের জন্য তৈরী হয়—দেখছ না আমাদের গাঁয়ের দশা? ইহকালই দেখালি নে, ভোগ করলি নে, তোদের পরকালে কি হবে বাপু? সেখানেও সেই ভুতের ভর। পরকালে নরকে যাবে। তুমি কি ভাবো অকস্মাৎ, অলস, ভীরু লোকদের স্বর্গে জায়গা দেন নাকি ভগবান?

এই সময় পুরোনো দিনের মত অতসী আসিয়া উহাদের সামনে টেবিলে জলখাবারের রেকাবি রাখিয়া বলিল—খুনে কাকাবাবু, চা আনি, বাবা তুমিও স্বাস্থ্য খেতে হবে। সন্ধ্যার এখনও অনেক দৌর—

কিছুক্ষণ পরে চা লইয়া অতসী আবার ঢুকিল। পিছনে আসিল টোঁপ। সেই পুরোনো দিনের মত সবই—তবুও কত তফাৎ! অতসীর মূখের দিকে চাহিলে হাজারির বকের ভিতরটা বেদনায় টনটন করে। তবুও তো মা-বাপের সামনে অতসী বিধবার বেশ বহুদূর সম্ভব বস্তু করিয়াছে। মা বাপের চোখের সামনে সে বিধবার বেশে ঘুরিতে-ফিরিতে পারিবে না। ইহাতে পাপ হয় হইবে।

অতসীর দিকে চাহিয়া হাজারি বলিল—কেমন মা, তোমার সাথ যা ছিল, মিটেছে? হরিচরণবাবু সন্ধ্যাকর্ষিত করিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন।

—নিশ্চয়ই কাকাবাবু, টোঁপ কি বলিস? কতদিন ভাবতুম গাঁয়ে তো যাবে, সেখানে টোঁপও নেই, কাকাবাবুও নেই। কাদের সঙ্গে দুটো কথা বলবো?

—কাল আমার সঙ্গে রাণাঘাট যেতে হবে কিন্তু মা।

—বাঃ, সে আমি বাবা-মাকে বলে রেখেছি। আপনাকে উঠিয়ে দিতে যাব না কি রকম? কাকাবাবু, টেঁপি এখন দিনকতক আমার এখানে থাক্ না? তাহলে আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসবার সময় ওকে সঙ্গে করে আনি। নরেনবাবু মাঝে মাঝে এখানে আসবেন এখন।

নরেনের কথা বলাতে টেঁপি বাপের অলঙ্কিতে অতসীকে এক রাম-চিহ্নটি কাটিল।

—কাকবাবু পূজোর সময় আসবেন তো! এবার আমাদের গাঁয়ে আমরা ঠাকুর পূজো করব।

—পূজোর তো অনেক দেরি এখন মা। যদি সম্ভব হয় আসবো বই কি। তবে তুমি যদি পূজো করো তবে আসবার খুব চেষ্টা করব।

টেঁপি বলিল—তোমাকে আসতেই হবে বাবা। মা বলেচে এবার প্রতিমা গাড়িয়ে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা করবে। এখনও তিন-চার মাস দেরি পূজোর—সে-সময় ছুটি নিয়ে আসবে বাবা, কেমন তো?

রাধু মৃধুঘোর পুত্রবধু নাছোড়বান্দা হইয়া পড়িয়াছিল। রাতে তাহাদের বাড়ীতে সকলকে খাইতে হইবেই। টেঁপির মা সন্ধ্যাবেলা হইতেই রাধু মৃধুঘোর বাড়ী গিয়া জুটিয়াছে, মোচা কুটিয়া, দেশী কুমড়া কুটিয়া তাহাদের সাহায্য করিতেছে। সে সরলা গ্রাম্য মেয়ে, শহরের জীবনযাত্রার চেয়ে পাড়িগাঁয়ের এ জীবন তাহার অনেক ভাল লাগে। সে বলিতেছিল—ভাই, শহরে-টহরে কি আমাদের পোষায়? এই যে কুমড়োর ডাঁটাটুকু, এই এক পয়সা। এই এতটুকু করে কুমড়োর ফালি এক পয়সা। সে ফালি কাটতে বোধ হয় পোড়ারমুখো মিসেসদের হাত কেটে গিয়েছে। আমার ইচ্ছে কি জান ভাই, উনি চলে গেলে আমি তিন-চার দিনের মধ্যে আবার গাঁয়ে আসব, পূজো পর্য্যন্ত এখানেই থাকব। মেয়ে-জামাই থাকল রাণাঘাটের বাসায়, ওরাই সব দেখাশুনো করুক, ওদেরই জিনিস। আমার সেখানে ভাল লাগে না।

স্বামীকে কথাটা বলিতে হাজারি বলিল—তোমার ইচ্ছে যা হয় করো—কিন্তু তার আগে ঘরখানা তো সারানো দরকার। ঘরে জল পড়ে ভেসে যায়, থাকবে কিসে?

টেঁপির মা বলিল—সে ভাবনায় তোমার দরকার নেই। আমি অতসীদের বাড়ী থেকে কি ওই মৃধুঘোদের বাড়ী থেকে ঘর সারিয়ে নেব। জামাইকে বলে রেও খরচ যা লাগে যেন দেয়।

রাধু মৃধুঘোর বাড়ী রাতে আহারের আয়োজন ছিল যথেষ্ট—খিচুড়ি, ভাজাভুজি, মাছ, ডিমের ডালনা, বড়াভাজা, টক, দই, আম, সন্দেশ। অতসীকেও খাইতে বলা হইয়াছিল কিন্তু সে আসে নাই। টেঁপি ডাকিতে গেলে কিন্তু অতসী বলিল, তাহার মাথা ভরানক ধরিয়াছে, সে যাইতে পারিবে না।

শেষরাতে দুখানা গাড়ী করিয়া সকলে আবার রাণাঘাট আসিল। দুপুরের পর হাজারি একটু ঘুমায়া লইল। ট্রেন নাকি সারারাত চলিবে, কখনও সে অতদূর যায় নাই, অতক্ষণ গাড়ীতেও থাকে নাই। ঘুম হইবে না কখনই। যাইবার সময়ে টেঁপির মা ও টেঁপি কাঁদিতে লাগিল। কুসুম ও ইহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

অতসী সকলকে বুঝাইতে লাগিল—ছিঃ, কাঁদে না, ওকি কাকীমা? বিদেশে যাচ্ছেন একটা মঙ্গলের কাজ, ঈহঃ টেঁপি, অমন চোখের জল ফেলো না ভাই!

হাজারি ঘরের বাহির হইয়াছে, সামনেই পশ্চাৎ।

পশ্চাৎ বলিল—এখন এই গাড়ীতে যাবেন ঠাকুর মশায়?

—হ্যাঁ পশ্চাদীদ, এবেলা খন্দের কত?

—তা চল্লিশ জনের ওপর। সেকেন কেলাস বেশী।

—ইলিশ মাছ নিয়ে এসেছিলে তো ?

পদ্মিণী হাসিয়া বলিল—ওমা, তা আর বলতে হবে ? যতদিন বাজারে পাই, ততদিন ইলিশের বন্দাবস্ত। আঘাট থেকে আশ্বিন—দেখেছিলাম তো ও হোটেল !

—হ্যাঁ সে তোমাকে আর আমি কি শেখাবো ? তুমি হলে গিয়ে পুরোনো লোক ! বেশ হুঁশিয়ার থেকে পদ্মদিদি। ভেবো তোমার নিজেরই হোটেল।

পদ্মিণী এক অভাবনীয় কান্ড ঘটাইল। হঠাৎ ঝড়কিয়া নীচু হইয়া বলিল—দাঁড়ান ঠাকুর মশাই, পায়ের ধুলোটা দেন একটু—

হাজারি অবাধ, স্তম্ভিত। চক্ষুকে বিশ্বাস করা শক্ত। এ কি হইয়া গেল ! পদ্মদিদি তাহার পায়ের উপর উপড় হইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা লইতেছে, এমন একটা দৃশ্য কল্পনা করিবার দৃঃসাহসও কখনো তাহার হয় নাই। কেন সৌভাগ্যটা বাকী রহিল তাহার জীবনে ?

স্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিল দুই হোটেলের কর্মচারীরা প্রায় সকলে—তা ছাড়া অন্তসী, টেঁপি, নরেন। কাহিরের লোকের মধ্যে বদু বাঁড়ুয়ে। বদু বাঁড়ুয়ে সত্যি আজকাল হাজারিকে স্বপ্নে মারিয়া চলে। তাহার ধারণা হোটেলের কাজে হাজারি অনেক বেশী উন্নতি দেখাইবে। এই তো সবে শুরু।

অন্তসী পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—আসবেন কিন্তু পূজোর সময় কাকাবাবু, মেরের বাড়ীর নেমন্তন্ন রইল। ঠিক আসবেন—

টেঁপি চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল—খাবারের পুটলিটা ওপরের তাক থেকে নামিয়ে কাছে রাখো বাবা, নামাতে ভুলে যাবে, তোমার তো হুঁশ থাকে না কিছু। আজ রান্ধিতেই খেও, ভুলো না যেন। কাল বাসি হয়ে যাবে, পথেঘাটে বাসি খাবার খবরদার থাকে না। মনে থাকবে ? তোমার চিঠি পেলে মা বলেচে রাখাবল্লভতলায় পূজো দেবে।

চলন্ত ট্রেনের জানলার ধারে বসিয়া হাজারির কেবলই মনে হইতছিল পদ্মদিদি যে আজ তাহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল এ সৌভাগ্য হাজারির সকল সৌভাগ্যকে ছাপাইয়া ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সেই পদ্মদিদি !

ঠাকুর রাখাবল্লভ, জাগ্রত দেবতা তুমি, কোটি কোটি প্রণাম তোমার চরণে। তুমিই আছ ! আর কেহ নাই। থাকিলেও জানি না।